প্রবাহ

দ্বিতীয় সংখ্যা

মানিকের সংকলন

প্রকাশকাল –
১লা সেপ্টেম্বর, ২০১৯

প্রকাশক –
শ্রীধর ঘোষ
চারুপল্লী, বোলপুর, বীরভূম
মোঃ- ৯৪৭৫৪৭৪৬৭০

বর্ণ সংস্থাপনায় –
মেসার্স বাসন্তী প্রিন্টার্স
কালীমোহনপল্লী, বোলপুর
মোঃ- ৯৪৭৫৯৮৫৪৩৮

প্রচ্ছদ –
ব্রহ্মসমুদ্র থেকে ধেয়ে আসছে
চৈতন্যের প্রবাহ।

পরিকল্পনায় –
জয়কৃষ্ণ চ্যাটার্জী

মুদ্রণ –
গ্যালাক্সী প্রিন্টার্স
৭/১, গুরুদাস দত্ত গার্ডেন লেন
কোলকাতা- ৭০০০৬৭

বিনিময় – ১০০/-

প্রাপ্তি স্থান –

পবিত্র কুমার দত্ত
৩৮/২৫, বি.এম.রায় রোড
কোলকাতা-৮
মোঃ- ০৩৩২৪৪৭৩৪৬৩

অরুণ ব্যানার্জ্জী
শিমুরালী, নদীয়া
মোঃ- ৯৫৬৪৪১৭০৯৫

গীতা বসাক
আমতলা, দঃ ২৪ পরগণা
মোঃ- ০৩৩২৪৭০৮৪৮৯

রত্না মাইতি
কাষ্ঠডাঙ্গা, সরশুনা
মোঃ- ৭২৭৮৩৩৭২২১

বিভা দাস
বাগুইআটি, কোলকাতা
মোঃ- ৯৮৩০৪২৮২৩৯

পার্থ সারথী ঘোষ
বেলঘরিয়া, কোলকাতা
মোঃ- ৭৯৮০৪৪৫৪৭২

স্নেহময় গাঙ্গুলী
বোলপুর, বীরভূম
মোঃ- ৯৪৭৫০০৭১৬৮

তরুণ ব্যানার্জ্জী
বোলপুর, বীরভূম
মোঃ- ৯৮৫১৬২৬৫৫৯

অমরেশ চ্যাটার্জ্জী
ইলামবাজার, বীরভূম
মোঃ- ৯৪৩৪৫৮২১০৯

রুদ্রনাথ দত্ত
গড়গড়িয়া, বীরভূম
মোঃ- ৯৭৩২২২৯৮২৫

প্রাক্কথন

গত বছর প্রবাহের প্রথম সংখ্যা প্রকাশ হওয়া মাত্র যেভাবে তার সমস্ত কপি মাত্র এক মাসের মধ্যে নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল তাতে আমরা অভিভূত হয়েছি। মানুষের আত্মিক ক্ষুধা ক্রমবর্ধমান। তারা আর নিষ্প্রাণ ধর্মীয় বিধি ও তত্ত্বকথায় তৃপ্তি পায় না। তারা চায় সজীব অনুভূতি মূলক ধর্ম কথা – যা সত্যিকারের ভাগবত কথা, মানুষের দেহে ভগবানের লীলা কাহিনী, যেকথা একত্ব পিয়াসী মানুষের মনের ক্ষুধা মেটাতে সমর্থ, যেকথা শুনলে দেহে সাড়া জাগে, দর্শন অনুভূতি শুরু হয়ে যায়। বহু মানুষের দর্শন থেকে আত্মিক চৈতন্যের ক্রম বিবর্তনের রূপরেখাটি ধীরে ধীরে স্পষ্ট হয়। আগামী সোনালী ভবিষ্যৎ দর্শনে, মধুমতী জগতের বাস্তব রূপটি সম্বন্ধে স্বচ্ছ ধারনা লাভে মানুষ অপার্থিব আনন্দ লাভ করে। জগতের আনন্দযজ্ঞে আমন্ত্রণে তারা স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে সাড়া দেয়।

হাতে লেখা মানিকের সংকলন এই দ্বিতীয় প্রবাহে অবগাহন করে মানুষ বিমল আনন্দ লাভ করলে, তাদের আত্মিক জীবন সমৃদ্ধ হলে, রাবনের লঙ্কাপুরীর মধ্যেও অশোক কানন খুঁজে পেলে আমাদের এই উদ্যোগ সার্থক হবে।

ইতি-
১লা সেপ্টেম্বর, ২০১৯

চারুপল্লী, বোলপুর
বীরভূম।

॥ সূচীপত্র ॥

বিষয়	পৃষ্ঠা নং
১। মানিক ৬১ সংখ্যা	১-৫০
২। মানিক ৬২ সংখ্যা	৫১-৮৩
৩। মানিক ৬৩ সংখ্যা	৮৪-১১৮
৪। মানিক ৬৪ সংখ্যা	১১৯-১৬২
৫। পাঠ পরিক্রমা - ১	১৬৩-১৮৭
৬। পাঠ পরিক্রমা - ২	১৮৮-২০১৩

ভূমিকা

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন, চৈতন্যদেব অবতার, তার কথা আলাদা। তিনি বলেছিলেন, ‘‘আমি যা বীজ রেখে গেলাম কখনও না কখনও এর ফল হবেই হবে।’’ কি রকম জান? যেমন কেউ বাড়ির কার্নিশের উপর বীজ রেখে গিয়েছিল, অনেকদিন পরে বাড়ি ভূমিসাৎ হয়ে গেল, তখনও সেই বীজ মাটিতে পড়ে গাছ হ’ল ও তার ফলও হ’ল

আবার অন্যত্র ঠাকুর বলেছেন, ‘‘চৈতন্যদেব অবতার। তিনি যা করে গেলেন তারই বা কী রয়েছে বল দেখি?’’

মানুষ তো এখনও মহাপ্রভুর ভজনা করে। কিন্তু সর্বক্ষণ কৃষ্ণনাম জপ করেও নাদের রহস্যভেদ হয়নি কারও। কারও দেহে নাদভেদের যৌগিক লক্ষণ ফুটে ওঠেনি।

মহাপ্রভুর কৃচ্ছ্রসাধনকেও আদর্শ করা সম্ভব নয় বুঝে তিনি নিজেই ভক্তদের বললেন, তোমরা সংসারে থেকে হরিনাম কর। মহাপ্রভুর জীবন দেখে ভক্তেরা সে উপদেশ গ্রহণ করতে পারেনি। মঠ, আশ্রম, ফোঁটা তিলক ধারণ ইত্যাদি কিছু আচার আচরণে সর্বসাধারণের থেকে নিজেদের পৃথক করার চেষ্টাও চলছে।

নাম রূপ বীজ থেকে সাধনবৃক্ষ বিকশিত হয়ে ব্রহ্মবিদ্যা করামলকবৎ হতে দেখা গেল সাড়ে তিনশ বছর পর প্রথম শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে। তার দেহে নাদভেদের যৌগিক লক্ষণ ফুটল। একবার ওঁ বললে তার সমাধি হ’ত। সগুণ আত্মা দর্শন ও নির্গুণের অনুভূতি হয়ে পরে নিগমের সাধনে অবতারত্ব লাভ করলেন। তিনি তাঁর দেহ থেকে শ্রীচৈতন্যকে বের হতে ও পুনরায় লীন হতে দেখেছিলেন। মহাপ্রভুর ভাবধারা তিনি ঠিক ঠিক অনুধাবন করেছিলেন।

কৃচ্ছ্রসাধনের পথ ত্যাগ করে সর্বসাধারণের জীবন যাপন করলেন। পূজারীর চাকরী করে খেয়েছেন, পরে পেনসন পেয়েছেন। আর নিশিদিন হরিপ্রেমে মাতোয়ারা থেকেছেন। তাঁর জীবনে মহাপ্রভুর মতো সংসার ত্যাগ, গেরুয়া ধারণ, মাটিতে শোওয়া, ইচ্ছা করে কলার বাসনায় খাওয়া ইত্যাদি বিবিদিষার চিহ্নগুলি দেখা গেল না। সর্বদা নাম জপ করার ধারাও বদলে গেল। মালা জপার নিন্দা করে তিনি সহজ কথায় গল্প করে ঈশ্বরীয় লীলার কথা, নিজদেহে ভগবানের প্রকাশের কথা বলতেন। তিনি আরও বললেন, বাদশাহী আমলের টাকা নবাবী আমলে চলে না। মহাপ্রভু যা করে গেলেন তা আর রইল না।

বর্তমান যুগে আবার শ্রীরামকৃষ্ণের আদর্শও টিকছে না। মানুষ তাকে ভিতরে না পেয়ে বাইরে বুদ্ধি দিয়ে বুঝতে গিয়ে, নিজেকে রামকৃষ্ণ-ভক্ত প্রমাণ করতে গিয়ে গেরুয়া ধারণ, মূর্তি পূজা ও অন্যান্য অনেক নিয়মে নিজেকে বেঁধে ফেলছে। শ্রীরামকৃষ্ণ আধার অনুযায়ী বিভিন্নজনকে ভিন্ন ভিন্ন উপদেশ দিয়েছেন। তাকে উদাহরণ করে মানুষ ‘‘যত মত তত পথ’’ কথার ব্যাখ্যা করল এইভাবে যে, যে যেভাবে ঈশ্বরীয় পথে চলছে সেটিই ঠিক।

এলেন শ্রীজীবনকৃষ্ণ। বারো বছর বয়স থেকে ঠাকুর তাঁর দেহে বারংবার প্রকাশ পেয়ে শিক্ষা দিতে লাগলেন। রামকৃষ্ণময় হয়ে তিনি ঠাকুরের শিক্ষাটি অনুধাবন করে সেই ভাবধারায় নিজের জীবন গড়ে তুলেছেন। জগত পেল নতুন একটি আদর্শ জীবন। তিনি জাতিধর্মবর্ণ নির্বিশেষে অসংখ্য মানুষের মধ্যে চিন্ময়রূপে ফুটে উঠে তাঁর সত্তা দানে তাঁর ছাঁচে মানুষকে গড়ে তুলছেন। তিনি বলতেন, ‘‘তোমার ভিতর ভগবান প্রকাশ পেয়ে যা নির্দেশ দেবেন, সেভাবেই চলবে।’’ এই আপনা হতে দর্শন হওয়া ও তার দ্বারা পরিচালিত হওয়াই তাঁর আদর্শ – এযুগের আদর্শ।

— ৭ই জ্যৈষ্ঠ, ১৪২১

প্রথম আলো

বিগত ছয় মাসের মধ্যে নতুন যারা স্বপ্নে বা জাগ্রতে শ্রীজীবনকৃষ্ণের চিন্ময় রূপ দর্শন করে তাঁর সর্বজনীনতা ও সর্বকালীনতার প্রমাণ বয়ে জীবনে নতুন আলোর সন্ধান পেয়েছেন বলে আমাদের জানিয়েছেন তাদের কিছু দর্শন এখানে লিপিবদ্ধ করা হল।

আমি আল্লা

✻ স্বপ্নে দেখছি (ডিসেম্বর, ২০১৩) - আকাশে তিনটি পরী উড়ে গেল। পরে দেখি আমার সামনে এগিয়ে এলেন এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক। খালি গায়ে ধুতি পরে। মাথায় কাঁচা পাকা ছোট ছোট চুল। দেখে ভীষণ আনন্দ হচ্ছে ও শ্রদ্ধা জাগছে। জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি কে? উনি উত্তরে বললেন, আমি আল্লা। আমি হাতজোড় করে দোয়া প্রার্থনা করতে লাগলাম। উনি আমার মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করলেন। ....

পরদিন যাদের বাড়ীতে কাজ করতে যাই সেই বৌদিকে স্বপ্নটা বললাম। সব শুনে উনি আমাকে শ্রীজীবনকৃষ্ণের ফটো দেখালেন। চমকে উঠলাম। আরে আমি এনাকেই তো আল্লা রূপে দেখেছি।

— নূরজান বিবি (বোড়াল, দঃ ২৪পরগণা)।

ব্যাখ্যাঃ ভগবান-ব্রহ্ম-আল্লা-গড্ সব এক। একজন জীবন্ত মানুষের চিন্ময় রূপে তাঁকে দেখা যায়।তাঁকে দেখেই সব মানুষ যে আত্মিকে এক – এই জ্ঞান হতে পারে। মানুষে মানুষে বিভেদ জ্ঞান তিরোহিত হতে পারে।

✻ দুপুরে ঠাকুমার পাশে শুয়ে ঘুমোচ্ছিলাম। স্বপ্নে দেখছি (২৩.০৩.১৪) – ঠাকুর জীবনকৃষ্ণ একটা বাচ্চা ছেলেকে দু'হাত দিয়ে ধরে উপরে তুলে ধরলেন। আমি চিৎকার করছি - ছেলেটাকে ধরে নিল, ছেলেটাকে ধরে নিল - - বলে। ঘুম ভাঙল। ঠাকুমা বলল, কে ধরল? জীবনকৃষ্ণের ফটোটা দেখিয়ে দিলাম।

— আত্রেয়ী ঘোষ (বয়স ৩ বছর), চারুপল্লী।

ব্যাখ্যাঃ শিশুটি দ্রষ্টা নিজে। সচ্চিদানন্দ তাকে বরণ করল।

বহুদূরে

✻ দেখছি – অনেক উঁচুতে উঠে গেছি। জীবনকৃষ্ণ আমাকে সূর্যের ভিতর নিয়ে গিয়েছে। কী ঠাণ্ডা! কোন গরম নেই। আমার খুব আনন্দ হলো। ঘুম ভেঙে গেল। জেগে উঠেও খুব আনন্দ হচ্ছিল।

— অর্পণ শেঠ (বয়স ৬ বছর), কলকাতা -৮

ব্যাখ্যাঃ সূর্যমণ্ডলস্থ পুরুষ দ্রষ্টাকে তার সাথে এক করে নিলেন। তাই দেহমনে শীতলতা অনুভব হচ্ছে।

✻ দেখছি (মার্চ, ২০১৪) – দুটো পর্দা একসঙ্গে উড়ছে। পর্দার মাঝখানে একজন লোক ধুতি পরা, খালি গায়ে, মাথায় টুপি, টুপির সামনে নীল পালক। টুপিটা উড়তে উড়তে আমার মাথায় চলে এল। তখন দেখছি জীবনকৃষ্ণের মতো রূপ হয়ে গেছে আমার। ......

— শুভাশিষ শেঠ (বয়স ৫বছর) সখেরবাজার, কলকাতা-৮

ব্যাখ্যাঃ জীবনকৃষ্ণ তাঁর সত্তা দান করছেন, একত্ব লাভ হচ্ছে।

এক রূপ

✻ দেখছি (২৮.১১.১৩) – বাসে করে কোথায় যাচ্ছি। বাসের সব লোকেরা ন্যাড়া মাথা ও ধুতি পরে আছে। দেখতেও এক রকম। বাস থেকে আশেপাশে যে সব লোক দেখছি সবাই ঐ রকম দেখতে। এক জায়গায় কয়েকজন বাহ্যে করতে বসেছে। তারাও ঐ রকম ন্যাড়া মাথা ও ধুতি পরা। খুব অবাক হলাম। ঘুম ভাঙলে নাতিকে(দেবাশিষ দালাল) স্বপ্নটা বললাম। ও জীবনকৃষ্ণের ফটো দেখালো। চম্‌কে উঠলাম। বললাম, আমি তো এনাকেই দেখেছি। কিন্তু সবাই একইরকম দেখতে কেন? আমি তো আগে জীবনকৃষ্ণের নামও শুনি নাই, দেখলাম কী করে?

উল্লাসী দত্ত (ইলামবাজার)।

ব্যাখ্যাঃ ১) সকলের আত্মিক স্বরূপ শ্রীজীবনকৃষ্ণ। তাই সকলে একই রকম দেখতে।

২) স্বয়ম্ভু আত্মার স্বতঃস্ফুরণের প্রমাণ দিচ্ছেন দ্রষ্টা।

✽ দেখছি – এক জায়গায় পূজা হবে। অনেক ভক্ত জড় হয়েছে, অনেক পাঁঠা আনা হয়েছে। বলি হবে। পাঁঠাগুলি শুয়ে আছে। একজন বিশেষ মানুষ আসবেন বলে সবাই অপেক্ষায় আছে। তিনি এলেন। মাঝবয়সী ভদ্রলোক। খালি গা, ধুতি পরে, ন্যাড়া মাথা। উনি বললেন,বলি হবে না। ওগুলো নিয়ে যাও। ছাগলগুলো সরিয়ে নেওয়া হ'ল। তারপর উনি আমার কাছে এলেন। মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করলেন আমায়। ভীষণ আনন্দ হ'ল। ঘুম ভাঙল। পরে জানলাম স্বপ্নে দেখা ভদ্রলোক শ্রীজীবনকৃষ্ণ।

— বন্দনা দলুই (অযোধ্যা, বর্ধমান)।

মালিকানা

✽ গত ১৪ই ডিসেম্বর, ২০১৩, রাত্রে স্বপ্ন দেখছি – একটা একতলা বাড়ীর ছাদে আমি রয়েছি। কোথাও কোন সিঁড়ি নেই। তাই কিভাবে উঠেছি ভেবে অবাক হয়েছি। হঠাৎ আমার আম খেতে ইচ্ছা হ'ল। দেখছি বাড়ীর পাশেই একটা বড় আমগাছ আর তাতে গাছ ভর্তি পাকা আম ধরে রয়েছে। এত আম দেখে আমি আরও অনেক মানুষকে ডেকে আনলাম আম খাওয়ার জন্য। আমি গাছে উঠে আছি আর বাকীরা নীচে জড়ো হয়েছে। হঠাৎ দেখি জীবনকৃষ্ণ আসছেন। কিন্তু বয়স অনেক কম দেখছি। তিনি গাছের কাছে আসতেই অন্যেরা আম গাছটার মালিক আসছে দেখে দৌড়ে পালাল। তিনি আমার দিকে তাকিয়ে কিছু না বলে চলে যাচ্ছেন। আমি তখন তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি আমাকে কিছু বললেন না কেন? উনি উত্তরে বললেন, যার গাছ সে আম খাচ্ছে, আমি বলতে যাব কেন? উত্তর শুনে চমকে উঠলাম। ঘুম ভাঙল।

— সোহেল আখতার মোল্লা (ইলামবাজার)।

ব্যাখ্যাঃ কম বয়সী জীবনকৃষ্ণ – জীবনকৃষ্ণের নতুন বিকাশ। অন্যেরা মালিককে দেখে ভয়ে পালাল – যাদের একত্বের ধারনা হয় নি – তারা দ্বৈতজ্ঞানে, 'প্রভু ও দাস' সম্পর্ক নিয়ে থাকেন - তাদের ভয় যায় না। যার গাছ সে খাচ্ছে — জীবনকৃষ্ণের নতুন বিকাশের এই পর্বে একত্ব দান করে সাধারণ মানুষকেও তিনি বোঝালেন যে তারাও অমৃত আস্বাদনের অধিকারী।

একাত্মতা

✽ দেখছি (২১.১১.১৩) – বাড়ীর কাছে কোন এক দোকান থেকে প্রতিদিনই কিছু না কিছু জিনিস কিনি। সেদিন স্থির করলাম প্রত্যেকদিন টাকা না দিয়ে আজই অগ্রিম ২০০০/- টাকা জমা রেখে দেব দোকানে। পরে পরে Adjustment করা হবে। ভাবা মাত্রই দোকানের ফ্রিজের ওপর ২০০০/- টাকা নিঃশব্দে রেখে দিয়ে বাড়ী ফিরে এলাম।

বাড়ী ফিরে আসার পর মনে হ'ল – দোকানে কাউকে তো টাকা রেখে আসার ব্যপারে কিছু বলে এলাম না। ওরা তো জানতে পারবে না। বাড়িতে ব্যাপারটা জানালাম ও পরিবারে সকলে মিলে ঐ দোকানে বলতে গেলাম। গিয়ে দেখি দোকান উঠে গেছে। তবে দোকানটার পেছনেই দোকানীর বাড়ী। অগত্যা ভিতরে গেলাম। সকলে ঢুকে দেখি – আলোচনা সভা চলছে বড় হল ঘরে। সভার সঞ্চালকের আসনে বসে আছেন শ্রীজীবনকৃষ্ণ — ধুতি পাঞ্জাবী পরা, উজ্জ্বল জ্যোতির্ময়। সভার শেষ মুহূর্তে পোঁছে শুনতে পেলাম সভা সমাপ্তির ঘোষণা। জীবনকৃষ্ণ বললেন – "তোরা সবাই এবার থেকে আমাকে 'তুমি' বলবি। আর আমি তোদের সবাইকে 'তুই' বলবো। তবেই একাত্মতা গড়ে উঠবে। এবার সবাই আমাকে কিছু বল্ একে একে।"

এ কথা বলার পরেই আমার ছেলেকে বললেন, তুই প্রথমে বল। সে সময় আমার ছেলের বয়স যেন ২$^{১}/_{২}$ বছর। ও একটা ছড়া বলল। এরপর একটা ছোট্ট মেয়েকে বলতে বললেন। সেও ছড়া শোনাল। আমি ভাবছি এসব তো সঠিক উত্তর হচ্ছে না। তারপর আমাকে বলতে নির্দেশ করলেন। আমি

বললাম, ধর্ম নিয়ে এত সহজ ও সুন্দর ব্যাখ্যা আপনি দিলেন, আগে কেউ এমনটা দিতে পারে নি। বলা মাত্রই মনে হ'ল আমিও তো ভুল করে "আপনি" বলে ফেললাম। .... স্বপ্ন ভাঙল।

এর আগে এত স্পষ্টভাবে জীবনকৃষ্ণকে দেখা হয়নি। তাঁকে দেখে প্রবল আনন্দ হয়েছে, আবার স্বপ্নটির বিষয়বস্তুও আমাকে মুগ্ধ করেছে।

— মন্দ্রিতা চ্যাটার্জী (ইলামবাজার)

ব্যাখ্যাঃ শ্রীজীবনকৃষ্ণ বলতেন, "আমাকে তোরা ভগবান বলে দূরে সরিয়ে রাখিস না। আমি তোদের বড় দাদা বা বন্ধু।" তাঁর এ কথাই ধ্বনিত হয়েছে এই স্বপ্নে।

স্বপন মাধুরী

অনাদরে

✲ স্বপ্নে দেখছি (০৯.০৩.২০১৪) – ঘরের দেওয়ালে টাঙানো জীবনকৃষ্ণের ফটোটা মেঝেতে পড়ে রয়েছে। কাছে যেতেই দেখি ওখান থেকে জ্যান্ত সব দেবদেবী, এমনকি শ্রীরামকৃষ্ণ এবং সারদা মা-ও বেরোলেন। এই অদ্ভুত দৃশ্য দেখে আমি হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে আছি। ঘুম ভাঙল।

— পিয়ালী গাঙ্গুলী (শ্রীরামপুর, হুগলী)।

ব্যাখ্যাঃ দ্রষ্টার দেবদেবী পূজার, এমনকি রামকৃষ্ণ মঠে গিয়ে পূজা দেবার মন হয়েছিল। তাই দেখাচ্ছে - যিনি পূর্ণব্রহ্ম, তাকেই অনাদরে ফেলে তুমি ছুটেছ কাদের পিছনে। জীবনকৃষ্ণকে পেলেই যে সব পাওয়া হয়ে যায়।

✲ স্বপ্নে দেখছি (১০.০২.২০১৪) – একটা নার্সিংহোম। দরজার সামান্য ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে ভিতরে বেডের উপর শুয়ে আছে এক মহিলা। আমি দরজা ভাল করে খুলে ভিতরে ঢুকে দেখি মহিলাটি নেই। তার বদলে ক্যাপটেন (Captain) বেশে দাঁড়িয়ে রয়েছেন শ্রীজীবনকৃষ্ণ। ...... ওনাকে দেখে প্রচণ্ড আনন্দ হ'ল। স্বপ্ন ভাঙল।

— স্বর্ণদেব চ্যাটার্জী (বেলঘরিয়া, কলকাতা)।

ব্যাখ্যাঃ মহিলা – জগৎ। ভবরোগের চিকিৎসা হবে তাই নার্সিংহোম। ভিতরে ঢুকে মহিলাটিকে দেখা গেল না – দ্রষ্টা নিজে ঐ জগতের একজন, তার সাথে ওতপ্রোত। জীবনকৃষ্ণ যেন ক্যাপটেন – তিনি ভবরোগ নিরাময়ের ব্যবস্থাপনা ও তার পরিচালনা করেন।

✲ দেখছি (এপ্রিল, ২০১৪) – স্নেহময়দা এসেছে। আমি বললাম, একটা স্বপ্ন দেখেছি। স্বপ্নটা বলছি আর দেখতেও পাচ্ছি। আমি কলকাতায় গড়ের মাঠে গেছি। সেখানে একটা ট্রাম চলছে। দরজায় দাঁড়িয়ে স্বয়ং জীবনকৃষ্ণ। উনি বললেন, আয়, উঠে আয়। বললাম, চলন্ত গাড়ীতে উঠব কী করে? উনি

বললেন, কোন অসুবিধা নেই। আমার হাত ধর, ঠিক উঠতে পারবি। উনি ট্রামে তুলে নিলেন। তারপর জিজ্ঞেস করলেন, এটা কী বল তো? বললাম, কী? উনি বললেন, সহস্রারে কুণ্ডলিনী গতিশীল হয়েছে তাই দেখাচ্ছে।

— সুনন্দিতা ঘোষ (বেলঘরিয়া)।

ব্যাখ্যাঃ কুণ্ডলিনী তথা চৈতন্যশক্তি গতিশীল হয়ে বিশ্বব্যাপিত্বের ধর্মের (ট্রাম) আস্বাদন দিচ্ছেন।

সত্যের প্রকাশ

✻ স্বপ্নে দেখছি (০২.০৩.২০১৪) – একজন অজানা লোক আমাকে পাণ্ডুলিপি দেখে সংশোধন করা নতুন "ধর্ম ও অনুভূতি" বইটা দিল। বললাম, আমার তো পুরোন "ধর্ম ও অনুভূতি" একটা আছে। ভদ্রলোক বলল, থাক। তবু তুমি এটা রাখ। এটা ঠিক ঠিক। ... ঘুম ভাঙল। অবাক হলাম। আগের পাঠে কেউ কেউ নতুন "ধর্ম ও অনুভূতি" নিলেও আমি নিইনি। স্বপ্নে মনের সংশয় দূর করলেন। পরের পাঠেই সমীরণের কাছে বইটা নিলাম।

— রীতা চক্রবর্তী (খড়দহ)।

✻ দেখছি (০৪.১২.১৩) – শ্রীজীবনকৃষ্ণ এলেন আমাদের ঘরে। খুব আনন্দ হচ্ছে। কথা প্রসঙ্গে পাণ্ডুলিপি দেখে নতুন 'ধর্ম ও অনুভূতি' ছাপানোর কথা উঠল। উনি বললেন, বইটিতে সত্য প্রকাশ পেয়েছে। স্নেহময়কে চিন্তা করতে বারণ করবি। .... ঘুম ভাঙল।

— শ্রীধর ঘোষ (চারুপল্লী)।

ব্যাখ্যাঃ কলকাতার অনেক ভক্ত নতুন বইটির বিরূপ সমালোচনা করেছে। কিন্তু এই স্বপ্ন আমাদের চিন্তামুক্ত করেছে।

✻ দেখছি (১২.১২.১৩) – আমার স্বামী নতুন "ধর্ম ও অনুভূতি" বইটা পাঠ করছে। এমন সময় সত্যদা হাসিমুখে ঘরে ঢুকলো। আমি ও স্বামী দুজনেই ওনাকে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলাম। ভীষণ আনন্দ হল। .... ঘুম ভাঙল।

— সবিতা ঘোষ (চারুপল্লী)।

ব্যাখ্যাঃ এই বই পাঠ হলে সত্য জীবন্ত রূপ পরিগ্রহ করবে।

আশীর্বাদ

✻ ভোরে স্বপ্ন দেখছি (১৭.১২.১৩) – জিতেন জ্যাঠামশায়ের ঘরে জীবনকৃষ্ণ আছেন। কাছে বৌদি বসে আছে। অনেকে দেখা করতে গেলেন। উনি স্মৃতিকথা কিছু বললেন। জয় যেন ওনার দেখাশোনা করে। ও বলল, এবার আপনারা আসুন। কিন্তু আমাকে ঈশারা করে বলল, তুমি যেও না। আমি বাথরুমের দিকে এগিয়ে গেলাম। অন্য লোকেরা চলে গেলে আমি জীবনকৃষ্ণের কাছে ফিরে এলাম। উনি তখন বৌদিকে বকছেন জোরে জোরে হাসা ও ওনার গায়ে ঠেলা মেরে কথা বলার জন্য। আমিও বললাম, একসময় উনি নারীদর্শন করতেন না, নারীর কন্ঠস্বরও শুনতে পারতেন না। এখন অনুমোদন করছেন মানে এই নয় যে ওনাকে স্পর্শ করবে ও ওনার কাছে চিৎকার করবে আর উনি সব মেনে নেবেন।বৌদি সরে গেল। এবার উনি আমাকে বললেন, আমি নিজের হাতে বইটা লিখে অমুককে দিলাম আর ও এমন করলো! আবোল তাবোল অনেক কথা ঢুকিয়ে দিয়েছে। চরম অন্যায় করেছে। আমি হাতজোড় করে বললাম, আমি আপনার অনুমতি ছাড়াই বইটা পাণ্ডুলিপি দেখে সংশোধন করে ছাপিয়েছি। উনি হুংকার দিয়ে বললেন, বেশ করেছিস বাবা, বেশ করেছিস। আমি তোকে আশীর্বাদ করি – এই বলে আমার মাথায় হাত রাখলেন। দেহমন প্রচণ্ড আনন্দে ভরে গেল।

— স্নেহময় গাঙ্গুলী (চারুপল্লী)।

ব্যাখ্যাঃ 'ধর্ম ও অনুভূতি' গ্রন্থে অন্য কথা যা ঢোকানো হয়েছে তা মহাযোগীকে নারীস্পর্শ করার মতোই যোগ বিরোধী। জয় দেখাশোনা করছে – উত্তর সাধক।

বিশেষ গ্রন্থ

✻ স্বপ্নে দেখছি – পাঠ করছি। শোভন বলল, দ্বৈতবাদের কথা বলছ কেন? শুধুই অদ্বৈতবাদে বল। আমি বললাম, ডাল মাখিয়ে ভাত খেলে ইউরিক

অ্যাসিড কী কমে? ধমকে বললাম, শুধু অদ্বৈতবাদ নিয়ে লেখা কোন ধর্মগ্রন্থ আছে কী? শোভন কাঁদতে লাগল। বলল, আমি বুঝিনি।.....

স্বপ্নটা নিয়ে পাঠে আলোচনা হ'ল - জীবনকৃষ্ণের লেখা "বৈদিক সত্য ও একজন হিন্দু হিসাবে শ্রীরামকৃষ্ণ" - বইটা ছাপানোর কথা আছে এতে। এটাই একমাত্র বই যা শুধুই অদ্বৈতজ্ঞান নিয়ে লেখা। এটা ছাপানো প্রয়োজন হয়ে পড়েছে।

— তরুণ বন্দোপাধ্যায় (গড়গড়িয়া)।

* দেখছি (১৯.১১.১৩) – এক জায়গায় অনেক লোক। খাওয়া দাওয়া হচ্ছে। স্নেহময় জেঠু পরিবেশন করছে। তরকারী একেবারে শুকনো। কোন ঝোল বা রস নেই। ......

— অমৃত চ্যাটার্জী (ইলামবাজার)।

ব্যাখ্যাঃ ঝোল বা রস হলো ভক্তিরস।

* দেখছি (১৯.১১.১৩) – বড় হ্রদ। বহু মানুষ ডিঙিতে চড়ে ভাসছে। একটা ডিঙিতে স্নেহময়দা, শ্রীধর জামাইবাবু ও আমি চড়ে আছি। গলা পর্যন্ত মুড়িতে ঢাকা। মাঝে মাঝে পাঁপড় ভাজাও রয়েছে। স্নেহময়দা ভিতরে হাত ঢুকিয়ে আবার ক্ষীর বার করছে। দারুন খেতে।

— বরুণ ব্যানার্জী (বোলপুর)।

ব্যাখ্যাঃ অদ্বৈতজ্ঞান বা একত্বের জ্ঞান বাহ্যত শুষ্ক কিন্তু ভিতরে ক্ষীর।

পুষ্পাঞ্জলি

* দেখছি (১৫.১১.১৩) – শ্রীজীবনকৃষ্ণ হাতে কিছু ফুল নিয়ে আমার সামনে দাঁড়িয়ে। তিনি আমাকে বললেন, "হাত পাত।" আমি হাত পাতলাম। তিনি ফুলগুলি আমার হাতে দিয়ে দিলেন। ....

— সাধনা গায়েন (সুলতানপুর)।

ব্যাখ্যাঃ ফুল—দর্শন ও অনুভূতি। পুষ্পাঞ্জলির নতুন ধারা। ভগবান দেন ভক্তকে।

* দেখছি (জানুয়ারী, ২০১৪) – জীবনকৃষ্ণ মেয়ে হয়ে গেছেন। আমি তাকে সাজিয়ে দিচ্ছি। আর তার পাশে দেখছি একজন পুরুষ জীবনকৃষ্ণ ধ্যান করছেন। আমি তখন জীবনকৃষ্ণকে জিজ্ঞেস করলাম - তুমি মেয়ে আবার ছেলে, এ কী করে সম্ভব? উনি বললেন, তুই তো আমারই সত্তা। ঘুম ভাঙল। বুঝলাম তিনিই সব পুরুষ আবার সব নারী হয়েছেন।

— অর্পিতা চ্যাটার্জী (কলকাতা-৮)।

* দেখছি (২৩.০৪.১৪) – ভক্তি নামে একজন বলল, আমার গরুর সব দুধ তো তোমায় খাইয়েছি। এখন আর দুধ দিচ্ছে না। একথা বলে ও হেঁটে চলে গেল। ওকে এত রুগ্ন দেখাচ্ছে যে মনে হচ্ছে ও দু'এক দিনের মধ্যে মারা যাবে।

— শিশির ঘোষ (চারুপল্লী)।

ব্যাখ্যাঃ দ্বৈতবাদে ভক্তিরস আস্বাদন প্রায় সম্পূর্ণ হয়েছে - এবার একত্বের মহিমা অনুভব হবে॥

পিতা পুত্র

* মার্চের শেষ সপ্তাহে একদিন পাঠ শুনতে শুনতে দর্শন হ'ল - ছেলেকে (সৌরভ) মৃদু ধাক্কা দিলাম। ও সামনে বসে ছিল। তরুণদা বলল, ও ধ্যানস্থ। ওকে নাড়িও না। তখন আমি দু'হাত দিয়ে ছেলের মাথাটা চিরে দুফাঁক করে দিলাম। ধ্যানে ওর কী হচ্ছে জানার জন্য। দেখি মাথার ভিতর মোমবাতির শিখা জ্বলছে। ..... পর মুহুর্তে সংবিৎ ফিরে এল।

— সুচিত্রা দত্ত (গড়গড়িয়া)।

ব্যাখ্যাঃ পাঠ শুনে আপনা হতে মন সহস্রারে উঠে যায়, চৈতন্যের আলো জলে ওঠে - জগৎ তার প্রমাণ পায়।

* দেখছি (১৮.১২.১৩) – সুলতানপুর গ্রামের একটা জায়গায় বিশাল আগুনের কুণ্ড – দাউ দাউ করে আগুন জলছে। কাছে গিয়ে দেখছি – শ্রীজীবনকৃষ্ণ সেই আগুনের পাশে দাঁড়িয়ে আগুন পোহাচ্ছেন। আমার ঠাকুমাও পাশে দাঁড়িয়ে ছিল। আমাকে জিজ্ঞাসা করল, এই ব্রাহ্মণ কে? আমি বললাম, "ইনি জীবনকৃষ্ণ। তুমি চিনতে পারছ না?" ...... ঘুম ভাঙল।

— রাজীব গায়েন (বোলপুর)।

ব্যাখ্যাঃ ঠাকুমা - জগৎ। দ্রষ্টা বুঝেছেন শ্রীজীবনকৃষ্ণ পরম এক (Absolute One)। ইনি আগুন করেন আবার ইনিই পোহান।

* দেখছি (২০.০৪.১৪) – একজন জেলে আর তার ছেলে দু'জনে মিলে একটা পুকুরে মাছ ধরছে। আমি আর দাদা ওদের কাছে গিয়ে মাছ চাইতেই ওরা আমাদের তাড়া করল। আমরা ছুটে পালিয়ে এলাম। কিছুক্ষণ পর আমরা আবার সেখানে গেলাম। তখন দেখি সেখানে একজনই মাছ ধরছেন আর দেখছি তিনি শ্রীজীবনকৃষ্ণ। আমরা কাছে দাঁড়াতেই তিনি আমাদের অনেক বড় বড় মাছ দিলেন। চাইতে হ'ল না।

— রজনী দাস বৈরাগ্য (ইলামবাজার)।

ব্যাখ্যাঃ জেলে - ঈশ্বর। জেলের ছেলে – অবতার। অবতাররা মানুষকে আত্মিক অনুভূতি (মাছ) দান করতে পারে নি। একমাত্র জীবনকৃষ্ণই পারেন ব্রহ্মত্ব দান করতে।

মৌচাক

* দেখছি (০৬.০৩.১৪) – একটা বিশাল বড় মৌচাক। মধুতে পূর্ণ। কিন্তু একটাও মৌমাছি বসে নেই। আমরা অনেকেই বিশাল ঐ মৌচাকটার দিকে তাকিয়ে আছি। আরও বহু মানুষ ঐ মৌচাক দেখতে আসছে।....

— কৃষ্ণা ব্যানার্জী (বোলপুর)।

ব্যাখ্যাঃ মানুষের একত্ব লাভ হলে মৌমাছিতে রূপান্তরিত হবে, ও ঐ মৌচাকে

বসে মধু অর্থাৎ একত্বের মাধুর্যরস আস্বাদন করবে।

* দেখছি (০১.০২.১৪) – তিনজন সধবা মেয়েকে নিয়ে একজন বিধবা ভদ্রমহিলা আমাদের বাড়ী এসেছে। সধবারা রঙীন শাড়ী আর বিধবাটি সাদা শাড়ী পরে আছে। বিধবা ভদ্রমহিলা একজন সধবার দিকে আঙুল বাড়িয়ে বলছে, একে চিনতে পারছ না? ইনি মানিক। আমি তখন ভাল করে তার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখছি – মুখটা পুরুষ মানুষের – জীবনকৃষ্ণের মুখ। অবাক হয়ে ভাবতে লাগলাম, জীবনকৃষ্ণ মেয়েদেরকে তাঁর ঘরে ঢুকতে দিতেন না, আর এখন দেখছি তিনি নিজেই মেয়ে সেজে আছেন! এই ভাবতে ভাবতে ঘুম ভাঙল।

— কল্পনা রায় (ইলামবাজার)।

ব্যাখ্যাঃ তিনি পুরুষও নন, নারীও নন – অখণ্ড চৈতন্য।

প্রাণ বুঝেছে মন বোঝে না

* দেখছি (০২.০৪.১৪) – একজন বয়স্ক ভদ্রলোক, মাথা ন্যাড়া, ধুতি পরে দাঁড়িয়ে রয়েছে। আরও অনেকে রয়েছে। তারা সকলেই লোকটিকে বলছে জীবনকৃষ্ণ। আমার কিন্তু তা মনে হচ্ছে না। কিছুক্ষণ পর সকলে চলে গেল, আমি একা দাঁড়িয়ে আছি। এবার লোকটি আমার কাছে এল। বললেন, তুই কী চাস? বললাম, আমার যেন চৈতন্য হয় আর যেন রিপুদের দ্বারা আক্রান্ত না হই। উনি আমার প্রার্থনা শুনে হাসতে লাগলেন। তাঁর হাসি দেখতে দেখতে আমার ঘুম ভাঙল।.....

— সুমঙ্গল দাস (অযোধ্যা, বর্ধমান)।

ব্যাখ্যাঃ লোকেরা যাকে জীবনকৃষ্ণ বলছেন তিনি আসলে চৈতন্যপ্রদানকারী এক মানবচৈতন্য – একথা দ্রষ্টার অন্তরাত্মা জানে, তাই ঐরূপ প্রার্থনা।

* দেখছি (১৭.১২.১৩) – একজন লোক কানের কাছে বলছে, শুধুই ভগবান ভগবান কর, অন্য কিছুই করবি না, কিছুই ভাববি না। আর কটা দিন। বারবার কানের কাছে কথাগুলি বলতে লাগল। এই কথা শুনতে শুনতেই ঘুম ভাঙল। সত্যই কিছুদিন শারীরিক সমস্যা ও সাংসারিক ঝামেলায় ঈশ্বরচিন্তা প্রায় হচ্ছিল না। তিনি কৃপাময়। ভিতর থেকে আমাকে স্মরণ করিয়ে দিলেন।

— মিনতি ব্যানার্জী (সুলতানপুর)।

আগমনী

History repeats itself – ইতিহাস নিজের পুনরাবৃত্তি ঘটায়। কোন বিশেষ ঘটনার পুনরাবৃত্তি নয় – বিশেষ একটি প্রক্রিয়া, Thesis, Antithesis - Synthesis – এর ক্রমাবর্তন। সার্বিক কল্যাণ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে একটি মতবাদের জন্ম (Thesis), সর্বজনীনতার নিরিখে সেই মতবাদের দুর্বল দিকগুলি নিয়ে বিতর্ক (Antithesis), ও শেষে দুর্বলতাগুলি যথাসম্ভব কাটিয়ে সমাজ বা রাষ্ট্রে এই মতবাদের প্রতিষ্ঠা (Synthesis) হয়। সাময়িক স্থিতাবস্থার পরে আবার সার্বিক কল্যাণের লক্ষ্যপূরণের ব্যর্থতাগুলি প্রকট হয় ও তা কাটিয়ে উঠে পরবর্তী ধাপে উত্তরণের জন্য সমাজে অস্থিরতা দেখা দেয় - সংঘটিত হয় বিপ্লব, আন্দোলন - পরিণতিতে নতুন মতবাদের (Thesis) জন্ম হয়। এইভাবে ইতিহাসের ধারা চলতে থাকে।

অধ্যাত্ম জগতেও একথা সত্য। সাম্প্রতিক অতীতে আধ্যাত্মিক জ্বালা প্রশমন ও শাশ্বতশান্তি লাভের পথ নির্দেশ করে শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, "মনুষ্য জীবনের উদ্দেশ্য ভগবান দর্শন, ভগবান লাভ"। এটি একটি Thesis, তিনি ভগবান দর্শন করে, ভগবান হয়ে ঘোষনা করলেন, "যে রাম, সেই কৃষ্ণ, সেই এযুগে রামকৃষ্ণ।" ভাষান্তরে "অহং ব্রহ্মাস্মি।" তার দর্শন হলো – নৃমুণ্ডস্তূপে তিনি বসে আছেন। একা তিনি জাগ্রত চৈতন্য, বাকী সব মৃত।

স্বামী বিবেকানন্দ এর Antithesis দিলেন। বললেন – ১) উনি যদি অবতার তাহলে কালীঘরে যান কেন? ২) ব্রহ্মের কামনা, 'একোহম্ বহুস্যাম্' – একা আমি হই বহু হেরিতে আপন রূপ। ৩) He only lives who lives in all, তিনিই একমাত্র জীবিত যিনি সবার অন্তরে বাস করেন।

পরবর্তীকালে শ্রীরামকৃষ্ণের কালীঘরে যাওয়া বন্ধ হলেও তার জীবদ্দশায় হাজার হাজার মানুষ তাঁকে অন্তরে দেখে তাঁর ভগবানত্বের প্রমাণ দেননি। ফলে তাঁর Thesis প্রতিষ্ঠা পায়নি। Synthesis হয় নি।

শ্রীজীবনকৃষ্ণের আবির্ভাব ঘটল। তাকে জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে অসংখ্য মানুষ অন্তরে দেখে তাঁর ভগবানত্বলাভের প্রমাণ দান করল। তাকে চাক্ষুস না

দেখে, তার কথা না শুনেও মানুষ তাকে দেখে। তাকে দেখে হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খৃষ্টান, পার্শী, ভারতবাসী আবার বিদেশী। নরনারী, শিশুবৃদ্ধ, ধনী নির্ধন, সাধু-গুণ্ডা সকলেই তাকে দেখে ও সেকথা নিজে থেকে জানায়। শ্রীরামকৃষ্ণের দেওয়া Thesisএর Synthesis হ'ল। সাধারণ মানুষ তাঁকে চিন্ময় রূপে ভগবান হিসাবে দর্শন করে প্রকৃত ঈশ্বরীর আনন্দের স্বাদ পেল। সত্যিকারের ভক্তিরস আস্বাদন করল। কিন্তু শ্রীজীবনকৃষ্ণের বিশ্বব্যাপীত্ব লাভেও মানব কল্যাণের পূর্ণরূপটি প্রকাশিত হল না। তাই তিনি নতুন Thesis দান করলেন। বললেন, মনুষ্য জীবনের উদ্দেশ্য আর ভগবান দর্শন নয় – মনুষ্য জীবনের উদ্দেশ্য আত্মিক একত্ব লাভ।

তিনি সর্বজনীন মানব, অখণ্ড চৈতন্যের মূর্তরূপ। তাই তাকে সূর্যমণ্ডলস্থপুরুষ রূপে দেখা যায়। যারা তাকে ভিতরে দেখছে তারা তার সাথে এক হচ্ছে (Abstract Equality)। এই আত্মিক একত্বলাভই জীবনের উদ্দেশ্য। বহু মানুষের মধ্যে এই একত্ব প্রতিষ্ঠিত হলে জগতের প্রকৃত কল্যান সাধিত হয়। বহুত্বে একত্ব তথা Unity in Diversity শাশ্বত শান্তি লাভের একমাত্র পথ।

কিন্তু সাধারণ মানুষের মধ্যে এই একত্ব প্রতিষ্ঠার ঠিক ঠিক লক্ষন প্রকাশ পেল না শ্রীজীবনকৃষ্ণের জীবদ্দশায়।

দেখা গেল বহু মানুষ জীবনকৃষ্ণকে দেখলেও তাঁকে সচ্চিদানন্দ গুরু, ইষ্ট বা ভগবান বলে উপলব্ধি করেন। মুখে যে আত্মিক একত্বের কথা বলেন তা বিচারাত্মক, intellectualism। বস্তুত দ্বৈতবাদে ভক্তি নিয়েই আছেন। এই ভক্তিতে ছোট ভক্ত বড় ভক্তের বিচার থেকে যায়। নতুন নতুন সংস্কার জন্ম নেয়। অপরপক্ষে একত্ব প্রতিষ্ঠিত হলে আত্মিকে সকলে সমান এই বোধ জন্মাত। সকলে এক চৈতন্য হতে আত্মিকে নিয়ন্ত্রিত হয়ে সদা যোগযুক্ত থাকতো। আধ্যাত্মিক জ্বালা পূর্ণভাবে প্রশমিত হ'ত। জেগে উঠত বেশ কিছু মানুষকে নিয়ে একত্বের বোধে দীপ্ত নতুন কৃষ্টি। ব্যষ্টির সাধন চর্চা ছেড়ে মানুষ সমষ্টির ধর্মের অনুশীলন করত। Hero-worship -এর বিপরীতে সর্বসাধারণের জীবনে দেবত্বের তথা একত্বের মহিমা প্রকাশ হত মুখ্য আলোচ্য। এ হল anti-

thesis.

পরবর্তী ধাপ Synthesis – যেখানে প্রমাণ ফুটবে যে সাধারণ মানুষেরও ধর্ম হচ্ছে। একক ভাবে নয়, অনেকের একসাথে আত্মিক উন্নতি হতে থাকবে। আর এই একত্বের বোধ ধীরে ধীরে ব্যবহারিক জীবনে দৃষ্টিভঙ্গী বদলাতে সাহায্য করবে। আমরা সেই জগতে অনুপ্রবেশ করতে সবে শুরু করেছি।

সাম্প্রতিক কালের যে সব স্বপ্নে তার ইঙ্গিত স্পষ্ট, সেগুলির কয়েকটি উল্লেখ করা হলো এখানে।

১) দেখছি (০৭.০১.১৪) – আমার রিসার্চ গাইড দুলালদার বাড়ী গেছি। আমাকে দেখে খুব খুশি হয়ে বসতে বললেন। কিছু কথাবার্তার পর বললেন, তোমার গবেষনার বিষয় বদলে গেছে। তাই নতুন করে থিসিস লিখতে হবে। আমি হতাশ হলাম। উনি সাহস জোগানোর জন্য বললেন, আমি তো আছি, তোমার কোন অসুবিধা হবে না।....

— স্নেহময় গাঙ্গুলী (চারুপল্লী)।

ব্যাখ্যাঃ একজন মানুষের ব্রহ্মত্ব লাভ ও জগৎব্যাপী হওয়ার বিষয় ছেড়ে এখন থেকে বহুত্বে একত্ব বিষয়ে জ্ঞান আহরণে মনোনিবেশ করতে হবে। এটি একটি নূতন বিষয়। কারণ এযুগেই একত্ব প্রতিষ্ঠার শুভ সূচনা হতে চলেছে।

২) স্বপ্ন দেখছি - আকাশে দুটি সূর্য। দুটি সূর্য মিলে একটি সূর্য হয়ে গেলো। তখন তার তেজও বেড়ে গেল। পরের দৃশ্যে দেখছি - সূর্য উঠে গেছে। অথচ পৃথিবীটা অন্ধকার - হালকা কুয়াশাচ্ছন্ন। একগুচ্ছ সূর্যরশ্মি এসে পড়েছে পৃথিবীতে। ঐ আলো অন্ধকারকে ঠেলে ঠেলে সরিয়ে দিচ্ছে। আলোকিত অংশটা ক্রমেই একটু একটু করে বাড়ছে। ঐ দৃশ্য দেখে প্রচণ্ড আনন্দ হচ্ছে। ঘুম ভাঙল।

— পার্থ দাস (কড়িধ্যা, সিউড়ী)।

ব্যাখ্যাঃ দ্রষ্টা সূর্যমণ্ডলস্থ পুরুষকে তো আগেই দেখেছেন, তাহলে এতদিন পর কোন নতুন সূর্যের আলো পৃথিবীতে নেমে আসার ও বিস্তার লাভের কথা বলছে এই স্বপ্ন? সম্ভবত, সব ভেদ বুদ্ধির সংস্কার (অন্ধকার) কাটিয়ে আত্মিক একত্বের আলোর মহিমা প্রকাশ পাচ্ছে সাধারণ মানুষের কাছে।

৩) দেখছি – একজন পুরুষ মানুষ সন্তান প্রসব করল। বুঝলাম, উনি অর্ধনারীশ্বর অর্থাৎ নিম্নাঙ্গ নারী। পাতলা পলিথিনের মত চামড়া ঢাকা সেই শিশুকে দেখতে অনেক লোক ছুটে এল। এক সময় ঐ চামড়ার আবরণ ছিঁড়ে গেল। দেখি শিশুটি জ্যোতির্ময়। সকলে অবাক হয়ে দেখতে লাগল ওকে। ঘুম ভাঙার পরও বিস্ময়ের ঘোর লেগে রইল। ......

— পূর্ণিমা ব্যানার্জী (জামবুনী, বোলপুর)।

ব্যাখ্যাঃ অর্ধনারীশ্বর হলেন শিব – পরম এক। তাঁর সন্তান একত্ব দানকারী নির্গুনের ঘনমূর্তি। আবরণ ঘুচে গেল – একত্বের স্পষ্টরূপ দেখতে পাবে জগৎবাসী।

৪) দেখছি (১০.০২.১৪) – গ্রামে এক মহিলা ধর্ম প্রচার করতে এসেছে। তার বক্তব্য শুনতে ভালো লাগল না। আমি উঠে গিয়ে গ্রামের লোকের বাড়ী বাড়ী ঘুরতে লাগলাম। সঙ্গে বাবাও আছেন। কিন্তু বড় চুপচাপ। লক্ষ্য করলাম সকলে গরিব এবং ক্ষুধার্ত। আমি একটা মিষ্টির দোকানে গেলাম ওদের খাওয়ানোর জন্য মিষ্টি কিনতে। দোকানী নেই দেখে নিজেই মিষ্টি তুলে নিচ্ছি। হঠাৎ মালিক এল। জায়গাটা আলোকিত হয়ে গেল। মনে হল ইনি জীবনকৃষ্ণ ছাড়া কেউ নন। দাম দিতে গেলাম। উনি বললেন, তোমাকে আমি ছোট থেকে চিনি। পয়সা দিতে হবে না। লোকেরা নিজের জন্য মিষ্টি কেনে, তুমি তো অন্যদের জন্য কিনছ। আমি বললাম, আমিও আপনাকে ভালো করে চিনি। আপনার নামটা বলুন তো? উনি বললেন, ঊষানন্দ। আমি নিশ্চিত ছিলাম নামটা বলবেন জীবনকৃষ্ণ কিন্তু তা না হওয়ায় ঘাবড়ে গেলাম।......

— সমর্পণ চক্রবর্তী (বোলপুর)।

ব্যাখ্যাঃ অন্য নামে অর্থাৎ নতুনভাবে বিকশিত শ্রী জীবনকৃষ্ণ। ঊষানন্দ – যিনি মানুষের ধর্মজীবনে নতুন যুগের ঊষা (ভোর) আনছেন।

৫) দেখছি – একজন লোক সব লোকের শোবার ঘরে এসে তার দেহ কেড়ে নিচ্ছে। শুধু কঙ্কালটা পড়ে থাকছে। সেটা জীবিত। আমারও দেহ কেড়ে নিলেন। কয়েকজন কাঁদছে দেখে ওনাকে জিজ্ঞাসা করলাম, ওরা কাঁদছে কেন? উনি বললেন ওদের দেহ কেড়ে নিলেও ওরা চাইলে আবার দেহবান হতে

পারে। কিন্তু আমার পর যে আসবে সে যদি আবার ওদের দেহ কেড়ে নেয় তাহলে ওরা আর চাইলেও দেহ ফিরে পাবে না। চিরকাল কঙ্কাল হয়ে থাকবে। সেই ভেবে ওরা কাঁদছে। লক্ষ্য করলাম যাদের দেহ কেড়ে নিচ্ছেন তারা শান্ত হয়ে যাচ্ছে।

— সাগর ব্যানার্জী (বোলপুর, বীরভূম)।

ব্যাখ্যাঃ দেহে চৈতন্যময় পুরুষের আবির্ভাবে দেহজ্ঞান যায়। কিন্তু দেহজ্ঞান আবার ফিরে আসতে পারে। দেহী ভোগের মধ্যে জীবন কাটাতে পারেন। কিন্তু চৈতন্যের পরবর্তী ধাপের প্রকাশে দেহে যোগ স্থায়ী হবে – ফলে সর্বসাধারণের ধর্ম হবে - সমষ্টির ধর্ম - একত্বের ধর্ম।

৬) আমি দেখছি - আমরা অনেকে মিলে এক ডালা ছাই গাড়িতে করে নিয়ে যাচ্ছি গঙ্গায় ভাসাতে। মিছিলে পাঠের অনেকে আছি। তারপর সেই ছাই গঙ্গাতে ভাসিয়ে যে যার ঘরে ফিরে যাচ্ছি। আমি ছুটে গিয়ে স্যারকে বলছি, ছাই কিসের আমি জানি। কিন্তু আপনি কেন সবাইকে বলছেন না যে ওটা জীবনকৃষ্ণের দেহভস্ম। স্যার বললেন,আমি যদি বলে দিতাম তাহলে সুষ্ঠভাবে কাজটা সম্পন্ন হত না।....

— বাণী দাস (সুরুল, শ্রীনিকেতন)।

ব্যাখ্যাঃ শ্রীজীবনকৃষ্ণের দেহ থাকতে তাঁকে কেন্দ্র করে যে লীলা চলছিল তার অবসান হয়ে নতুন লীলার এক পর্ব শুরু হয়েছে নিঃশব্দে। যারা গভীরে মনন করবেন তারা অন্তরে এই সত্য অনুভব করবেন।

৭) দেখছি – একটা সাপ অপর একটা সাপের লেজটাকে মুখে পুরে নিয়েছে। মনে হচ্ছে সাপ দুটির মিলন (সঙ্গম) হচ্ছে। পাশে অনেকগুলি সাপ জড়াজড়ি করে রয়েছে। তারা যেন ঐ সাপ দুটির মিলন সুখ অনুভবে আনন্দে উদ্‌বেল হয়ে পড়েছে। ......ঘুম ভাঙল।

— রত্না মাইতি (কাষ্ঠডাঙ্গা, কলকাতা)।

ব্যাখ্যাঃ ভগবদ্‌গীতায় বলেছে আত্মাই রমন করে, চিত্ত ঐ রমন স্মরণে উপরমন করে এবং আনন্দে বিহ্বল হয়। আত্মা একটি দেহে সংকলিত হয়। সেখানে রমন হয়। অন্যান্য দেহী শুদ্ধচিত্ত হয়ে উপরমন উপভোগ করে ও আনন্দে

আত্মহারা হয়।

সচিদানন্দগুরু রূপে শ্রীরামকৃষ্ণ যখন শ্রীজীবনকৃষ্ণের দেহে জাগলেন, রামকৃষ্ণের চৈতন্য জীবনকৃষ্ণের দেহে ধরা পড়ল। রামকৃষ্ণের চৈতন্যের পরিণত রূপ (লেজ) অন্তরে ধারণ করে জীবনকৃষ্ণের চৈতন্য আলোড়িত হ'ল, রামকৃষ্ণময় হল - পরে তা নতুন রূপ পেল। জগতের সাধারণ মানুষও এই মহামিলনের আনন্দ তরঙ্গ অভিঘাতে বিহ্বল হ'ল। তারা শ্রীজীবনকৃষ্ণকে প্রথমে সচ্চিদানন্দগুরু রূপে, পরে পরমব্রহ্ম রূপে অন্তরে দর্শন করে ব্রহ্মানন্দে অভিষিক্ত হ'ল।

এযুগে আবার ঐ ঘটনার পুনরাবৃত্তি হচ্ছে। শ্রীজীবনকৃষ্ণের চৈতন্যের পরিণত রূপ অন্য একটি দেহে ধরা পড়েছে। চৈতন্যের নতুন বিকাশের সূচনা হচ্ছে - তাতে মনুষ্যজাতি নতুন করে আনন্দে মাতোয়ারা হচ্ছে।

৮) দেখছি – একজন ভদ্রলোক, মনে হচ্ছে ওনার নাম 'একত্ব'। ওনার একজন দেহরক্ষী রয়েছে। সে কালো ও রোগা। আমি দাঁড়িয়ে আছি একটা সাঁকোয়। আমার দেহের রূপ যেন বদলে গেছে। সুন্দর হয়েছি। পাশের রাস্তা দিয়ে 'একত্ব' নামের ঐ ভদ্রলোক হেঁটে এগিয়ে যেতে শুরু করলেন। দেখতে দেখতে ঘুম ভাঙল।......

— নন্দন দাস (গড়গড়িয়া, বীরভূম)।

ব্যাখ্যাঃ একত্ব প্রতিষ্ঠার পথে যাত্রা শুরু হয়েছে। দেহরক্ষী - নির্গুণ ব্রহ্ম। দেহরক্ষী দেখিয়ে বোঝালো এর (একত্বের) গতি অপ্রতিরোধ্য।

৯) দেখছি – ঘরে অনেক বিড়াল আর একটা ঘোড়ার বাচ্চা। আমার বিড়ালগুলোকে ভাল লাগছে না। ঘোড়াটাকে খুল ভাল লাগছে। আমাদের কাজের মেয়ে এসে সব বিড়ালগুলো ও বাচ্চা ঘোড়াটাকে নিয়ে গেল। আমি ওর পিছন পিছন যাচ্ছি আর বলছি আমাকে ঘোড়াটা দিয়ে যাও। ও এক একটা বাড়িতে এক একটা বিড়াল দিয়ে দিল। শেষে আমাকে বাচ্চা ঘোড়াটা ফেরৎ দিল। আমি আনন্দে ঘোড়াটাকে নিয়ে বাড়ী ফিরছি, ঘুম ভাঙল।........

— পূর্ণিমা ভৌমিক (সখের বাজার, কলকাতা)।

ব্যাখ্যাঃ বিড়াল - বিশ্বব্যাপীত্ব। ঘোড়া - বৈদিক সত্যের বিকাশের প্রতীক - একত্বের ধর্ম। বিশ্বব্যাপিত্ব সম্পূর্ন ধারনা হলে তবে আত্মিক একত্ব অনুভব

করা যায়। দ্বৈতবাদ থেকে যথার্থ অদ্বৈতবাদে উত্তরণ হয়।

১০) দেখছি – বাসে করে যাচ্ছি। হঠাৎ খেয়াল হল আমার বাসস্থান সখেরবাজার পেরিয়ে গেছি। তারপর নতুনপাড়া স্টপেজে নামলাম। যদিও বাস্তবে ওখানটা নতুনপাড়া নয়। দেখি জায়গাটা খুব সাধারণ। কলকাতা বলে মনেই হচ্ছে না। বাড়ীঘর, লোকজন, রাস্তাঘাট সব খুবই সাধারণ। হঠাৎ দেখলাম উপরে ইলেকট্রিক তার থেকে একটা বিড়াল মরে ঝুলছে। মনে হল, এইমাত্র মারা গেছে। মুখ থেকে টাটকা রস ঝরছে। এগিয়ে গিয়ে মিষ্টির দোকানে জিজ্ঞেস করলাম আমার গন্তব্যস্থলে যাব কীভাবে? একজন কর্মচারী পথ দেখাতে এগিয়ে এল। ওর সঙ্গে যেতে গিয়ে আবারও মৃত বিড়ালটা দেখে মন খুব খারাপ হয়ে গেল।..........

— বনানী দত্ত (সখের বাজার, কোলকাতা)।

ব্যাখ্যাঃ নতুন পাড়া - আধ্যাত্ম জগতের নতুন পর্ব। বিড়াল - বিশ্বব্যাপিত্বের প্রতীক। নতুন পর্বটি বিশ্বব্যাপিত্বের পরের ধাপ - একত্ব প্রতিষ্ঠার পর্ব। রাস্তাঘাট, ঘরবাড়ি, লোকজন সব সাধারণ – "একত্ব বড় গরীব" - কোন ঐশ্বর্য নাই।

১১) দেখছি (ফেব্রুয়ারী, ২০১৪) – পাঠের কয়েকজন রয়েছি। পাঠের বিষয় আলোচনা হচ্ছে। একটি ছেলে জীবনকৃষ্ণের কথা মানতে চাইছে না। তাকে বললাম, তোমাকে আমি বোঝাতে পারব না, তুমি দেখলে বিশ্বাস করবে। তখন বোঝাতে পারব। এমন সময় ওখানে জীবনকৃষ্ণ এলেন। আমি ওনাকে প্রণাম করে অজ্ঞানের মত হয়ে গেলাম। শুয়ে শুয়ে দেখছি ওনার মুখটা একটা বাচ্চাছেলের মত হয়ে গেল। শুনতে পাচ্ছি স্নেহময়দা বাকীদের বলছে যে সমরেশের জীবনকৃষ্ণকে নিয়ে দর্শন হচ্ছে।......

— সমরেশ চ্যাটার্জী (ইলামবাজার, বীরভূম)।

ব্যাখ্যাঃ জীবনকৃষ্ণের তেজের নতুন বিকাশ (বাচ্চা ছেলে) ঘটতে চলেছে। এবার বহু মানুষ তাঁর একত্ব লাভ করবে ও ধারণা করতে পারবে।

১২) দেখছি (৩০.০১.১৪) – স্নেহময়দা মন খারাপ করে বসে আছে। ঘাটশিলার লোকেরা যেন ওর পাঠ শুনতে চায় না। আমি বললাম, শোন, জীবনকৃষ্ণ বলেছেন, বিহারের সমস্তিপুরের লোকেরা তোমার পাঠ শুনতে রাজী

হয়েছে কারণ জীবনকৃষ্ণ নিজে গিয়ে তাদের বুঝিয়েছেন। স্নেহময়দা বলল, তা তো হল, কিন্তু আমার যে এদিকে শ্বেতী হয়ে গিয়েছে মুখে। আমি বললাম, সেতো আমারও হয়েছে। আবার তুমি একদিন সাগরের কাছে শুয়েছিলে। তাতে সাগরেরও শ্বেতী হয়ে গেছে। এটা যে সংক্রামক রোগ। ও নিয়ে ভেবে লাভ নেই। ঘুম ভাঙল। ....

—বরুণ ব্যানার্জী (বোলপুর)।

ব্যাখ্যাঃ বিহারের সমস্তিপুরের লোক – যাদের অন্তরে সমষ্টির ধর্ম জানার ক্ষিধে জেগেছে তারা সকলে এখানকার পাঠের নতুন কথা শুনবে। শ্বেতী – বৈচিত্র্যহীনতা – একত্বের মহিমা। এটা সংক্রামক—সহজে ছড়িয়ে পড়বে। ফর্সার মধ্যেও স্তরভেদ আছে কিন্তু বিভিন্ন শ্বেতী রোগীর সাদা রঙের মধ্যে বৈষম্য নেই। শ্বেতী সংক্রামক নয়, কিন্তু একত্বের ধর্ম সংক্রামক।

১৩) দেখছি – পাঠে 'কথামৃত' বা 'ধর্ম ও অনুভূতি' পড়া হচ্ছে না। জয়দার স্বপ্ন পড়া হচ্ছে এবং সেটা নিয়েই আলোচনা হচ্ছে। ওটাই যেন পাঠের বিষয়বস্তু।......

— সিদ্ধার্থ দত্ত (গড়গড়িয়া, বীরভূম।)।

ব্যাখ্যাঃ জয়ের অর্থাৎ ভগবানের স্বপ্ন (কামনা) - সর্ব সাধারণের ধর্ম হোক। পাঠে বিভিন্ন মানুষের স্বপ্ন দর্শন থেকে শ্রীভগবানের সেই ইচ্ছা কিভাবে পূরণ হচ্ছে, তাই এবার থেকে পাঠের আলোচ্য বিষয় হবে।

নবীনা

নির্গুণ

✲ দেখছি (১১.০২.১৪) – আমার মা কোন কালী মন্দিরে পূজা দিয়ে এসেছে। তার প্রসাদ আমাকে দিতে এলেন স্বয়ং জীবনকৃষ্ণ। আমি প্রসাদ খেলাম। আমি যেন খুব সুন্দর হয়ে গেছি। সকলে আমাকে আদর করছে। একটু পর আকাশ থেকে একটা আলো আসছে দেখতে পেলাম। আলোটা জীবনকৃষ্ণের রূপ নিল। মনে ফুট কাটল নির্গুণের শক্তির মূর্তরূপ শ্রীজীবনকৃষ্ণ।

— অতনু মাইতি (কাষ্ঠডাঙ্গা, সরশুনা)।

ব্যাখ্যাঃ শ্রীজীবনকৃষ্ণ নির্গুণের মূর্তরূপ। তাই তাঁকে ভিতরে (দেহে) পেয়েই নির্গুণের প্রসন্নতা (কালীর প্রসাদ) লাভ সম্ভব। দেহে নির্গুণের প্রকাশ হওয়াই সত্যস্বরূপ ফিরে পাওয়া। সত্যই সুন্দর – তাই দ্রষ্টা সুন্দর হলেন।

✲ দেখছি (২৫.০১.১৪) – একটা কারখানায় মানুষ তৈরী হয়। সেই কারখানায় যেখানে সর্বশেষ উৎপাদিত দ্রব্য (Final Product) হিসাবে মানুষ তৈরী হয়ে বেরিয়ে আসছে সেখানে জীবনকৃষ্ণ দাঁড়িয়ে রয়েছেন। একজন করে মানুষ বেরোচ্ছে আর উনি তার পিঠে একটা স্ট্যাম্প মেরে ছেড়ে দিচ্ছেন।

— অনির্বাণ গাঙ্গুলী (কলকাতা)।

ব্যাখ্যাঃ জীবনকৃষ্ণকে ভিতরে পেয়েই মানুষ জীবসীমা অতিক্রম করে মানবসীমায় উত্তীর্ণ হয়। জীবনকৃষ্ণ চর্চার মাধ্যমে মানুষ সংস্কারমুক্ত হয়। এই সংস্কার মুক্তির সার্টিফিকেট (স্ট্যাম্প) জীবনকৃষ্ণ দেন – অন্যের দর্শনে তা জানা যায়।

কণ্ঠদান

✲ দেখছি (২১.০১.১৪) – জাম্বুনীতে স্নেহময় মামার বাড়িতে পাঠে যাচ্ছি সাইকেল করে। পথে তিনটি বাম্পার পড়ল। প্রথম বাম্পার পেরোনোর সময় ব্যষ্টির সাধনের ধাপগুলির কথা মুখ থেকে আপনা হতে বেরিয়ে এল। দ্বিতীয় বাম্পার পেরোনোর সময় মুখ থেকে উচ্চারিত হ'ল – One is all (ওয়ান ইজ্ অল্)। তৃতীয় বাম্পার পেরোনোর সময় বললাম, All is one (অল্ ইজ্

ওয়ান)। এরপর দেখি বাড়ীর সামনে এসে গেছি – পাঠে যোগ দিতে যাব। .... ঘুম ভাঙল।

ব্যাখ্যাঃ তিনটি ধাপ পেরিয়ে একত্বের চর্চায় যোগ দিতে হয়। প্রথম – ব্যষ্টির সাধন। দ্বিতীয় – One is all এবং তৃতীয় – All is one -এর ধারনা লাভ।

কিছুদিন পর (২৭.০৩.১৪) দেখছি — আমার গলায় কে যেন একটা আখ গেঁথে দিয়েছে। ডাক্তারের কাছে গেলাম। উনি ওটা বের করে ওষুধ লাগিয়ে ঠিক করে দিলেন। এরপর দেখছি — প্রদীপ স্যারের গলাটা ছোট। আমি তখন আমার গলাটা উপর নীচে কেটে প্রদীপ স্যারের গলার অংশে লাগিয়ে দিলাম। আমার কোন কষ্ট হল না। বরং আমার গলায় স্যার কথা বলবে ভেবে খুব আনন্দ হচ্ছে।

— সাগর ব্যানার্জী (বোলপুর)।

ব্যাখ্যাঃ প্রদীপ – জ্ঞানদীপ – অখণ্ড চৈতন্য। তিনি দ্রষ্টার মত অসংখ্য মানুষের কন্ঠে কথা বলবেন।

বিষ হজম

✽ দেখছি (১৫.০৩.১৪) — শ্রীনন্দা স্কুলের মাঠে পাঠ হচ্ছে। অনেক লোক। একটা সাপ কুণ্ডলী পাকিয়ে ফণা বিস্তার করে রয়েছে দেখে বাবাই ওকে তাড়াতে গেল। ভাবল প্লাস্টিকের সাপ। ধরে ছুঁড়ে ফেলতে গেল। আমি বললাম,ওটা সত্যিকার সাপ, হাত দিস না। অমনি সাপটা রেগে আমার ঘাড়ে ছোবল মারল। আমি মুহূর্তে বিষক্রিয়ায় মৃতপ্রায় হয়ে ঢলে পড়ছি। আস্তে আস্তে চারিদিক অন্ধকার ও নিস্তব্ধ হয়ে যাচ্ছে। কী কী করা হ'ল না ভেবে কষ্ট হচ্ছে। হঠাৎ সাপটার চোখে চোখ পড়তেই মনে হ'ল ওর মনোভাব হচ্ছে – কেমন দিলাম। আমিও মনে মনে ভাবলাম, আমাকে এই বিষ হজম করে দেখাতেই হবে। হাতে দুটো ফুটো করে মুখ দিয়ে বিষ টেনে ফেললাম। ঠোঁট ফাটা আছে, তাই ঠোঁটটা মুছলাম। তারপর মাটিতে পড়ে যেতেই পাঠের লোকেরা ছুটে এল। ছোটমামা পাঠ থামালো। কিছুক্ষণ পর ধীরে ধীরে জ্ঞান

ফিরে এল। মনে হচ্ছে এযাত্রা বেঁচে গেলাম। পুরো স্বাভাবিক হবার আগেই ঘুম ভেঙে গেল।......

ব্যাখ্যাঃ সাপের বিষ হজম করা – ভিতরের তেজ জেগে উঠে নীলকন্ঠ শিব হয়ে ওঠা – যে শিব একত্ব প্রতিষ্ঠা করে।

পরে এক স্বপ্নে দেখছি — কালো কাকার (তরুণ) সাথে কথা বলছি। হঠাৎ কাকা আমাকে জড়িয়ে ধরে গালে চুমু খেতে লাগল। ওর দাড়ি আমার গালে ঠেকছে। বিরক্ত হয়ে হাত দিয়ে ওর মুখটা সরাতে গেলাম। তখন মুখের দিকে নজর পড়তেই দেখি, এ তো রামকৃষ্ণ! চমকে উঠলাম।.......

— জয়কৃষ্ণ চ্যাটার্জী (জামবুনী, বোলপুর)।

ব্যাখ্যাঃ তরুণ প্রজন্ম শ্রীরামকৃষ্ণের মত তীব্র ব্যাকুলতার সাথে একত্বের চর্চাকে আঁকড়ে ধরবে।

পরমপিতা

✽ দেখছি (নভেম্বর, ২০১৩) — ছাদে হনুমান লাফালাফি করছে। একটা হনুমান সিঁড়ি দিয়ে নেমে এসে ঘরে ঢুকে গেল। আবাক হয়ে দেখি ওতো আমার মামার ছেলে – সোমনাথ। ও যেন হনুমান হয়ে গেছে। হুপ হুপ আওয়াজ করছে আর লাফালাফি করছে। এমন সময় মামা এল। বলল, এবার থেকে তোর ভাই (সোমনাথ) তোর কাছে বরাবর থাকবে।

— শোভন ধীবর (অবিনাশপুর)।

ব্যাখ্যাঃ ভাই – আত্মিক জীবন। হনুমান – একত্ব। এবার থেকে বরাবর কাছে থাকবে – একত্ব দেহে প্রতিষ্ঠা পাবে।

✽ দেখছি (১২.১২.১৩) — বাবা এসেছে বাড়ীতে। বললাম, মেলা নিয়ে যাবে না? বাবা বলল, বেশ চল্। আমি বাবার একটা ছবি তোলার চেষ্টা করলাম মোবাইলে। দেখলাম সবার ছবি এলেও বাবার ছবি ধরা পড়ছে না। মনে পড়ল বাবার তো স্থুল দেহ নেই, বাবা এখন শুদ্ধ আত্মা। তাহলে ছবি

আসবে কী করে? ধলকাকাকে ডেকে ব্যাপারটা দেখালাম। তারপর বাবাকে বললাম, দেখো না মা রাগ করে, পাঠ করে না, পাঠেও যায় না। তুমি একটু বল না। ঘুম ভাঙল।

— জয়কৃষ্ণ চ্যাটার্জী।

ব্যাখ্যাঃ বাবা – পরম পিতা – শ্রীজীবনকৃষ্ণ। বাবার ছবি উঠল না — বোঝা গেল তিনি দেহ সমেত ব্রহ্ম।

নতুন জগৎ

* দেখছি (এপ্রিল, ২০১৪) – একটা পুকুরে জীবনকৃষ্ণ একটা ঢিল ছুঁড়ল – আলোড়ন হ'ল জলে। ঘূর্ণি সৃষ্টি হ'ল। পুকুরের চারপাশে একই রকম দেখতে সাতটি ছেলেকে দেখা গেল। তাদের প্রত্যেকের হাতে রামধনুর এক একটা রঙ। ওরা রঙগুলো পুকুরের জলে ফেলে দিতেই সাদা ধবধবে কাপড় পরে এক ফর্সা সুন্দরী রমনী জল থেকে উঠে এল। খুব আনন্দ হ'ল। .... ঘুম ভাঙল।

— প্রবীর হাজরা (কলকাতা)।

ব্যাখ্যাঃ ঈশ্বর বস্তু লাভ হয়েছিল শ্রীজীবনকৃষ্ণের, তাঁর ঈশ্বরত্ব(ব্রহ্মত্ব) দান করলেন জগতে। জগৎ আলোড়িত হ'ল। বহুর বহুত্বে তার ব্রহ্মত্ব বা একত্ব প্রতিষ্ঠিত হল। আত্মিক একত্ব লাভকারী মানুষদের এক নতুন জগৎ জেগে উঠল।

শিবের যন্ত্রণা

* কালীপূজার রাত্রে স্বপ্ন দেখছি – দক্ষিণেশ্বরে গেছি। পূজার লাইনে দাঁড়িয়ে আছি। পূজা দেব। হঠাৎ মনে হল, আমি কেন পূজা দেব? এমন সময় নাটমন্দিরের মাথার উপর শিব মূর্তি দেখে ভাবছি ঠাকুর ঐ শিব মূর্তিকে উদ্দেশ্য করে বলতেন – 'আমি মায়ের কাছে যাচ্ছি গো।' এই বলে, যেন তার কাছে

অনুমতি নিয়ে কালীঘরে ঢুকতেন। আমার বাঁদিকে কালীমন্দির আর ডান দিকে নাটমন্দির। আমি নাটমন্দিরের দিকেই গেলাম। সেখানে দেখি যত লোক ছিল সবাই ঐ শিবের মত হয়ে গেছে। আমিও শিব হয়ে গেছি। কিছুক্ষণ পর খুব কষ্ট হতে লাগল। যেন দম বন্ধ হয়ে আসছে। এই কষ্টের মধ্যে বলছি – আমি স্নেহময়কে জিজ্ঞাসা করব এটা (কষ্ট) কেন হ'ল?.....

— রেণু মুখার্জী (সখের বাজার, কলকাতা)।

ব্যাখ্যাঃ সকলে স্বরূপত শিব হলেও নিজেদের স্বরূপ ভুলে আছে। আবার কারও শিবত্ব লাভ হলেও সংস্কারের উচ্ছেদ না হওয়ায় শিবত্ব স্থায়ী হচ্ছে না – এই বোধ দ্রষ্টাকে যন্ত্রণা দিচ্ছে।

* দেখছি (৪.০১.১৪) – আমার ছোট ছেলে রজনীর অন্নপ্রাশন। অনেক লোকজন এসেছে। হঠাৎ দেখছি ছেলের মুখটি শ্রীজীবনকৃষ্ণের মত দেখতে। খুব অবাক হলাম।

— অর্চনা দাস বৈরাগ্য (ইলামবাজার)।

ব্যাখ্যাঃ অন্নপ্রাশন – ব্রহ্মবিদ্যার সূচনা। শ্রীজীবনকৃষ্ণের সত্তা লাভে দেহে ব্রহ্মবিদ্যা লাভের সূচনা হয়।

* দেখছি (০৫.১২.১৩) – একটা বড় মৌচাক। সেখানে কিছু জল ছিটিয়ে দেওয়া হল। সঙ্গে সঙ্গে সেখান থেকে অনেক মধু ঝরতে লাগল।

— আদরিনী চ্যাটার্জী (ইলামবাজার)।

ব্যাখ্যাঃ জল ছেটানো – অনুশীলন করা। মধু – চৈতন্য।

পাঠ প্রসঙ্গে

পাঠ ও আলোচনা প্রসঙ্গে কখনও কখনও নতুন ব্যাখ্যা উঠে আসে তারই কিছু নমুনা এখানে তুলে ধরা হ'ল।

✻ "হাতে তেল মেখে কাঁঠাল ভাঙতে হয়।" — শ্রীরামকৃষ্ণ।

সাধারণ অর্থে – ভক্তিরূপ তেল লাভ করে কাঁঠাল ভাঙ্গলে অর্থাৎ সংসার করলে মানুষ আঁঠা অর্থাৎ আসক্তিতে জড়ায় না, মায়ায় মুগ্ধ হয় না।

ব্যষ্টির সাধনের নিরিখে, তেল পাওয়া – চৈতন্য সাক্ষাৎকার – তত্ত্বজ্ঞান লাভ। তেল ঢালা – চৈতন্যের অবতরণ। হাতে তেল মাখা – দেহের মধ্যে মানুষরতনের হাততালি দিয়ে হরিনাম করা ও পাকা ভক্তি লাভ করা। কাঁঠাল – দেহ। কাঁঠাল ভাঙ্গা – দেহের ভিতর পঞ্চরসের লীলা (শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর) উপভোগ-নিজ দেহস্থ চৈতন্যের রসাস্বাদন। আগমে পঞ্চভাবের সাধনে মানুষ কাঁঠালের আঁঠায় জড়িয়ে যায়। সংকীর্ণতায় আবদ্ধ হয়। যে কারণশরীরে কালীর রূপ দেখেছে সে কালীকেই বড় ভাবে, কৃষ্ণকে তুচ্ছ জ্ঞান করে। আবার যে ভিতরে কৃষ্ণরূপ দর্শন করেছে সে অন্যান্য ঈশ্বরীয় রূপকে ছোট চোখে দেখে। কিন্তু নিগমে পাকাভক্তি লাভ হলে সাধক সংকীর্ণতামুক্ত হয়, মায়া মুক্ত হয়। বিধিবাদীয় সংস্কার থেকে মুক্ত হয়। তাই বলে, "এ রথে যাব না ভাই অন্য রথে যাব, ভাই বোনেতে যুক্তি করে কাঁঠাল কিনে খাব।"

বিশ্বব্যাপিত্বে, তেল — জগতের বহু মানুষ সাধকের চিন্ময় রূপ অন্তরে দেখে বলে 'তুঁহু', 'তুঁহু' – তুমি ভগবান, তুমি ব্রহ্ম – তখন সাধকের চৈতন্য লাভ হয় – তিনি বোঝেন 'অহং ব্রহ্মাস্মি।' এ যেন ঠিক তেল মাখা নয় – হাতে গ্লাভ্‌স্ পরা। কাঁঠাল – সাধকের বৈশ্বিক দেহ (Cosmic Body) – যারা তাকে দেখছেন তাদের সম্মিলিত দেহ। কাঁঠাল ভাঙ্গা – অন্য অনেকের দর্শনে নিজের বিশ্বদৈহিক সত্তার পরিচয় লাভ ও উপভোগ। যারা তা দর্শন করেন তারাও অনুভব করেন তারা যেন এক বৃহৎ কাঁঠালের ভিন্ন ভিন্ন কোয়া এবং সেই কোয়ার রসাস্বাদন করতে পান। আঁঠা লাগবে না – ব্যষ্টির সাধনের সকল সংস্কার থেকে মুক্তি।

সমষ্টির ধর্মে, তেল – বহুত্বে একত্বের বোধ। তেল মাখা – বহুত্বে একত্বের বোধ ঘনীভূত হওয়া – নিজের ও অন্য বহুজনের দর্শন অনুভূতির মননে। কাঁঠাল – সমগ্র মানবজাতি (Whole humanity)। কাঁঠাল ভাঙ্গা - -সকলের অনুভূতি মনন করা ও উপলব্ধি করা যে প্রতিটি মানুষ আত্মিকে এক – সমান – ছোট বড় নেই। আঁঠা থাকবে না – Hero Worship ও আত্মিক একত্ববোধের বিরোধী সকল সংস্কার থেকে সাধক মুক্ত হবেন।

✻ ঠাকুর বললেন, সংস্কার থাকা চাই, একটা কিছু করা চাই - তপস্যা। এ জন্মেই হোক বা পূর্ব জন্মে হোক।

মহাভারতে আছে, শ্রীকৃষ্ণের আঙুল কেটে রক্ত পড়ছে দেখে দ্রৌপদী তার শাড়ী ছিঁড়ে কৃষ্ণের আঙুলে একটু কাপড় বেঁধে দেন। এতে রক্ত পড়া বন্ধ হ'ল। সেই ঋণ শোধ করতে কৃষ্ণ বস্ত্রহরণ কালে দ্রৌপদীকে বস্ত্র জুগিয়েছিলেন। কিন্তু এটি যোগের কথা হ'ল না। তাই ঠাকুর গল্পটি সংশোধন করে দিলেন। তিনি বলছেন – দ্রৌপদীকে কৃষ্ণ বললেন, তুমি কি কখনও কাউকে কাপড় দান করেছ? মনে করে দ্যাখো। যদি করে থাকো তবে তোমার লজ্জা নিবারণ হবে। দ্রৌপদী বলল, হ্যাঁ, একবার স্নানের সময় এক ঋষির কৌপীন নদীর জলে ভেসে গেলে আমার শাড়ীর অর্ধেক ছিঁড়ে তাকে দিয়েছিলাম লজ্জা নিবারণের জন্য। তখন কৃষ্ণ বললেন, তাহলে তোমার ভয় নাই। তিনি দ্রৌপদীর লজ্জা রক্ষার্থে কাপড় যোগাতে লাগলেন। দুঃশাসন কাপড় টেনে ক্লান্ত হয়ে পড়ল। কিন্তু তাকে নগ্ন করতে পারল না।

দ্রৌপদীর দেহে বেদ ও বেদান্ত মতে সাধন হয়েছিল। তার কারণশরীর বৈদিক ঋষির রূপ ধারণ করেছিল। এর পরিণতিরূপে পরের ধাপে অবতার তত্ত্বের সাধন হয় এবং দেহে চৈতন্যের পূর্ণ অবতরণ ও পাকাভক্তি লাভ হয়। এটি বোঝাতে রাম ও কৃষ্ণের মাথা থেকে পাছা পর্যন্ত দোলাই পরানো হয়। এই অর্থে দ্রৌপদী লজ্জা নিবারণের কাপড় পেল। তখন দুঃশাসন তথা কোন নেতিবাচক সংস্কার তাকে যোগবিচ্যুত করতে পারে না।

✻ "ডুব দিলে তবে তো ঠিক ঠিক সাধন হয়। বসে বসে শাস্ত্রের কথা নিয়ে কেবল বিচার করলে কী হবে? শালারা শুধু পথে যাবারই কথা বলে – ঐ নিয়ে মরছে - মর শালারা, ডুব দেয় না। যদি বল, ডুব দিলেও হাঙ্গর কুমীরের ভয় আছে - কাম ক্রোধাদির ভয় আছে - হলুদ মেখে ডুব দাও। তারা কাছে আসতে পারবে না। বিবেক বৈরাগ্য হলুদ।" – শ্রীরামকৃষ্ণ।

ডুব দেওয়া – সহস্রারে পুকুর দেখতে পাওয়া যায়, সেখানে ডুব দিয়ে নিগমের অনুভূতিসমূহ লাভ। যদি বল ডুব দিলে হাঙ্গর কুমীরের ভয় আছে – অনুভূতির মর্মার্থ ধরতে না পেরে নিজের জীবত্ব দ্বারা প্ররোচিত হয়ে ভুল ব্যাখ্যা ক'রে সাধন পথ থেকে সাধক বিচ্যুত হতে পারে।

এরূপ কয়েকটি অনুভূতির উদাহরণ —

১) স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ – এই তিনটি দেহ অতিক্রম করে মহাকারণে লয় হলে সিদ্ধিলাভ হবে। এর প্রতীক হিসাবে তিনটি নরবলি দেবার নির্দেশ এলো স্বপ্নে।

২) জগতের প্রতীক এক রমনী আশ্রয় চাইছে সাধকের কাছে। এরূপ দর্শনে সাধকের বিভ্রান্তি আসতে পারে।

৩) অনার্যকৃষ্টি পরিত্যাগের কথা বোঝাতে মামাকে কেটে ফেলার নির্দেশ এলো স্বপ্নে।

৪) দেহজ্ঞান নাশ বা ব্যষ্টির সাধন অতিক্রম করে অলৌকিক শক্তির অধিকারী হবার বার্তা হিসাবে স্বপ্নে মাকে কেটে ফেলার নির্দেশ হল।

৫) আত্মাসন্তান লাভ হ'ল বোঝাতে দেখাল সন্তান হয়েছে - খুব সুন্দর - তার প্রতি তীব্র আকর্ষণ হচ্ছে, এরূপ স্বপ্ন দর্শনের পর সন্ন্যাসী সাধক বিয়ে করে বসল।

হলুদ মাখা – ঠিক ঠিক বৈরাগ্য জাগা - শ্রীরামকৃষ্ণ বা শ্রীজীবনকৃষ্ণকে ভিতরে দেখে তাঁর সত্তা লাভ।

✻ Absolute equality and Abstract equality – হনুমানের

Abstract equality আর রামের Absolute equality. হনুমান রামের ভিতর নিজেকে হারিয়ে ফেলে ক্ষণিকের জন্য। তখন বোধ হয় – তুমিই আমি, আমিই তুমি। পরে সে আবার হনুমান। তখন বোধ হয়, তুমি পূর্ণ, আমি অংশ। হনুমানের ভিতর রামের প্রতিবিম্ব। তার ভিতর রাম নেই। কিন্তু রামের ভিতর হনুমান আছে। তাঁর Absolute equality, মনুষ্যজাতির প্রাণের নির্যাস তার ভিতর সংকলিত। তাই মনুষ্যজাতিকে তিনি ভিতরে পেয়েছেন। তাই মিঠু বসাক স্বপ্ন দেখছেন – শ্রীজীবনকৃষ্ণ বুক চিরে দিলেন আর তার ভিতর দ্রষ্টা ঢুকে গেলেন। স্নেহময়ও স্বপ্ন দেখলেন, দেহ ছেড়ে তার প্রাণকণা জীবনকৃষ্ণের ভিতর ঢুকল – জীবনকৃষ্ণ খেলছেন, দ্রষ্টাও তা জীবনকৃষ্ণের ভিতরে থেকে উপভোগ করছেন। একটু পর জীবনকৃষ্ণের আর খেলতে ইচ্ছা করল না, তখন দ্রষ্টা তার আগের দেহে প্রবেশ করে পূর্বাবস্থা ফিরে পেলেন। শাশ্বতী মল্লিকও দেখলেন, বিরাট পুরুষ শ্রীজীবনকৃষ্ণ দু'হাত বাড়িয়ে তাকে যেন কাছে যাওয়ার ইঙ্গিত করছেন। দ্রষ্টা ছুটে গিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরলেন। জীবনকৃষ্ণ দু'হাত দিয়ে তাকে ধরলেন। দ্রষ্টার মনে ফুট কাটল – ইনি এক (Absolute one) আর আমরা সবাই এনার সাথে এক হয়ে আছি (Abstract equality)। শ্রীজীবনকৃষ্ণ মিঃ মেরোজীকে এক চিঠির শেষে লিখেছিলেন, "মাঝে মধ্যে অনুভূত তোমার আপন সত্তা শ্রীজীবনকৃষ্ণ (for ever & anon, your own self sri Jiban krishna)।" যার Absolute equality তার ঈশ্বরত্ব perpetual - স্থায়ী। তিনি যেন সমুদ্র হয়ে উঠেছেন। আর যাদের Abstract equality তারা মাঝে মাঝে ঐ সমুদ্রে ডুব দেয় আবার ওঠে। একযুগে একজনেরই Absolute equality লাভ করা সম্ভব।

✻ কলকাতার কাঠডাঙার মেয়ে শক্তি-র একটি স্বপ্ন হ'ল। তিনি দেখলেন, রামবাবু ওনার হাতে একগোছা চাবি দিয়েছেন। ওটা নিয়ে পথ দিয়ে হেঁটে যেতে যেতে দ্রষ্টার খুব ভারী বোধ হতে লাগল। পরের দৃশ্যে দেখলেন অফিসে গেছেন। বস (Boss) বললেন, তোমার কাজ যদি একটু দেখে দিই, সংশোধন করে দিই তাহলে তোমার কেমন লাগবে? দ্রষ্টা বললেন, খুব ভাল লাগবে। আপনি অবশ্যই সংশোধন করে দেবেন। আমি খুশি হব।......

রাম অর্থাৎ একের মহিমার নানা দিক জানার, রহস্য উদ্ঘাটনের শক্তি দিয়েছেন দ্রষ্টাকে। কিন্তু এককভাবে এগোলে তা সম্ভব হবে না। তাই ভারী বোধ হচ্ছে। সম্মিলিতভাবে চর্চা করতে হবে। তখন Boss অর্থাৎ ভগবান ভুল সংশোধন করে দেবেন – কারও না কারও দর্শনের মাধ্যমে।

একটি উদাহরণ – বীরভূমের গড়গড়িয়া গ্রামে কথামৃত (৪.১.২) থেকে পাঠ হচ্ছিল – "কোলা ব্যাঙটা মুমুর্ষু অবস্থায় বলল, যখন সাপে তাড়া করে তখন রাম রক্ষা কর বলে চিৎকার করি। কিন্তু এখন রামের ধনুক বিঁধে মরে যাচ্ছি, তাই চুপ করে আছি।"

ব্যাখ্যা হ'ল – পরিবেশ আঘাত করলে মানুষ "রাম রক্ষা কর" বলে। কিন্তু বেদান্তের সাধনে অহং নাশ হলে, আমি ব্রহ্ম (অহং ব্রহ্মাস্মি) জ্ঞান হলে কোন ভয় থাকে না।.....

অমনি পার্থ দাস নামে একটি ছেলে বলল, এই মাত্র সে দর্শন করল, পাঠকের পাশে শ্রীজীবনকৃষ্ণ বসে রয়েছেন। তিনি পাঠককে বললেন, "ব্যাখ্যা ঠিকঠাক বল!"

এই দর্শন শোনার পর পাঠকের মনে নতুন ব্যাখ্যা জাগল। তিনি বললেন, সাপ – বিষাক্ত পরিবেশ। সংসারে যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাবার জন্য সাধক রামের (শ্রীভগবানের) কৃপা প্রার্থনা করে। রাম রক্ষা করো বলে চিৎকার করে। আর যখন বোঝে আঘাত দিচ্ছেন স্বয়ং রাম, তখন তাঁর অপার মহিমার কথা ভেবে বিস্ময়ে চুপ করে যান। মনে মনে বলেন, "দুঃখ সে যে পরশ তব।"

আর দেহতত্ত্বে ব্যাখ্যা ঃ– সাপ অর্থাৎ কুণ্ডলিনী জেগে উঠলে সাধকের ভক্তি লাভ হয়। তার জীবত্ব কমে। কিন্তু পুরোপুরি যাতে জীবসত্তা চলে না যায় যাতে অন্তত সাত্ত্বিক ভোগটা চলতে থাকে তার জন্য ভক্ত "রাম রক্ষা কর" বলে প্রার্থনা করে। আর যখন রামের সত্তা লাভে সাধকের জীবসত্তা মারা যায় তখন সে কার কাছে প্রার্থনা জানাবে ? তখন সে তো আত্মিকে রাম হয়ে গেছে যদিও ব্যবহারিক জগতে পৃথক সত্তা আছে।

✻ শিখণ্ডী ঃ– যুদ্ধকালে ভীষ্ম বুঝতে পারলেন অর্জুনের সারথি শিখণ্ডী নয় – অর্জুন স্বয়ং শিখণ্ডী, যোদ্ধা আসলে কৃষ্ণ। তাই পরে দেখা গেল কৃষ্ণের দেহ যাবার পর অর্জুন গাণ্ডীব তুলতেই পারল না। ভীষ্ম এই সত্য বুঝে সহজভাবে নিজের পরাজয় বরণ করে নিল। শিখণ্ডীরা নপুংসক – অর্থাৎ বাইরে পুরষের আকৃতি কিন্তু অন্তরে নারীর প্রকৃতি – ভক্ত। ভক্তের মধ্যে দিয়ে ভগবান নিজের মহিমা প্রকাশ করেন। গল্পে আছে শিখণ্ডী বাইরের জগতে চরম মানসিক আঘাত পেয়ে অন্তর্মুখ হয়, ঈশ্বরচিন্তায় রত থেকে তার নবজন্ম লাভ হয়। উপলব্ধি করে জগতের কর্তা এক ঈশ্বর, সে শিখণ্ডী মাত্র – উপলক্ষ্য মাত্র।

✻ অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রকে বিয়ে করে স্বামীভক্তি প্রদর্শনের জন্য গান্ধারী নিজের চোখেও কাপড় বেঁধে থাকলেন সারাজীবন।

অন্ধ ধৃতরাষ্ট্র এখানে সংস্কারাচ্ছন্ন গুরুর প্রতীক – যার সত্যস্বরূপ ঈশ্বরের দর্শন লাভ হয়নি। এরূপ মানুষগুরুর প্রতি অন্ধভক্তি ভক্তকে সারাজীবন সংস্কারাচ্ছন্ন করে রাখে, তিনিও সত্য দর্শনে বঞ্চিত হন।

পাঠ পরিক্রমা

গত ৫/৬/২০১২ তারিখে কাষ্ঠডাঙায় অতনু মাইতিদের বাড়িতে সন্ধ্যাকালীন পাঠের আসরে পাঠকের বক্তব্যের কিছু অংশ এখানে উল্লেখ করা হ'ল।

আলোচনা শুরু হ'ল শ্রীজীবনকৃষ্ণ বিরচিত "ধর্ম ও অনুভূতি" গ্রন্থ থেকে যেখানে শ্রীরামকৃষ্ণ অসুস্থ রাখালকে বলছেন, "রাখাল তুই জগন্নাথের প্রসাদ খা।" জীবনকৃষ্ণের দেওয়া অমৃতময় বিশ্লেষণের সূত্র ধরে পাঠক বললেন, আপাতদৃষ্টিতে অতি সাধারণ এই বক্তব্যের মধ্য দিয়েই ভক্তের প্রার্থনার বিষয়টি তুলে ধরেছেন। প্রসাদ গ্রহণের মধ্য দিয়ে অন্তরের এই ভাবটি জানানো হয় যে আমি জগতের নাথ শ্রীভগবানের শরণাগত, তাঁর কৃপা প্রার্থী। তিনি দেহে রুদ্র রূপে প্রকাশ পেয়েছেন, এবার শান্ত হ'ন। ঋষিরা বলতেন, "রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যম্।" হে রুদ্র তোমার দাক্ষিণ্যমূর্তির দ্বারা আমাকে সর্বদা রক্ষা কর। এই প্রসন্নতা প্রার্থনার স্থূল প্রতীকি আচরণ হল প্রসাদ খাওয়া। মজার ব্যপার হ'ল ঈশ্বরের প্রতি এই দৃঢ় বিশ্বাসের বলে কিছু ক্ষেত্রে ভক্তেরই আত্মিক শক্তির দ্বারা তার অসুখ সেরে যায়। একে বলে Faith cure. Your faith has cured you— বলেছেন যীশু। কুসংস্কারাচ্ছন্ন মানুষ সেটা বোঝে না। সংস্কারাচ্ছন্ন মন নিয়ে সে ভাবল বাইরে স্থূলে প্রসাদ গ্রহণ করলাম বলে বোধ হয় অসুখ ভাল হ'ল। স্থূলবুদ্ধিতে আমরা ভাবব রামকৃষ্ণ প্রসাদ খেতে বলেছেন। একদম তা নয়। কেউ বলবেন শ্রীরামকৃষ্ণ নিজে তো দীর্ঘদিন জগন্নাথের আট্‌কে প্রসাদ খেয়েছেন। তার জীবনের এই দিকটি যদি বিশ্লেষণ ব্যতিরেকে আমরা গ্রহণ করি তাহলে আমাদের ঠকতে হবে। প্রসাদ গ্রহণ যদি মুখ্য হ'ত তাহলে শেষজীবনে কেন তিনি তা বন্ধ করলেন? তিনি বললেন, কালে প্রসাদ খাওয়া উঠে গেল। আবার বললেন, এখন প্রসাদী মাংসও খেতে পারি না। তার জীবনের বৈশিষ্ট্য ছিল "চরৈবেতি"। প্রসাদ গ্রহণের মূল কেন্দ্রিয় ভাবনাটি তার জীবনে বাস্তবায়িত হয়েছে। দেহে সত্য ফুটে ওঠায় বুঝেছেন দেহের ভিতর ভগবান আছেন এবং দেহস্থ ভগবানের প্রসন্ন হয়ে ওঠার পরিচয় পেয়েছেন, প্রকৃত প্রসাদ পেয়েছেন। তাই ঠাকুর বললেন, "কালে প্রসাদ খাওয়া উঠে

গেল।" মিথ্যাচারকে প্রশ্রয় দিয়ে কল্পিত প্রসাদ খাওয়ার প্রয়োজন হয় না। দৈনন্দিন জীবনে পাঠচক্রে উপস্থিত হয়ে শ্রীভগবানের প্রসন্নতার কথা আমরা বহু মানুষের দেবস্বপ্ন মারফৎ জানতে পেরেছি। তার প্রসন্নতার পরিচয় পেতে অন্ধ বিশ্বাসের বিন্দুমাত্র প্রয়োজন পড়ছে না। নিজেকে কৃপাপ্রার্থী বোঝানোর জন্যও বাইরে প্রসাদ খাওয়ার দরকার নেই। তাছাড়া লোকে পার্থিব চাহিদা পূরণের প্রার্থনা নিয়ে প্রসাদ খায়। কিন্তু ঠাকুর বলেছেন, ভগবানের কাছে কিছু চাইতে নেই। শুধু বলতে হয়, তুমি কে, তুমি কেমন তা জানিয়ে দাও। তোমার ঐশ্বর্য চাই না, শুধু তোমাকে চাই। তাই অর্জুন শুধু কৃষ্ণকে চেয়েছিল, তার নারায়ণী সেনা চায়নি। পরবর্তীকালে সুর চড়িয়ে জীবনকৃষ্ণ বলেছেন, কার প্রসাদ কে খায় ! মানুষটা নিজেই যে ব্রহ্ম।

পরে পাঠ হ'ল – দক্ষিণেশ্বরে গেরুয়া কাপড় পড়া একজন অপরিচিত ব্যক্তি এলেন এবং আসন গ্রহণ করলেন। এমতাবস্থায় রামকৃষ্ণের সমাধি ভঙ্গ হল। ভাবস্থ হয়ে আপনা আপনি তিনি বললেন, "আবার গেরুয়া কেন? একটা কি পড়লেই হল?"

জীবনকৃষ্ণের বিশ্লেষণের সূত্র ধরেই পাঠক বললেন, সন্ন্যাস একটি আত্মিক অবস্থা। দেহ আত্মা পৃথক হলে মানুষ সন্ন্যাসী হয়। তখন দেহ আত্মা পৃথকের যোগজ লক্ষণ প্রকাশ পায় দেহে। তাই প্রকৃত সন্ন্যাসী বাইরে ভেক ধারণ করে মানুষকে বোঝাতে চাইবেন না তার আত্মিক অবস্থা, আর পারবেনও না। অপরপক্ষে যারা গেরুয়া বা অপর কোন চিহ্ন ধারণ করেন তারা প্রকৃত তত্ত্ব জানেন না এবং মানুষকে বিভ্রান্ত করেন। তারা নিজেদের সাধারণ মানুষের থেকে পৃথক গোষ্ঠীভুক্ত এক অভিজাত শ্রেণীর মানুষ মনে করেন, তারা ভাবেন, তারা ঈশ্বরের কৃপার একচেটিয়া অধিকারী।

প্রকৃত সন্ন্যাসীর জীবন আমরা প্রথম প্রত্যক্ষ করলাম শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনে। তিনি কখনও গেরুয়া ধারণ করেননি। বেদান্ত সাধন কালে তার গুরু তোতাপুরী গেরুয়া কাপড় পড়তে বললে ঠাকুর বললেন, আমি গেরুয়া পরতে পারব না। আমার গর্ভধারিনী মা যে এখনও বেঁচে আছেন। তিনি কষ্ট পাবেন। তুমি অন্য উপায় বল। আমার পক্ষে গেরুয়া পরা সম্ভব নয়। তাতে যদি বেদান্ত

না শেখাও তো শিখব না। তোতাপুরী বাধ্য হলেন প্রিয় শিষ্যের অনুরোধ মেনে গেরুয়া ছাড়াই বেদান্ত শিক্ষা দান করতে।

বেদান্তবাদী সন্ন্যাসী বলেন, জগৎ স্বপ্নবৎ। এটি বেদান্তের সাধনের চতুর্থ স্তরের অনুভূতি। জগৎ স্বপ্নবৎ অনুভূতি হলে সাধকের দেহে ও মনে নির্লিপ্ততা আসে। গেরুয়া সেই নির্লিপ্ততার তথা বৈরাগ্যের প্রতীক মাত্র।

শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন, আমার সব নজিরের জন্য। শঙ্করাচার্য ও মহাপ্রভু যখন গেরুয়া নেন তখন তাদের গর্ভধারিনীরা জীবিত ছিলেন। তাহলে শ্রীরামকৃষ্ণ মায়ের কষ্ট হবে যুক্তি দেখিয়ে গেরুয়া নিলেন না কেন? কারণ তিনি নতুন দৃষ্টান্ত গড়লেন। জগতকে জানালেন, এইসব বাহ্যচিহ্নের কোন প্রয়োজন নেই। সন্ন্যাস রহস্য যে তার জানা হয়ে গেছে। সন্ন্যাসীর ''শুকনো সুপারী বা খোড়ো নারকেলের মত অবস্থা'' তিনি দেহেতে অনুভব করেছেন বহুবার। তথাকথিত গেরুয়াধারীর উদ্দেশ্যে কবীরের এক দোঁহার অনুসরণে কবি নজরুল বলেছেন, ''মন না রাঙিয়ে বসন রাঙায়ে কী ভুল করেছ যোগী।''

এযুগে সর্বত্যাগী জীবনকৃষ্ণের সত্তা পেয়ে আপনার ভিতর যদি বৈরাগ্য আসে, ভগবৎ অনুশীলন ও মননের প্রতি তীব্র ব্যাকুলতা জাগে , অপরে আপনার এই অবস্থার প্রমাণ স্বরূপ হয়তো গেরুয়া পরা অবস্থায় আপনাকে স্বপ্নে দেখবে। অপরের স্বপ্নে আপনার বৈরাগ্য ও নিরাসক্ত অবস্থার প্রমাণ ফুটে উঠবে।

''ধর্ম ও অনুভূতি'' গ্রন্থ থেকে পুনরায় পড়া হ'ল। শ্রীজীবনকৃষ্ণ বললেন, ঠাকুর আমার আদর্শ। শ্রীবুদ্ধ, শঙ্করাচার্য ও মহাপ্রভু – এই তিনজনের কথা উল্লেখ করে ২৫০০ বছরের অতীত অধ্যাত্ম সাধনার ইতিহাসটি পর্যালোচনা করে শ্রীরামকৃষ্ণের সাথে তাদের পার্থক্য কোথায় তা তিনি আমাদের ধরিয়ে দিয়েছেন।

শ্রীবুদ্ধ ধর্মজগতে কৃচ্ছ্রসাধনের সূচনা করেছেন। কানে ফু দেওয়া অর্থাৎ গুরুগিরির নতুন ধারা প্রচলন করলেন। আর একদল শ্রমন সৃষ্টি করলেন যারা মাথা মুড়িয়ে পীত রঙের কাপড় পরে সংসার ত্যাগ করে মঠে এসে নির্বান লাভের সাধনা করবে। আর বলা হ'ল, সংসারীদের ধর্ম হ'ল তাদের খাবার যোগানো।

শঙ্করাচার্য বৌদ্ধ ধর্মের শ্রমণ প্রথার অনুকরণে হিন্দুধর্মে দশনামী সন্ন্যাসী সম্প্রদায় সৃষ্টি করলেন। পণ্ডিত শিষ্যবর্গ পরিবৃত শঙ্করাচার্যকে সাধারণ মানুষ দূর থেকে নমস্কার করল। এই সন্ন্যাসীরা সাধারণ মানুষের জীবনযাপন করেন না, তারা সাধারণের আপনারজন হতে পারলেন না। বৈদিক যুগের ঋষিরা কিন্তু গৃহী ছিলেন, সাধারণের পোষাকই পরতেন। বশিষ্ট, বিশ্বামিত্র, যাজ্ঞবল্ক্য ইত্যাদি ব্রহ্মবিদ পুরুষরা সকলেই ছিলেন বিবাহিত। তথাকথিত সন্ন্যাসীদের মত তাদের জীবন ছিল না। তারা মনে ত্যাগী ছিলেন।

এলেন মহাপ্রভু। তিনি কৃচ্ছ্রসাধনের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেছেন। শ্মশানের ছেঁড়া ন্যাকড়া গেরুয়ায় ছুপিয়ে নেংটি করে পরতেন। বিছানায় শুতেন না, মাটিতেই শুতেন। ধাতুদ্রব্য স্পর্শ করতেন না, তাই কলাপাতায় খেতেন। ''গোরা নারীর ছবি হেরবে না'' – মা ছাড়া অন্য নারী দর্শন করবেন না। কিন্তু প্রিয় ভক্ত নিত্যানন্দকে বললেন, তুমি সংসারে গিয়ে হরিনাম কর। নিত্যানন্দ সংসারী হলেন। প্রভুর কথায় ও আচরণে ফারাক দেখা গেল।

এলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। মহাপ্রভুর কথা 'আপনি আচরি ধর্ম শিখায় অপরে' – অন্তরে ধারণ করলেন। সাধারণ মানুষের মত খাওয়া দাওয়া পোষাক পরিচ্ছদ তার। বিবাহ করেছেন। কিন্তু সর্বক্ষণ হরিকথা বলেন। সাধারণের আদর্শ। তিনি বললেন, চাঁদামামা সকলের মামা। অর্থাৎ ভগবান সকলকার। সন্ন্যাসীদের একচেটিয়া নয়। নতুন যুগের সূচনা হ'ল।

ঠাকুর বললেন, আমি একটা ছাঁচ রেখে গেলাম। তাতে ফেলে নিজেদের গড়ে নাও। কিন্তু কেউই সেই আদর্শে নিজের জীবন গড়তে পারলেন না। কেননা বাইরের কোন আদর্শ চেষ্টা করে নিজের জীবনে রূপদান করা যায় না। পুরানকার শুকদেবের চরিত্র সৃষ্টি করলেন। মানুষ সেই আদর্শ নিতে পারছে না দেখে আবার জনক রাজার চরিত্র সৃষ্টি করলেন। যার জীবনে যোগ ভোগ দুই-ই ছিল। কিন্তু তাও নেওয়া গেল না। ঠাকুরের সঙ্গধন্যরাও ঠাকুরের ভাবধারায় (ছাঁচে) তাদের জীবন গড়ে নিতে পারল না। ঠাকুরের বাহ্যপুজো উঠে গিয়েছিল। আর কার তা উঠেছিল? ঠাকুরের কথার দুটি অর্থ আছে – শব্দার্থ ও মর্মার্থ।

ঠাকুরের স্নেহধন্যরা কেউই তার কথার মর্মার্থ, দেহতত্ত্বে ব্যাখ্যার অনুশীলন করলেন না কেন? ঠাকুরের কথার মূল বক্তব্য অধরাই থেকে গেল। রামকৃষ্ণ কথামৃতে কোথাও কোথাও পরস্পর বিরোধী কথা পাচ্ছি। কিন্তু তা আপাতদৃষ্টিতে স্ববিরোধী (contradictory)। প্রকৃত বক্তব্য জানলে কথাগুলি যে স্ববিরোধী নয় তা পরিষ্কার হয়ে যেত। ঠাকুরের অধিকাংশ ভক্তরা এসব প্রসঙ্গ "অনন্ত ভাবময় ঠাকুর আমার" বলে এড়িয়ে গেছেন।

মাষ্টার মশায়ের একটি দেবস্বপ্ন শুনে ঠাকুর বললেন, "আমার রোমাঞ্চ হচ্ছে। তুমি শীঘ্র মন্ত্র লও।" আপাতদৃষ্টিতে মনে হচ্ছে তিনি গুরুমন্ত্র নিতে বলেছেন। কিন্তু মাষ্টার মশাই অন্যসময় ঠাকুরের কাছে শুনেছেন, মানুষ কখনও গুরু হতে পারে না, সচ্চিদানন্দই গুরু। তাই তিনি গুরুমন্ত্র নিতে ছুটলেন না। তিনি ঠাকুরের কথার মানে করলেন যে, তিনি এখন উপযুক্ত হয়েছেন ঈশ্বরের বাণী ধারণের জন্য, যে বাণী ঠাকুরের শ্রীমুখ থেকে ধ্বনিত হচ্ছে। মন্ত্রজ্ঞানে ঠাকুরের মুখনিঃসৃত বাণী সকল তিনি লিখে রাখলেন দিনলিপিতে। এই অমৃতবাণী স্মরণ মননে মন অন্তর্মুখ হয় – জাগতিক বিষয়ে লিপ্ত মন মুহুর্তে ঈশ্বরে নিবিষ্ট হয়। ঈশ্বর, আত্মা ও ব্রহ্ম তিনই এক। আত্মা তথা নিজের অধীন হয় মন। তাই ঠাকুরের কথাগুলিই মন্ত্র। কেননা ঠাকুর বলেছেন – মন্তোর মানে – মন তোর।

তবুও ঠাকুরের সকল কথার মর্মার্থ সেকালে কেউ ধরতে পারলেন না। পরবর্তীকালে এলেন শ্রীজীবনকৃষ্ণ। রামকৃষ্ণকে বারবার ভিতরে দেখে রামকৃষ্ণের ছাঁচে গড়া হয়েছিল তাঁর জীবন। তার সত্তা পেতে গেলে যে ভিতরে তাঁকে দেখতে হবে এই মূলসূত্রটাই মানুষের এতদিন অজানা ছিল। জীবনকৃষ্ণ বাইরে থেকে রামকৃষ্ণকে জেনে বুঝে তাকে অনুসরণ করেননি। তিনি ১২ বছর ৪ মাস বয়সে প্রথম শ্রীরামকৃষ্ণকে স্বপ্নে দেখেন। তখন জানতেন না কাকে দেখলেন। পরে ১৫ বছর বয়সে কথামৃত দেখে জানতে পারেন ঐ স্বপ্নদৃষ্ট পুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব। তিনি ধীরে ধীরে ভিতরে রামকৃষ্ণময় হয়ে উঠতে লাগলেন।

১৯৪৩ সালে কালী ব্যানার্জী লেনের ভাড়াবাড়ীতে আসার আগের দিন তিনি স্বপ্নে দেখলেন, ঐ বাড়িতে খাটে শুয়ে আছেন শ্রীরামকৃষ্ণ। দরজায়

দাঁড়িয়ে সারদা দেবী। তিনি আঙুল দিয়ে দেখাচ্ছেন ঠাকুরকে। পরদিন ঐ ঘরে খাটে শুয়েই তিনি অনুভব করলেন, তিনি যেন দেহসমেত রামকৃষ্ণ হয়ে গেছেন। রামকৃষ্ণের সত্তা পাওয়া পূর্ণ হল। এরপর থেকে তার ঘরে ঢুকেই অনেক ভক্ত স্থূলে দেখতেন খাটে স্বয়ং রামকৃষ্ণ শুয়ে বা বসে আছেন। কেউ বা vision -–এ কেউ বা তা স্বপ্নে দেখতেন। তার মুখে রামকৃষ্ণের জীবন ও বাণীর বিশ্লেষণ শুনে তারা মুগ্ধ হতেন।

একদিন "পরম পুরুষ" শ্রীরামকৃষ্ণের লেখক অচিন্ত্য সেনগুপ্ত মহাশয় এলেন জীবনকৃষ্ণের ঘরে। দু'একটি কথার পর জীবনকৃষ্ণ হুঙ্কার দিয়ে বললেন, 'শ্রীরামকৃষ্ণ শুধু আমার ঠাকুর। নিন আমার কথা কাটুন।' উনি কোন কথা বলতে পারলেন না। শ্রীজীবনকৃষ্ণ রামকৃষ্ণকে যেভাবে পেয়েছেন সেভাবে আর কারও পাওয়া হয়নি। তাই বললেন – "আমার ঠাকুর।"

শ্রীরামকৃষ্ণ কালী মন্দিরে ছিলেন, কঠোর সাধনা করেছেন, অনেক বড় বড় মানুষ তার সেবা করেছেন - এই সব বাহ্য ঘটনা সংস্কারাচ্ছন্ন মানুষদের বিভ্রান্ত করে। তারা ভাবে ঠাকুর মা কালীর পূজারী, পূজার প্রসাদ খাওয়া ঈশ্বরের কৃপালাভের জন্য একান্ত আবশ্যিক, পঞ্চবটীর মত উপযুক্ত সাধনস্থল প্রয়োজন এবং কোন বড় মানুষের পৃষ্ঠপোষকতা প্রয়োজন। এই সব ভ্রান্তি দূর করে শ্রীরামকৃষ্ণের মহিমা তিনি প্রতিষ্ঠা করতে লাগলেন। শ্রোতারা স্বপ্নে জীবনকৃষ্ণকে দেখে জীবনকৃষ্ণময় হয়ে জীবনকৃষ্ণের বিশ্লেষণ বুঝতে সক্ষম হত।

বাইরে চাক্ষুষ না দেখে না শুনেও বহু মানুষ জীবনকৃষ্ণকে স্বপ্নে দেখছে। এবার ধরা পড়ল রামকৃষ্ণের আদর্শের সীমাবদ্ধতা তথা ব্যষ্টির সাধনের সীমাবদ্ধতা ও নতুন একটি আদর্শ জীবনের প্রয়োজনীয়তা। ব্যষ্টির সাধনে অনেক নিষ্ঠা কাষ্ঠার প্রয়োজন যা সাধারণ মানুষের পক্ষে দুরুহ। যেমন অপরিগ্রহ অর্থাৎ অপরের কাছ থেকে কখনও কিছু না নেওয়া, সর্বদা ঈশ্বরীয় অনুশীলনের মধ্যে থেকে দেহকে যোগযুক্ত রাখা, নারীসঙ্গ ত্যাগ ইত্যাদি বহুবিধ অনুশাসন মেনে চলা। আর সেভাবে চললেও ব্যষ্টির সাধনে সাধকের আচরণ অন্যদের কাছে অস্বাভাবিক ঠেকে, লোকে তাকে পাগল ভাবে। এছাড়া ব্যষ্টির সাধনে স্বাতন্ত্র

বোধ থাকে, ছোট বড়োর ভেদ জ্ঞান যায় না, পূর্ণ অহংনাশ হয় না। ফলে মানুষের সত্যিকার কল্যাণ হয় না। তাই শ্রীজীবনকৃষ্ণ বললেন, আমি ব্যষ্টির সাধন ত্যাগ করলাম। তোরা অর্থাৎ মনুষ্যজাতি আর আমি আত্মিকে এক। ঠাকুর বলেছিলেন, "মানুষের জীবনের উদ্দেশ্য ভগবান দর্শন, ভগবান লাভ।" আমি বলি, "মানুষের জীবনের উদ্দেশ্য আত্মিক একত্ব লাভ।" তিনি রামকৃষ্ণময় জীবনকৃষ্ণকে ছাড়িয়ে নতুন এই আত্মিক অবস্থায় বহুত্বে একত্ব স্থাপনকারী পরম এক জীবনকৃষ্ণ হয়ে উঠলেন। নতুন আদর্শ পেল মানুষ।

শ্রীজীবনকৃষ্ণের বোধের জগতে প্রবেশ করতে হলে, তাঁর আদর্শ আমাদের জীবনে ফুটতে হলে অন্তরে তাঁর চিন্ময়রূপ ফোটা চাই। আপনা হতে তাকে অন্তরে পেয়ে তার সত্তা লাভ করলে তার ছাঁচে নিজেকে গড়া সম্ভব হবে। বস্তুত তিনিই মানুষকে তাঁর ভাবধারায় গড়ে নেবেন। সর্বসাধারণের আদর্শ জীবনকৃষ্ণের ছাঁচ কিভাবে পাব? উনি বললেন, তোরা আমার ছাঁচ নিয়েই জন্মেছিস। তাই তোদের প্রাণশক্তি তোদের অজ্ঞাতসারে আমার রূপ ধরে ফুটে ওঠে। রামকৃষ্ণকে যেমন আমি না চাইতেই আপনা হতে পেয়েছি, রামকৃষ্ণময় হয়েছি, তেমনি এযুগে তোরা আপনা হতে আমার রূপ তোদের ভিতর ফুটে উঠতে দেখবি। মানুষ তাঁকে দেখে তার ভাবধারা লাভ করছে। জীবনকৃষ্ণ দ্রষ্টাদের অন্তরে নিজেকে গড়ছেন। এই কাজ নির্বিঘ্নে নিঁখুতভাবে সম্পন্ন হতে পারে যদি দ্রষ্টা আপনা হতে হওয়া তার ও অন্যান্যদের দর্শনগুলি নিয়ে ধৈর্য্য সহকারে অনুশীলন করেন, মনন করেন। বিশ্বকর্মা গোপনে মানুষের ভিতর নিজের অর্থাৎ জগন্নাথের মূর্তি গড়ে তুলছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, ভেবেছিলাম বিয়ে করব, শ্বশুরবাড়ি গিয়ে কত আমোদ আহ্লাদ করব। কিন্তু কোথা থেকে একটা ঝড় এসে সব ওলট পালট করে দিল। জীবনকৃষ্ণের জীবনেও দেখা যায় একজনের কাছ থেকে একটা দেশলাই কাঠি নিয়ে কান খুঁটছেন হঠাৎ শ্রীরামকৃষ্ণ কন্ঠে দৈববাণী হ'ল, অন্যের জিনিস নিয়েছিস কেন, ফিরিয়ে দে। অর্থাৎ ভাবছেন এক, আর জীবনটা বইছে অন্য ধারায়। আপনা হতে তার দেহস্থ চৈতন্য তার জীবনকে অন্য খাতে বয়ে নিয়ে যাচ্ছে। তাই জীবনকৃষ্ণ বললেন, আমার জীবনের কোন আদর্শ যদি

তোরা নিস তা হ'ল এই আপনা হতে হওয়া। মানুষের মনকে অন্তর্মুখী করে অন্তরে তাঁর চিন্ময় রূপ ফুটে উঠবে। সেইসব দর্শন ও অনুভূতি বিশ্লেষণ করার জন্য প্রয়োজন সচল প্রাণবন্ত অনুশীলন। এই অনুশীলনে সকল মানুষের আত্মিক একত্বের পরিচয় পরিস্ফুট হবে, বোধে বোধ হবে। জীবন বদলে যাবে। এটাই আমাদের আদর্শ। শ্রীজীবনকৃষ্ণের বাণীরূপ সমুদ্রে এবং বিভিন্ন মানুষের দর্শন অনুভূতির সমুদ্রে ডুব দিয়ে বোঝা যায় যে তার সব কথাই আমাদের প্রাণের কথা, সব অনুভূতিই মানুষের দেবত্বের তথা আত্মিক একত্বের মহিমার পরিচয় জ্ঞাপক। আর এই এক বোধের উন্মেষেই মানুষের প্রকৃত কল্যাণ।

বেহালার শুভজিৎ মল্লিকের একটি দর্শন উল্লেখ করা হ'ল। ও দেখেছে - এক ভদ্রলোক একটি স্কুলে গেলেন, পরে কলেজে, সেখান থেকে একটি স্কুলে গিয়ে শিক্ষকদের সাথে কথা বললেন – দ্রষ্টা তাকে অনুসরণ করছে কিন্তু কোন কথা হচ্ছে না দুজনের মধ্যে। এরপর ভদ্রলোক কোট টাই পরে বিলেত গেলেন – দ্রষ্টাও গেল – ফিরে এসে আবার একটি অফিসে গেলেন – এবার দ্রষ্টার দিকে ফিরে তাকালেন। দ্রষ্টা দেখলেন, আরে এ যে জীবনকৃষ্ণ! জীবনকৃষ্ণ যা বলতে চাইলেন তা দ্রষ্টার মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল – "এই-ই- বিশ্বরূপ দর্শন।" ..... ঘুম ভাঙলে বুঝলেন জীবনকৃষ্ণের জীবন ও বাণীর পর্যালোচনায় আত্মজিজ্ঞাসুর সব প্রশ্নের উত্তর মেলে। তিনি যে বিশ্বমানব, সর্বসাধারণের আদর্শ মানব। তবে সংস্কারমুক্ত মন নিয়ে তার আত্মিক ও ব্যবহারিক উভয় জীবনের বিশ্লেষণ প্রয়োজন।

এক বয়স্কা ভদ্রমহিলা একটি স্বপ্ন নিবেদন করলেন। তিনি তার বড় ছেলেকে মাত্র ৫ বছরের বাচ্চা ছেলে রূপে দেখছেন। সেই ছেলে তাকে ট্যাঙ্কের জলে বা গঙ্গায় কোথাও স্নান করতে দিচ্ছে না। আরও এগিয়ে স্নানের জল খুঁজতে বলছে। .... এর ব্যাখ্যা করা হল – দেহস্থ চৈতন্য (আত্মা সন্তান) আত্মিক জগতে দ্রষ্টাকে পরিচালনা করছেন। সন্তানরূপী ঐ আপনারজন শ্রীভগবানকে বুঝতে গেলে অন্য কোথাও না গিয়ে পাঠচক্ররূপ জ্ঞানগঙ্গার নিরবচ্ছিন্ন স্রোতধারায় স্নান করতে হবে। নব নব ঈশ্বরীয় জ্ঞানের অন্বেষণ করতে হবে।

যেমন ধরা যাক – শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, একজন আগুন করে দশজনে পোহায়। একজনের অগ্নিবিদ্যা লাভ হলে তার সুফল পায় অন্য বহু মানুষ। অবতারত্ব পর্যন্ত সাধন রামকৃষ্ণ নিজের ভিতর দেখলেন ও আস্বাদন করলেন। অন্য মানুষকে তার সুফল পেতে হলে তার কাছে গিয়ে এই প্রজ্জলিত অগ্নিবিদ্যার তাপ পেতে হ'ত। গিরীশ ঘোষ মাঝরাত্রে ছুটে ছুটে আসছেন, নরেন পরীক্ষার আগে বইপত্র ফেলে ছুটে আসছেন দক্ষিনেশ্বরে। তা সত্ত্বেও বাইরে রামকৃষ্ণের যেটুকু যৌগিক বিভূতি প্রকাশ পেত তা থেকে তারা অনুমান করে নিতেন যে তিনি অবতার। গিরীশকে ঠাকুর বললেন, তুমি যে আমায় অবতার বল, তুমি কি বুঝেছ বল দেখি? অমনি গিরীশ বললেন, ব্যাস বাল্মীকি যার ইয়ত্তা করতে পারেনি তার ব্যাপারে আমি কী বলব? তুমিই সেই ধনুর্ধারী রাম, তুমিই বাঁশী হাতে যমুনা পুলিনে লীলা করেছিলে ইত্যাদি। কিন্তু এতো অনুমান। শ্রীরামকৃষ্ণ তাই বলেছেন, কে থিয়েটারে ম্যানেজারী করে, কে ডাক্তারী করে, তারা বলবে অবতার তবে আমি অবতার? তারা অবতারের কী বোঝে ?

ফলে রামকৃষ্ণের সাধনের তাপ পেলেও রামকৃষ্ণের অভ্যন্তরীণ অবস্থা তারা বুঝল না। ঠাকুরের কথা – কাঠে জ্বাল যতক্ষণ, দুধ ফোঁস করে ফোলে। কাঠ টেনে নিলে কোথাও কিছু নাই। উদ্দীপনা কমে যায়। ঠাকুরের এই কথা স্মরণ করে ঠাকুরের দেহ যাবার কয়েকদিন আগে মাস্টার মশাই ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি চলে গেলে আমাদের কী হবে? তিনি বললেন, কেন গো? তোমাদের চিন্তা কী? আমি গেলেও এক পুরুষ জোরে কাটবে। তাঁর সঙ্গধন্য অনুরাগীদের জীবন তাঁর কৃপা তাপে ঠিক এগিয়ে চলবে। কিন্তু পরবর্তী প্রজন্মের কী হবে? এরজন্য প্রয়োজন পড়ল আর একটি জীবনের যে জীবন থেকে প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে মানুষ শুধু তাপ পাবে না, দেহাভ্যন্তরে পাবে তার দেহে জলে ওঠা আগুনের স্ফুলিঙ্গ তথা ঈশ্বরীয় দর্শন ও অনুভূতি।

ঠাকুরের দেহ যাবার ৭ বছর পর জন্ম নিলেন শ্রীজীবনকৃষ্ণ। ওনার দেহে রামকৃষ্ণ-পরবর্তী আত্মিক বিকাশের ফল স্বরূপ জাতিধর্ম নির্বিশেষে বহু মানুষ তাকে সচ্চিদানন্দগুরু রূপে ভিতরে দেখতে লাগল। পরে ভগবান রূপে, ব্রহ্ম ও পরমব্রহ্মরূপে দেখা চলতে লাগল। তারা লাভ করল তাঁর ব্রহ্মতেজ তথা অগ্নিস্ফুলিঙ্গ।

পরবর্তী ধাপে অর্থাৎ তৃতীয় ধাপে (তাপ পাওয়া ও স্ফুলিঙ্গ পাওয়ার পর) যখন তার ব্যষ্টি সত্তা মনুষ্যজাতির মধ্যে বিলীন হল, তিনি হয়ে উঠলেন অখণ্ড চৈতন্যস্বরূপ – পরম এক। এবার তার ভিতরের আগুন (তার ব্রহ্মত্ব বা একত্ব) ক্রিয়া করতে লাগল অসংখ্য মানুষের দেহকাষ্ঠের ভিতর। আর স্ফুলিঙ্গ নয়, আগুন পেল মানুষ। জীবনকৃষ্ণের দেহে জ্বলে ওঠা আগুন শাশ্বত হলো। তার ব্যক্তিগত দেহ চলে যাওয়ায় কোন ক্ষতির সম্ভাবনা আর থাকল না। বরং এ আগুন ক্রমাগত বর্ধিত জ্বালানী পেয়ে দিনে দিনে আরও বাড়বে। উনি বলতেন, যত বেশী মানুষ আমায় দেখছে, সেকথা এসে আমায় শোনাচ্ছে, ততই আমার আনন্দ বাড়ছে, তেজও বাড়ছে।

নগেনবাবু স্বপ্নে দেখেছিলেন, তিনি শ্রীজীবনকৃষ্ণ-কে প্রণাম করলেন, তখন উনি বললেন, গুরুকে কিছু দিতে হয়। .... স্বপ্ন ভাঙল। স্বপ্ন শুনে জীবনকৃষ্ণ বললেন, ও মশাই গুরুকে দেহ দান করতে হয়, রাবড়ি মিঠাই নয়। তিনি সেই দেহে লীলা করবেন যে!

তাঁর সত্তা পেয়ে তারই অঙ্গীভূত হয়ে আমাদেরও দেহকাষ্ঠ দাউ দাউ করে জ্বলছে ভিতরে। তাই এযুগে "একজন আগুন করে আর দশজনে পোহায়" – একথাটাকে বদলে বলতে হবে "দশজনে আগুন করে আর দশজনে পোহায়।"

শ্রীজীবনকৃষ্ণের পৃথক সত্তা নেই আর। তিনিই মনুষ্যজাতি হয়েছেন। তাই তিনি আগুন করছেন, অন্য অনেকে তাপ পোহাচ্ছে এটা বলা যায় না। কেউ একজন স্বপ্ন বলল, স্বপ্নটার বিভিন্ন দিক বিভিন্ন জনে মিলে হয়ত বিশ্লেষণ করল, এভাবে বহুজনের সক্রিয় অংশগ্রহণ মূলক অনুশীলনের মধ্যে দিয়ে দশজনে আগুন করে ও দশজনে তাপ পোহায়।

এরপর আবার স্বপ্ন আলোচনা হল। রণিতা মাইতি স্বপ্নে দেখেছে, একটা মানসিক হাসপাতালে গেছে। ৪/৫ জন বন্ধু ওর সাথে গেছে। সেখানে প্রচুর রোগী। তাদের সাথে ও যেন কথা কইছে। .... ওর সাথে কথা বলে রুগীরা সুস্থ বোধ করছে।

ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে আলোচনা হল, মানুষ অমৃতের পুত্র। এই সত্য যারা

ভুলে থাকে ও নানা সংস্কার আশ্রয় করে তারাই মানসিক রোগী। মানুষটা স্বাভাবিক হলে সে উপলব্ধি করতে পারবে যে প্রতিটি মানুষ দেবতা। তারা আত্মিকে এক ও অভিন্ন। কেউ ছোট নয়, কেউ বড় নয়। দ্রষ্টার ন্যায় বহু মানুষ যারা এই সত্য উপলব্ধি করেছে তারা অপরের মনে সংস্কার মুক্তিতে সহায়ক হবেন। মানুষকে স্বাভাবিক জীবনছন্দে ফিরতে সাহায্য করবেন।

বিশ্বজনীন ধর্মকে ভিত্তি করে, একত্ব বোধ দ্বারা পরিচালিত হয়ে, আমাদের সকলের জীবনে প্রকৃত সৌন্দর্য যেন ফুটে ওঠে – এই প্রার্থনা জানিয়ে পাঠ শেষ হল।

স্মৃতিচয়ণ

শ্রীজীবনকৃষ্ণের পূতসঙ্গধন্য কিছু মানুষের টুকরো কিছু স্মৃতিকথা এখানে নিবেদন করা হল।

দিলীপ কুমার ঘোষ

(১) সময়টা ছিলো ১৯৬৫ সালের জানুয়ারী মাস। বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা হতে হতে জীবনকৃষ্ণ ঠাকুরের ভক্ত গৌরীমার কথা বললেন। গৌরীমা ছিল দুর্দান্ত প্রকৃতির মানুষ। কী রকম দুর্দান্ত প্রকৃতির, একটা ঘটনা বলি শোন, তাহলেই বুঝতে পারবি। একবার কোন এক ভক্ত রাখাল মহারাজকে একটা সোনার গড়গড়া দিয়েছিলো। রাখাল মহারাজ ইজিচেয়ারে বসে বসে সেই গড়গড়াতে তামাক খাচ্ছে। আর সেইদিনই গৌরীমা মঠে এসে হাজির। গৌরীমা তাই না দেখে হাত পা নেড়ে বলতে শুরু করলেন – ও রাখাল তোরা হলি কি! যে ঠাকুরের সোনা ছুঁলে হাত পা বেঁকে যেত, সেই ঠাকুরের ছেলে হয়ে কিনা তুই সোনার গড়গড়াতে তামাক খাচ্ছিস। রাখাল মহারাজ, যে মঠের প্রেসিডেন্ট তারই সামনে দাঁড়িয়ে তিনি একথা বলছেন! ভেবে দেখ্।

(২) ১৯৫৬ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের একদিন জীবনকৃষ্ণের ঘরে আছি। ঘরের অনেকেই ধ্যানে বসলেন। জীবনকৃষ্ণ তখন বেঙ্গল বোর্ডিং-এর এক অভিজ্ঞতার কথা শোনালেন। "বেঙ্গল বোর্ডিং-এ থাকার সময় ওখানকার সবাই আমাকে গোঁসাই ঠাকুর বলত। কি করে ঠাউরেছিলো কে জানে। আমি কিন্তু সেখানে ধ্যান ট্যান করতুম না, পাছে কেউ জানতে পারে। কিন্তু তা বললে কি হবে, একদিন দেখছি বেঙ্গল বোর্ডিং–এর দু'ধারে বাড়ীগুলোতে লোকেরা ধ্যান করতে বসেছে। ওরে যেখানে যাব, সেইখানেই এমন হবে। ......"

নিতাই পাত্র

১৯৫৭ সালের মার্চ মাসের একদিনের কথা মনে পড়ছে। হারাধন ব্যানার্জী বলে একজন ভক্ত জীবনকৃষ্ণকে বলছেন – 'দেখুন আমি শুধু পাঠ শুনতে চাই না। আমায় কিছু করে টরে দিন'। উত্তরে জীবনকৃষ্ণ বললেন, 'তুই ধ্যান করিস?' – উনি বললেন আমার ধ্যান হয় না। মন স্থির হয় না। শ্রীজীবনকৃষ্ণ তখন ভক্তটিকে বললেন, তুই এখানে উঠে আয় দেখি। আয় উঠে আয়। ভক্তটি তখন জীবনকৃষ্ণকে প্রণাম করে খাটের উপর বসলেন। জীবনকৃষ্ণ তাঁকে নিজের পাশে বসিয়ে বললেন, ঐ ঠাকুরের ছবির দিকে চেয়ে দেখ্। উনি যেমন করে বসে আছেন, ঠিক তেমনি করে বস। হারাধন বাবু তাই করলেন। জীবনকৃষ্ণ তখন তাঁর হাঁটুতে আস্তে আস্তে কয়েকবার চাপড়ালেন এবং কয়েকবার 'জয়গুরু জয়গুরু' বলতে লাগলেন। ধীরে ধীরে ভক্তটি গভীর ধ্যানে মগ্ন হলেন। পাঠ চলতে লাগলো। কিছুক্ষণ পর ভক্তটির শরীর সামান্য কাঁপতে লাগলো। কখনও ডানদিক থেকে বাম দিকে, কখনও সামনে থেকে পিছন দিকে শরীরটা দুলতে লাগলো। জীবনকৃষ্ণ ইঙ্গিতে লক্ষ্মীবাবুকে পাঠ বন্ধ করতে বললেন। তিনি অনিলকে বললেন, বলত এর কি হয়েছে? অনিল উত্তরে বললো – সমাধিস্থ হয়ে গেছে। জীবনকৃষ্ণ আনন্দিত হয়ে বললেন, 'বাঃ বেশ তো ধরেছিস্। হ্যাঁ সমাধিস্থ হয়ে গেছে। আর বলে কিনা ধ্যান হয় না! ....'

অশোক ঘোষ

(১) শ্রীজীবনকৃষ্ণকে কেন্দ্র করে দিনের পর দিন অদ্ভুত সব ঘটনা ঘটতো। বহু ঘটনার সাক্ষী হতে পেরে নিজেকে ধন্য বলে মনে হয়। তবে কিছু ঘটনার কথা উনি নিজ মুখে আমাদের শুনিয়েছেন। তাঁর মুখে শোনা এইরূপ একটি ঘটনা। তিনি বললেন – আমরা যখন এ বাড়ী অর্থাৎ কেদার দেউটি লেনের বাড়ীতে আসি, তার কিছুদিন বাদে – শীতকাল, সকালবেলা, রকে রোদ পড়েছে। সেখানে বসে আছি। এমন সময় পাশের বাড়ীর একটি ছেলে, তখন স্কুলে পড়ে, আমাকে এসে বলছে, আচ্ছা এমন লোক কি কেউ আছেন, যিনি

ভগবানকে দেখেছেন? আমি তখন তাকে বললুম, তোদের বাড়ীতে ঠাকুরের ছবি আছে? সে বলল, হ্যাঁ। আমি বললাম, তাকে জিজ্ঞাসা করিস বলে দেবেন। তার ৪/৫ দিন পরে ঐ ছেলেটি এসে আমাকে বললে, আপনার ভগবান দর্শন হয়েছে। প্রশ্ন করলুম, কি করে জানলি? সে বলল, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ আমায় বলে দিয়েছেন। এর কিছুদিন পর ওরা এখান থেকে ভবানীপুরে উঠে যায়। তখন বছরে বা দেড় বছরে একবার আমার কাছে আসতো। তারপর ছেলেটি আসামে চলে যায়। ওর কোষ্ঠি দেখে কোন জ্যোতিষী বলছিল যে ও ৩২ বছর বয়সে সন্ন্যাসী হয়ে চলে যাবে। সেই জন্য ওর মা কোন সাধু সন্ন্যাসীর কাছে যেতে বারণ করে দিয়েছিলেন, একই কারণে আমার কাছেও আসতে বারণ করে দিয়েছিলেন। কিন্তু আসামে পর পর কয়েকবার স্বপ্নে দেখতে লাগল, কে একজন ব্রাহ্মণ ওকে হাত ধরে নিয়ে এসে আমার খাটের কাছে দাঁড় করিয়ে দিয়ে চলে যায়। এই কথা ওর মার কাছে লিখে জানায়। তখন ওর মা বলে, তবে তুই বরং একদিন এসে ওর সঙ্গে দেখা করে আয়। তাই ও সেইদিন এসেছিল। আমাকে তার স্বপ্নের কথাও বলে গেল। আমি শুনে চুপ করে রইলুম।

(২) জীবনকৃষ্ণের ঘরে মেয়েদের আসা বারণ ছিল। এই নিয়ে মেয়েদের মধ্যে বিশেষ ক্ষোভ ছিলো। কারণ তারা চাইতেন স্বপ্নে দেখা মানুষটিকে কাছে এসে মিলিয়ে নিতে। সেই জন্য অনেকেই জীবনকৃষ্ণকে না জানিয়ে আড়াল থেকে তাঁকে দেখে নিয়ে বাড়ী ফিরে যেতেন। – একদিন কথা প্রসঙ্গে রঘুদা (রঘুনাথ সেন) জীবনকৃষ্ণকে বললেন - আমার মা এখানে (কদমতলায়) একবার এসে আপনাকে দেখে গিয়েছেন। একথা শুনে উনি বললেন - সে কী রে! কবে? এই বলে তিনি রঘুদার মার উদ্দেশ্যে প্রণাম জানালেন আর সুখ্যাতি করতে লাগলেন।

অনাথ মণ্ডল

আধ্যাত্মিক জগতের মানুষ হয়েও জীবনকৃষ্ণ যে কতখানি সাহিত্য রসিক ছিলেন, তাঁর কাছে নিয়মিত যাতায়াত না করলে বোঝা সম্ভব ছিলো না।

(১) ১৯৬৭ সালের জানুয়ারীর এক সকালে ওনার ঘরে পৌঁছে দেখি গোপালদা ও জীবনকৃষ্ণ বিছানায় বসে। উনি আপন মনে Thomas Gray-এর ‘Elegy’ কবিতা আবৃত্তি করতে লাগলেন এবং তারপর ‘রিজিয়া’ নাটক থেকে খানিকটা আবৃত্তি করলেন। তারপর আমাদের বললেন – যখন আমি সেকেণ্ড ইয়ারের স্টুডেন্ট, তখন আমরা থাকতাম মানিকতলায়, গড়পাড়ে। আমাদের ক্লাসে এক শনিবার ‘Elegy’ কবিতার পরীক্ষা ছিলো। তখন আমার বই ছিলো না। তাই শুক্রবার এক টাকা নিয়ে কলেজ স্কোয়ারে এলাম ও ফুটপাতের বুকস্টল থেকে ছ’আনা দিয়ে Annotation দেওয়া ‘Elegy’ কিনে দিলখুস কেবিনে ঢুকে বাকি পয়সায় চপ কাটলেট খেয়ে হেঁটে বাড়ী ফিরলাম। পরের দিন আমি পরীক্ষায় ৫২ নম্বর পেয়ে সেকেণ্ড হয়েছিলাম। আর যে ফার্স্ট হয়েছিলো সে পেয়েছিলো ৫৬ নম্বর।

(২) সুশীলবাবু একদিন প্রচণ্ড দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া দেখেও পাঠে বেড়িয়ে গিয়েছিলেন। ওই প্রসঙ্গ উঠতেই জীবনকৃষ্ণ বললেন, ও হচ্ছে বাতিক। এরপরই তিনি ইংরাজী সাহিত্যের বিখ্যাত রোমান্টিক কবি কোলরিজ (Coleridge) - এর কথা টেনে বলতে লাগলেন, ‘কাল যখন ও যায় তখনই আমার মনে পড়ছিল Coleridge এর কথা। Coleridge লণ্ডনে শীতকালের সকালে দুর্যোগের মধ্যে Walking -এ বেরোত, আর ফিরে এসে নিজেই নিজের প্রশংসা করত। আমি নিজেও ঐরকম বেড়িয়ে দেখেছি। Heavy exercise হয়। He (সুশীল বাবু) is an excellent man’.

শ্রীজীবনকৃষ্ণের শুধু ইংরাজী সাহিত্য পড়া নয়, কবি, লেখকদের বিশদ জীবনীও জানা ছিলো দেখে অবাক হয়ে গেলাম।

আনন্দ মোহন ঘোষ

পাঠ ও আলোচনা প্রসঙ্গে জীবনকৃষ্ণ মাঝে মাঝে আমাদের বেশ সরস গল্প পরিবেশন করে শোনাতেন। একদিন গুরু শিষ্যের প্রসঙ্গ ওঠায় জীবনকৃষ্ণ বললেন – একটা গল্প বলি শোন। গুরুদেব শিষ্যবাড়ী এসেছেন। সঙ্গে একজন চেলা, নইলে কানাই ঠেলবে কে (রান্না করবে কে) ? শিষ্য ঘি, ময়দা, তেল, আনাজপাতি, কাঠ সব বন্দোবস্ত করে দিয়েছেন। গুরুদেব চেলাকে বললেন - - বাবা, তাড়াতাড়ি পাকের আয়োজন কর, বেলা হয়ে গিয়েছে। চেলা উত্তর দিচ্ছে – গুরুদেব আমি এখন জপ করতে বসেছি। গুরুদেব আর কি করেন, নিজেই রান্নার আয়োজন করছেন। তরকারী টরকারী রাঁধার পর গুরুদেব চেলাকে বলছেন – বাবা, এবার ময়দা মেখে লুচিগুলো ভেজে ফেল। চেলা উত্তর দিলে - গুরুদেব আমি এখন জপে। গুরুদেব আর কি করেন, নিজেই ময়দা মেখে লুচি ভেজে আসন পেতে দুটো ভাগে সবকিছু রেখে দিলেন। একপাতে নিজের জন্য খুব বেশী রেখে এবং অন্য পাতে চেলার জন্য অল্প রেখে বললেন – বাবা, এবার আমি চানটা করে আসি। চান করে ফিরে এসে দেখেন, চেলা যে পাতে বেশী বেশী রাখা ছিলো তাতে বসে লুচিতে হাত দিয়ে বলছে – গুরুদেব এইটা কি আমার? গুরুদেব সবই বুঝলেন। মনে মনে চেলার মুণ্ডপাত করলেন – ওরে আঁটকুড়োর ব্যাটা! অসহায়ের মত বললেন – হ্যাঁ বাবা, ওটা তোমার। ঘরে প্রবল হাস্য রোল উঠল।

ভূমিকা

বৈদিক সত্য তথা মানুষের ঈশ্বরত্ব লাভের অদম্য প্রয়াস প্রথম সাফল্যের মুখ দেখল ঊনবিংশ শতাব্দীতে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের মধ্যে। তিনি বললেন, "মাইরি বলছি, ভগবানকে দেখেছি।" কোন ভগবান? দুর্গা, কালী, শিব, রাম বা বিষ্ণুমূর্তি নয়। বেদ কথিত জ্যোতির সমুদ্রে অঙ্গুষ্ঠবৎ আত্মা দর্শন করিয়ে সচ্চিদানন্দগুরু তাঁকে বলে দিলেন, "এই ভগবান, এই ভগবান দর্শন।"

এই ভগবান দর্শনের অপূর্ব পরিণতির কথা বলেছে বেদ। বলছে, "স্বেন রূপেন অভিনিষ্পদ্যতে" – অর্থাৎ তাঁর চিন্ময় রূপ ফুটে উঠবে অসংখ্য মানুষের অন্তরে। শ্রীরামকৃষ্ণের জীবদ্দশায় তাঁকে স্বপ্নে দেখেছেন কাপ্তেন, মাস্টার মশাই, মণিমোহন মিত্র, রাম দত্ত, বাবুরাম মহারাজ, গোলাপ মা প্রভৃতি কয়েকজন ভাগ্যবান। এই সচ্চিদানন্দগুরু লাভে জাগল শুদ্ধাভক্তি। তিনি বললেন, ভক্তিতে জাত জ্ঞান দূরে যায়। জাতের বেড়া ভাঙার পথ সুগম হ'ল।

পরবর্তীকালে এলেন শ্রীজীবনকৃষ্ণ (ঘোষ)। সচ্চিদানন্দগুরু রূপে ভিতরে দেখলেন শ্রীরামকৃষ্ণকে। বিধিবাদীয় কোন ধর্মীয় আচার পালন না করেই আপনা হতে ষোল আনা আত্মা সাক্ষাৎকার হ'ল তাঁর। পরে এর বেদ কথিত পরিনতির পূর্ণপ্রকাশ ঘটল। হিন্দুদের বিভিন্ন জাতিই শুধু নয়, মুসলমান, বৌদ্ধ, খৃষ্টান, ইহুদী, পারসী ইত্যাদি সকল সম্প্রদায়ের সর্বশ্রেণীর মানুষ প্রধানত স্বপ্নে তাঁর চিন্ময় রূপ অন্তরে দর্শন করতে থাকল। পিতা-পুত্র-পৌত্র তথা পুরুষানুক্রমে তাঁকে দেখা চলতে লাগল, প্রতীকে ব্রহ্মরূপে (যেমন সূর্যমণ্ডলস্থ পুরুষ ইত্যাদি) পরে পরম এক রূপে।

একজন অব্রাহ্মণ (কায়স্থ ঘোষ)–কে কেন্দ্র করে বৈদিক তথা সর্বজনীন ধর্মের এই নতুন প্রকাশে দ্রষ্টাদের অন্তর থেকে অন্তর্হিত হ'ল জাতি অভিমান, ভাঙল সম্প্রদায়ের বেড়া। সংসারী-অসংসারী, ধনী নির্ধন নির্বিশেষে মানুষ

তাঁকে অন্তরে দেখে ঘোষনা করল ধর্ম জগতে কামিনীকাঞ্চন আজ আর কোন বাধা নয়। সূর্য আর তার আলোর মত, মনুষ্যজাতির মধ্যে আত্মিকে একা তিনিই আছেন – পরম এক – আর অন্যেরা তারই একত্ব স্বরূপ – এই উপলব্ধিতে দ্বৈতবাদের উচ্ছেদে ভক্তির গোঁড়ামির জগদ্দল পাথর সরে গেল। বহুত্বে একত্বের চৈতন্য প্রতিষ্ঠার পথে তবুও থেকে গেল কিছু সূক্ষ্ম সংস্কার, যেগুলি নিজের ও অপরের স্বপ্ন দর্শনের অনুশীলনের মাধ্যমে চিহ্নিত করে অপসারণ করলে অহৈতুকী আনন্দে জীবন মধুময় হয়ে উঠবে।

স্বামীজি "রাজযোগ" গ্রন্থে পতঞ্জলির শ্লোক উদ্ধৃত করে বলেছেন — - "স্বপ্ন নিদ্রাজ্ঞানাবলম্বনং বা" (১ম অধ্যায়, সমাধিপাদ শ্লোক নং ৩৮) অর্থাৎ নিদ্রার মধ্যে যে স্বপ্নে অপূর্ব আধ্যাত্মিক জ্ঞানের প্রকাশ হয় তার ধ্যান করতে হয় – তাহলে তা প্রাপ্ত হওয়া যায়। স্বপ্নের ঠিক ঠিক অর্থ করার জন্য সংস্কারমুক্ত হওয়া দরকার। স্বপ্নে প্রতীকের অর্থ করার ক্ষেত্রে কোন গোঁড়ামি থাকলে স্বপ্নে অন্তর্লীন সুধার আস্বাদ পাওয়া যায় না। নতুন জ্ঞানের সন্ধান মেলে না। এমনকি পূর্বতন স্বপ্নের বার্তাটিকে শেষ কথা ভাবাও একপ্রকার গোঁড়ামি – সংস্কার। ভবিষ্যতে নতুন কিছু জ্ঞানের কথা প্রকাশ পেতে পারে এবং তাকে গ্রহণ করার মানসিকতা থাকতে হবে দ্রষ্টার। শ্রীজীবনকৃষ্ণের জীবনের এটিই মূল শিক্ষা – বেদের ভাষায় "চরৈবেতি।"

২৬ কার্তিক, ১৪২১

স্বপন মাধুরী

জানা বোঝা

✻ দেখছি (২৯-০৯-২০১৪) – একটা ঘরে খাটের উপর বসে ছোটকাকু পাঠ করছে। নীচে কয়েকজন বসে পাঠ শুনছি। হঠাৎ দেখি দেওয়ালে টাঙানো জীবনকৃষ্ণের ছবিটা জীবন্ত হয়ে গেল। উনি কাঁদছেন, চোখ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে। আমি কাকুকে জিজ্ঞেস করলাম, উনি কাঁদছেন কেন? কাকু বলল, ওনার বাবা রামকৃষ্ণ মারা গেছেন এই দিনে। তাঁর কথা স্মরণ করে কাঁদছেন। কিছুক্ষণ পর দেখি একজন আর্টিস্ট যিনি সিরিয়াল করেন তিনি ঘরে ঢুকে ফটোতে জীবনকৃষ্ণের সাথে মিশে গেলেন। তখন জীবনকৃষ্ণের মুখটা বিকৃত হয়ে গেল। তখন কাকু ফটোর কাছে গিয়ে বলতে লাগল, 'শান্ত হও, শান্ত হও।'....

— দিশা গাঙ্গুলী (খড়গপুর)।

ব্যাখ্যাঃ দ্রষ্টা এই প্রথম দেখছেন জীবনকৃষ্ণকে। এই জীবনকৃষ্ণ রামকৃষ্ণময় জীবনকৃষ্ণ নয় – এই অবস্থার পারে অতিক্রান্ত জীবনকৃষ্ণ। তাই রামকৃষ্ণকে নিয়ে কাটানো সুন্দর দিনগুলির কথা ভেবে কাঁদছেন। সিরিয়ালের আর্টিস্ট ফটোতে ঢুকে গেল ও জীবনকৃষ্ণের মুখ বিকৃত হয়ে গেল – দ্রষ্টাকে টিভিতে সিরিয়াল দেখা কমাতে বলছেন।

✻ দেখছি (১১-০৭-১৪) – একজন জোয়ান ছেলে – মাথায় ছোট ছোট চুল – মনে হচ্ছে ওর নাম জয়। ও বলল, to see is to become - - কথাটা বুঝেছ? বললাম, হ্যাঁ। আবার বলল, ধারনা হয়েছে? বললাম, হ্যাঁ। .... ঘুম ভাঙল।

সবিতা পাল (ইলামবাজার)।

রূপান্তর

✻ দেখছি (০৯-০৭-১৪) – আমার স্বামী শুয়ে আছে। খাটে এসে বসলেন যমরাজ। উনি আমার স্বামীর প্রাণ নিয়ে চলে যাবেন। আমি চিৎকার করে বললাম, আমার স্বামীর প্রাণ নিয়ে যেতে দেব না। যমরাজ মুচকি হাসলেন। তারপর তিনি বললেন, তুমি আমাকে অন্য একটা নামে ডাক – সেই নামটা বল। আমি বললাম, আপনি তো জীবনকৃষ্ণ! তখন হাসতে হাসতে চলে গেলেন। .... ঘুম ভাঙল।

— স্বস্তিকা চ্যাটার্জী (চারুপল্লী)।

ব্যাখ্যাঃ শ্রীজীবনকৃষ্ণের স্মরণ মননে মৃত্যুলোক থেকে অমৃতলোকে উত্তরণ ঘটে।

✻ দেখছি (আগষ্ট ২০১৪) – ঘরে শুয়ে আছি। ভূত এসেছে, সবাই ভয় পাচ্ছে। আমি বলছি, ভূতকে ভয় পাবার কিছু নেই। এতে ভূতটা আমার উপর রেগে আমার পিছনের জানলা দিয়ে একবার ঢুকছে আবার বেড়োচ্ছে। দেখি ওর গলা থেকে মাথা পর্যন্ত নেই – কবন্ধ। আমি পিছন ঘুরতে পারছি না। একপাশে কাৎ হয়ে শুয়ে আছি। কবন্ধটা পিছন থেকে একটা কঞ্চি নিয়ে খোঁচা মারছে আমাকে। অস্বস্তিতে ঘুম ভাঙল।

— স্নেহময় গাঙ্গুলী।

ব্যাখ্যাঃ ভূত - অতীতের বিধিবাদীয় ধর্মের সংস্কার। মাথা নেই – logic বা যুক্তি নেই। পিছন থেকে খোঁচা মারছে। — ভোগের অসুবিধা হবে বলে অন্য লোকেরা যুক্তি না দিয়ে প্রাচীন ঐতিহ্যের ধুয়ো তুলে বিরক্ত করবে, জীবত্ব জাগাতে ও ভোগের দিকে আকৃষ্ট করতে চেষ্টা করবে।

সব দাও

✻ দেখছি (২০-০৫-১৪) – একটা মন্দির। ভিতরে ঠাকুরের মূর্তি নেই। সেই জায়গায় একটা আসনে বসে আছেন শ্রীজীবনকৃষ্ণ। তার কাছে

গিয়ে বসলাম। উনি ঈশ্বরীয় কথা শুরু করলেন। বললেন, প্রথমে রামকৃষ্ণ তারপর জীবনকৃষ্ণ ..... ইত্যাদি। আমার দেহের ভিতর তোলপাড় শুরু হ'ল। উনি কথা বলেই যাচ্ছেন। আমার প্রবল বেগে কুণ্ডলিনী জাগরণ হ'ল। ওনার পায়ে পড়ে গেলাম। তখন বলছি – আমি আরও জানতে চাই, আর কাঁদছি। উনি আমাকে তিনটি জামার পিস (কাটিং করা কিন্তু সেলাই করা নয়) দিলেন। আর বললেন, চল্লিশ টাকা দে। আমি চল্লিশ টাকা দিলাম। তখন একজন বুড়ি বলল, চল্লিশ টাকা দিলে হয়? যা আছে সব দাও। তখন পকেটে যা ছিল সব দিয়ে দিলাম। কী শান্তি! ... ঘুম ভাঙল।

অতীন্দ্র ব্যানার্জী (শিমূরালী, নদীয়া)।

ব্যাখ্যাঃ জগতে প্রথম শ্রীরামকৃষ্ণেরই আত্মা সাক্ষাৎকার হয়। আত্মার পরিচয় লাভ শুরু হয়। পরে এলেন শ্রীজীবনকৃষ্ণ।তিনি সাধনের সম্যক পরিচয় (অনুভূতি দান করে) জানালেন। তিনটি জামা - তিনটি দেহ - স্থূল, সুক্ষ্ম ও কারণশরীর। সেলাই করে নিতে হবে – অনুশীলন করতে হবে। সব দিয়ে দিলাম - পূর্ণ আত্মসমর্পণ।

* দেখছি (১২-০৯-১৪) — সব মানুষের দেহের ভিতর একজন ছোট্ট অজানা মানুষ রয়েছে। অবাক হচ্ছি না। ভালো লাগছে দেখতে। আর ভাবছি এটাই তো স্বাভাবিক।

স্নেহময় গাঙ্গুলী (চারুপল্লী)।

দর্পণ

* স্বপ্নে (১৬-০৫-১৪)— আমি আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে দেখছি। যখন আয়নাকে স্পর্শ করলাম, দেখি ওটা আয়না নয়। মনে হচ্ছে তরল কোন পদার্থ। আর ওখানে দেখলাম অনেক মানুষ আমায় দেখছে। তারপর আমি যেন হালকা হয়ে উড়তে থাকলাম। .... ঘুম ভাঙল। ঘুম থেকে উঠে দেখি আমার শরীর হালকা হয়ে গেছে।

— সুরজিৎ রুদ্র (বোলপুর)।

ব্যাখ্যাঃ আয়না — সহস্রার – যেখানে আত্মদর্শন হয়। পরে আরও উন্নত অবস্থায় বহু মানুষের দর্শনে নিজের আত্মিক অবস্থা ঠিক ঠিক জানা যায়। তখন সহস্রার যেন L C D (Liquid Crystal Display)পর্দা যেখানে অন্যের দর্শনের মধ্যে দিয়ে নিজেকে (নিজের আত্মিক পরিচয়) স্পষ্টভাবে দেখা যায়।

* দেখছি (০১-০৮-১৪) — শ্রীজীবনকৃষ্ণ এসেছেন শাঁখারী হয়ে। সঙ্গে ওনার স্ত্রী রয়েছেন। স্ত্রীটি দেখতে কুৎসিৎ। জীবনকৃষ্ণ আমায় শাঁখা পরিয়ে দিয়ে বললেন, শেষবারের মত পরিয়ে দিলাম। এরপর ওনাকে প্রণাম করতে গেলে বাধা দিলেন। বললেন, প্রণাম করছ কেন ? বললাম, ছোট থেকে মা বাবা শিখিয়েছেন শাঁখা পরার পর শাঁখারীকে প্রণাম করতে হয়, তাই করছি। উনি হাসলেন। ..... ঘুম ভাঙল।

সবিতা ঘোষ (চারুপল্লী)।

ব্যাখ্যাঃ- শেষ বারের মত পরালাম - দ্বৈতবাদে ভক্তিরস আস্বাদনের শেষ পর্যায় এটি। জীবনকৃষ্ণের স্ত্রী কুৎসিৎ দর্শন- ভক্তের জগতের প্রতি আকর্ষণ কমে যাচ্ছে দ্রষ্টার। বংশধারায় (heredity) ভক্তি আছে বলে এখনও ভক্তি নিয়ে আছেন, প্রণাম করছেন। এবার একত্বের ধারনা হবে।

ভ্রম সংশোধন

* শ্রীজীবনকৃষ্ণ বিরচিত "বৈদিক সত্য" বইটি পড়ে মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া হয়েছিল। এক রাত্রে (৫-৭-১৪) স্বপ্নে দেখছি — কয়েকজন মেয়েকে কী যেন লিখতে দিয়েছি। কিছুক্ষণ পর একটি মেয়ে খাতা নিয়ে উঠে এল। কোনও প্রশ্নের উত্তরে লিখেছে — "স্বেন রূপেন অভিনিষ্পদ্যতে"। ...... ঘুম ভাঙল। বুঝলাম, এই স্বপ্নে দেখালো — ব্রহ্মবিদকে জাতিধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে অসংখ্য মানুষ অন্তরে দেখবে — এই বৈদিক সত্যের নিরিখে বইটিতে রামকৃষ্ণ কথার সমালোচনা করা হয়েছে। এতে ভুল কিছু নেই।

— কল্পনা রায় (ইলামবাজার)।

✻ দেখছি (আগষ্ট,২০১৪) — বিশতলা একটা ঘর। উপরের দিকে কোন একটা ঘরে জীবনকৃষ্ণ পায়চারী করছেন। খালি গায়ে ধুতি পরে আছেন। কী কারনে যেন আমি নিচে নেমে এলাম। একটু পর আবার ওখানে গিয়ে দেখি জীবনকৃষ্ণের পরিবর্তে সাবিনা নামে একটি মেয়ে পায়চারী করছে। স্বপ্ন ভাঙল। স্যারকে গিয়ে স্বপ্নটা বললাম। উনি বললেন, তুই ব্যাখ্যা দে, আমি ধরিয়ে দিচ্ছি। ওটা হ'ল Outer part of North pole. এরপরই ঘুম ভেঙে গেল। বুঝলাম স্বপ্নের ভিতরে স্বপ্ন দেখেছি।

— শোভন ধীবর (অবিনাশপুর)।

ব্যাখ্যাঃ North pole - সহস্রার। সহস্রারে ভগবান থাকেন (শ্রীজীবনকৃষ্ণ)। বাইরে যে মায়ার জগৎ দেখছি যা সত্য জানতে বাধা দেয় (সাবিনা — প্রতিরোধকারিনী) তাও একভাবে ভগবানকেই দেখছি। এটা Outer part of North pole.

মহালয়া

✻ স্বপ্নে দেখছি (২২-০৮-১৪) — আলপনা দিচ্ছি বাড়িতে। আলপনা দেওয়া শেষ হলে অপেক্ষা করছি ঠাকুর আসার জন্য। কী পুজো হবে জানি না। হঠাৎ দেখি পূজারী ঠাকুর এসে উপস্থিত। মুখের দিকে তাকিয়ে দেখি ইনি স্বয়ং শ্রীজীবনকৃষ্ণ। গভীর আনন্দে ঘুম ভাঙল।

— সাধনা গায়েন (সুলতানপুর)।

ব্যাখ্যাঃ এই পূজারী মানুষের পূজা করেন, মানুষকে জীবন্ত দেবতায় পরিবর্তিত করেন।

✻ গত সেপ্টেম্বর মাসে মহালয়ার রাত্রে স্বপ্ন দেখছি – টিভিতে মহালয়া অনুষ্ঠান দেখার জন্য বসেছি। টিভি খোলা হ'ল। আশ্চর্য্য! দেখছি ঐ অনুষ্ঠানটি শ্রীজীবনকৃষ্ণের জীবনীকে অবলম্বন করে হচ্ছে। ......

— রজনী দাস বৈরাগ্য (ইলামবাজার)।

ব্যাখ্যাঃ মহালয়া হ'ল পিতৃপক্ষের শেষ ও দেবী পক্ষের সূচনা কাল, অব্যক্ত নির্গুনের সাকারে সগুনে প্রকাশের সূচনা - বিষয়টি শ্রীজীবনকৃষ্ণের আত্মিক জীবন থেকে পরিষ্কার বোঝা যায়। তাঁর জীবন নির্গুন থেকে সগুনে সচ্চিদানন্দ গুরু লাভ (ষষ্ঠী), আত্মা সাক্ষাৎকার (সপ্তমী) - বেদান্তের সাধন (অষ্টমী) — অবতারতত্ত্ব ও রসতত্ত্বের সাধন (নবমী) — শেষে নির্গুণে ফিরে যাওয়া ও বহুর অন্তরে সগুনে চিন্ময়রূপে ফুটে উঠে বিশ্বব্যাপিত্ব লাভের (দশমী) কাহিনী।

যা করে গেল

✻ স্বপ্নে দেখছি (অক্টোবর,২০১৪) — ঘুম থেকে উঠলাম। একটা থালার উপর কয়েক টুকরো কাগজ। প্রতিটিতে কোন না কোন মানুষের নাম লেখা। থালাটা নিয়ে বেরিয়ে গেলাম। সামনে পড়ল কলসী আকৃতির বাড়ি। তার ভিতর বসে আসেন জীবনকৃষ্ণ, সিংহাসনে। ওনার রাজ্যাভিষেক হবে। আমি মাথায় দুধ ঢেলে দিলাম। দুধের পাত্র ওখানেই ছিল। তারপর ঐ থালা থেকে চিরকুটগুলো ফুল ভেবে ছুঁড়লাম ওনার গায়ে। উনি এবার ঘরের বাইরে এলেন। সেখানে একটা প্রদীপ মিটমিট করে জ্বলছিল। সেই ঘিয়ের প্রদীপটা তুলে ধরলেন আর চারিদিক আলো হয়ে গেল। ....

— প্রকৃতি ব্যানার্জী (জামবুনি)।

ব্যাখ্যাঃ ধর্মের ভার ভগবান নিজের হাতে নিয়েছেন।

✻ দেখছি (১৭-১০-১৪) — আমি মোটর সাইকেল নিয়ে যাচ্ছি কলকাতা, মায়ের জন্য ওষুধ আনতে। দৃশ্য বদলে গেল। দেখি কাঞ্চন কাকুর দোকান গেছি একটা বই আনতে। বইটা আসেনি। আমাকে একটা ক্যালেণ্ডার দিল। ওখানে কতকগুলি লোক বসে ছিল। আমার চোখে পড়ল কয়েকটি মাণিক্য রয়েছে ওখানে। হাতে নিয়ে দেখি ওগুলো প্রথম দিককার। সেখানে বসে থাকা লোকগুলো হঠাৎ জীবনকৃষ্ণ সম্বন্ধে কথা তুলল। আমি বললাম তোমরা জীবনকৃষ্ণকে জানো? ওদের একজন উত্তর করল, ও যা করে গেল,

তাতে কে না জানবে ওকে? খুব অবাক হলাম এই উত্তর শুনে। ঘুম ভেঙে গেল।

— অভিরূপ দাস (নন্দন) - গড়গড়িয়া।

ইচ্ছাপূরণ

✲ স্বপ্নে দেখছি (২২-০৫-১৩) — শ্রীরামকৃষ্ণ কীর্তন করছেন। শ্রোতারা সকলেই জীবনকৃষ্ণ। নিজের দিকে তাকিয়ে দেখি আমিও জীবনকৃষ্ণ হয়ে গেছি। কীর্তনের বিষয় হ'ল ২/৩ লাইন করে 'ধর্ম ও অনুভূতি' পাঠ এবং তার ব্যাখ্যা।

— গৌরব দত্ত (গড়গড়িয়া)।

ব্যাখ্যাঃ শ্রীরামকৃষ্ণের অমৃতবাণী অবলম্বন করে যে ধর্মতত্ত্ব উপস্থাপন করা হয়েছে 'ধর্ম ও অনুভূতিতে', শ্রীজীবনকৃষ্ণের সত্তা লাভ করলে তা ঠিক ঠিক বোঝা যায়।

✲ মহালয়ার রাত্রে (২৩-০৯-১৪) দেখছি — একটা জমিদার বাড়ী। গ্রামের লোকেরা দল বেঁধে আসছে জমিদারের ৩ টে পুকুরে মাছ ধরে নেবে বলে। আমি জানতে পেরে জমিদারকে বলতে গেলাম। দরজা বন্ধ। খাজাঞ্চিকে সব বললাম। ওর ঘর হয়ে জমিদারের ঘরে ঢুকলাম। দেখি জমিদার জয়দেব মামা, ঘুমাচ্ছে। পাশে বাণী মামী ও ছেলে ঋতম্ ঘুমাচ্ছে।

— জয়কৃষ্ণ চ্যাটার্জী (জামবুনি)।

ব্যাখ্যাঃ জমিদার দ্রষ্টারই সত্তা যা জাগলে বাণীর মাধ্যমে ঋতম্ অর্থাৎ সত্য উপলব্ধির কথা জানাবে জগৎকে। তবেই জগৎবাসীর আত্মিক ক্ষুধা মিটবে। এই কারনে দল বেঁধে মাছ ধরতে আসছে। ৩টে পুকুরের মাছ – ব্যষ্টি, বিশ্বব্যাপিত্ব ও সমষ্টির সাধনতত্ত্ব।

✲ দেখছি — সাধন বক্তৃতা দিচ্ছে। ওখান থেকে চলে এলাম। সত্যবাবুর

মেয়ে বলল, ইচ্ছাপূরণের আলো দেখেছ? পূব আকাশে তাকালাম। দেখি সূর্য ওঠার ঠিক আগে যেমন আলো দেখা যায় সেই রকম আলো। মনে হ'ল এটাই ইচ্ছা পূরণের আলো। ....

— অভিজিৎ রায় (ইলামবাজার)।

ব্যাখ্যাঃ আত্মিক একত্ব লাভ করলে শাশ্বত শান্তি লাভের ইচ্ছা পূরণ হয়।

ধর্ম হবে আমারও

✲ দেখছি - বাবুর বাগানে বাবুর বাড়িতে বাবুর খাটে শুয়ে আছি। পাশে হাজার বছরের প্রাচীন এক বৃদ্ধ শুয়ে আছেন চুপচাপ। আমি আগে ওনাকে খেয়াল করিনি। খেয়াল হতেই ভাবছি যদি ওনার গায়ে পা ঠেকে যায় তাহলে কী হবে - সেই ভেবে সরে যেতে গিয়ে পায়ে ঠেকল একটা কাঁচের শিশি বা গ্লাস। ওটা মাটিতে পড়ে টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে ছড়িয়ে পড়ল সারা ঘর। এমন সময় ডাক্তারদাদু (দেবেন্দ্রনাথ) এলেন আমাকে ওষুধ দিতে। আমার হাতে একটা চরকা ছিল। ওটা নিয়ে নিলেন, পরিবর্তে একটা দণ্ড সমেত চক্র ধরিয়ে দিলেন হাতে। তারপরে সারা ঘরে ছড়িয়ে থাকা কাঁচের টুকরোগুলো জড়ো করতে লাগলেন। .... ঘুম ভাঙল।

— বিশাখা চ্যাটার্জী (জামবুনি, বোলপুর)।

ব্যাখ্যাঃ বাবুর বাগান নিয়ে শ্রীজীবনকৃষ্ণ স্বপ্ন দেখার পর কথামৃতের দেহতত্ত্বের ব্যাখ্যা ওনার মাথায় ফ্লাশ (flash) করতে শুরু করে। সেই সব ব্যাখ্যা যারা শোনেন তাদেরও ঈশ্বরীয় অনুভূতি হতে শুরু করে। সাধারণ মানুষের মন বাবুর বাগানে অর্থাৎ সহস্রারে প্রবেশে সক্ষম হয়। জীবনকৃষ্ণের ব্রহ্মত্বের প্রমাণ পান।

এতদিন পর সাধারণ মানুষও চক্র সমেত দণ্ড হাতে পেল। অর্থাৎ নির্গুণ থেকে প্রাপ্ত ব্রহ্মত্ব অপরকে দানের অধিকারী হচ্ছে। তাদেরও যে ধর্ম হচ্ছে তার প্রমাণ মিলবে।

হাজার বছরের পুরোন মানুষ – আদিপুরুষ - নির্গুন ব্রহ্ম। ডাক্তার দেবেন্দ্রনাথ - পরমেশ্বর - জীবনকৃষ্ণ। কাঁচের বোতল - মন - ক্ষণভঙ্গুর। ভেঙে ছড়িয়ে পড়ে - মন বিক্ষু হলে তার ব্যবহার অন্যদের আঘাত করে। চরকা

কাটা - সাধনতত্ত্ব অনুশীলন। চক্র সমেত দণ্ড হাতে দিলেন - কুণ্ডলিনী যোগে ক্রিয়াশীল পাঠচক্রের মাধ্যমে নিজের আত্মিক অবস্থার পরিচয় দানের অধিকার লাভ।

ধর্ম ও অনুভূতির প্রতিটি কথার মর্ম উপলব্ধির ক্ষমতা জন্মাবে সাধারণ মানুষেরও।

✻ দেখছি (২৮-০৯-১৪) — বাড়িতে পাঠ হচ্ছে। শুনতে শুনতে দেখলাম যখন "ধর্ম ও অনুভূতি" পড়া হচ্ছে, স্নেহময়দার চশমা থেকে লেন্সের আলোটা বইয়ের উপরে পড়ে আগুন ধরে গেল। কিন্তু পুড়ে গেল না।.....

— সুচিত্রা দত্ত (গড়গড়িয়া)।

ব্যাখ্যাঃ 'ধর্ম ও অনুভূতি'র কথার ভিতর যে তেজ রয়েছে তা নতুন ভাবে প্রকাশ পাচ্ছে। চশমা – দৃষ্টিভঙ্গী।

✻ স্বপ্ন দেখছি - শিব ঠাকুর আমায় ভয় দেখাচ্ছে। একটা ত্রিশূল নিয়ে আমার দিকে ছুঁড়ে দিল। আমি কোন রকমে নিজেকে বাঁচিয়ে নিলাম। এরপর আমি ভয় পেয়ে জীবনকৃষ্ণের নাম করতে যাচ্ছি, ঠিক সেই সময় শিব ঠাকুর আমায় বলছে, এবার বল, "জীবনকৃষ্ণ, জীবনকৃষ্ণ।" জীবনকৃষ্ণও আমার কিছু করতে পারবে না। আমি আরও ভয় পেয়ে গেলাম। এবার আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল - "আমি মহাত্মা, স্বে মহিম্নি, অহং ব্রহ্মাস্মি" কথাগুলি। এরপর দেখি শিব ঠাকুর মিলিয়ে গেল।

— রণিত পাল (আড়িয়াদহ, দক্ষিণেশ্বর)।

ব্যাখ্যাঃ জীবনকৃষ্ণ ব্রহ্ম, এটুকু জানলে হবে না। জীবনকৃষ্ণ আমারই স্বরূপ অর্থাৎ আমিই ব্রহ্ম – এই সত্য না জানলে অভয়পদ লাভ হবে না। এই অদ্বৈতজ্ঞানই ঈশ্বরীয় চর্চার মূল লক্ষ্য।

✻ স্বপ্নে দেখছি (১৬-৭-১৪) – আকাশ থেকে সূর্যরশ্মি মাটিতে নেমে এল। সেই আলো বেয়ে একটি ভেড়া আকাশ থেকে নামল। তারপর সামনের

দুর্গামন্দিরে ঢুকল। যখন মন্দির থেকে বেরোল তখন সবাই ছুটে গিয়ে ওকে আদর করতে লাগল। তখন দেখি ওর একটা ছানাও রয়েছে। একটু পর আবার আকাশ থেকে একগুচ্ছ রশ্মি মাটিতে এসে পড়ল। ছানাসহ ভেড়াটা ঐ আলোর পথে উপরে উঠে আকাশে মিলিয়ে গেল।

— তাপসী প্রধান (বেহালা)।

ব্যাখ্যাঃ ভেড়া - অতি সরল লোক, অবতার পুরুষ। 'সরল, বোকা, পাছে হালকামি করি, সব বলে ফেলি, তাই মা এই অসুখ দিয়ে চুপ করিয়ে দিলে' - শ্রীরামকৃষ্ণ।

মন্দিরে ঢুকল - পূজাদি বৈধী ধর্ম মেনে চলল। মন্দির থেকে বেড়িয়ে এল - বৈধী ধর্ম ছেড়ে সর্বজনীন মানবধর্মকে আশ্রয় করল। সবাই আদর করতে লাগল - সবার প্রিয় হলেন (প্রকৃত ভক্তদের)। দ্বৈতবাদের ভক্তিরস (দুধ) সঞ্চারিত করতে লাগলেন সন্তানসম ভক্তদের (ছানা) মধ্যে। চলে গেল আকাশে – দ্বৈতবাদে অবতারলীলা শেষ হল। এবার নতুন লীলা, একত্বের মহিমা প্রকাশ শুরু হবে।

শর্ত সাপেক্ষ

✻ দেখছি (২৪-৮-১৪) – কুয়াশা পড়ছে। মাঠে জীবনকৃষ্ণের সামনে দাঁড়িয়ে আছি। ওনার পায়ের কাছে একটা ফুটবল। উনি হাফ্‌প্যান্ট পরে আছেন। বয়স যেন আমারই মতো। যুবক। উনি পকেট থেকে কয়েক দানা মিছরী বের করে আমাকে খেতে দিলেন। আর বললেন, তিনটি জিনিস মনে রাখবি।

1) Simple life style (সাধারণ জীবনযাপন)

2) Simple dress (সাধারণ পোষাক)

3) Simple food (সাধারণ খাবার)

পরের দৃশ্যে স্বপ্নটা বীথি জেঠিমা-কে বললাম। উনি আবার কী হিসাব করতে দিলেন। হিসাব করে বললাম, ১৪ (চোদ্দ)। তারপর ঘুম ভাঙল।

— অতনু মাইতি (কাষ্ঠডাঙা, সরশুনা)।

ব্যাখ্যাঃ ব্রহ্মানন্দ আস্বাদন (মিছরীর দানা খাওয়া) ও স্থায়ীভাবে আত্মিকে

বিচিত্র লীলাখেলা উপভোগের তিনটি শর্ত জানা গেল এই স্বপ্নে। ১৪ — সংখ্যাটির তাৎপর্য হ'ল — নির্গুণের সহায়তায় আপাত সমস্যার মধ্যেই সমাধান খুঁজে পেয়ে এগিয়ে চলা।

* স্বপ্নে দেখছি (আগষ্ট,১৪) — বিশাল এক বটগাছের ডালপালা কাটা হয়েছে। সেগুলো সব রাস্তা জুড়ে রাখা হয়েছে। ঘুম ভাঙলে দরজা খুলে দেখি সমস্ত রাস্তা ভর্তি হয়ে আছে ঐ গাছের ডালপালায়। আমি ঐ ডালগুলোর উপর পা দিয়েই রাস্তায় চলতে লাগলাম। ঘুম ভাঙ্গল। বুঝলাম স্বপ্নের মধ্যে স্বপ্ন দেখছিলাম।

ব্যাখ্যাঃ বটগাছ - সত্য - এক। তার ডালপালা - একত্ব। একত্বই সব সমস্যা সমাধানের পথ - রাস্তা।

— কমল মালাকার (সুরুল, বীরভূম)।

অচিনে গাছ

* দেখছি (১৭-০৮-১৪) — সূর্য উঠেছে। সূর্যের মধ্যে জীবনকৃষ্ণ বসে আছেন আর সূর্যের নিচের দিকে লেখা রয়েছে "আরও গভীরে যা।"

এই স্বপ্নটা পাঠে বলিনি বলে পরদিন আবার স্বপ্ন হ'ল - তোকে যে স্বপ্নটা দেখালাম, পাঠে সেটা বললি না কেন? - এই কথাটা একজন অজানা মানুষের কন্ঠে দৈববাণীর মত শুনলাম।

— অর্পিতা চ্যাটার্জী (সখেরবাজার)।

ব্যাখ্যাঃ ব্রহ্মচারী বলেন, এগিয়ে পড়। এগিয়ে গিয়ে ভগবান দর্শন হয়। এখানে দেখাচ্ছে, পরমব্রহ্ম একত্বের মাধুর্য আস্বাদনের পথে আরও এগিয়ে যাওয়ার কথা বলছেন।

* দেখছি (২৪-০৮-১৪) — একটা অচিনে গাছ। গুঁড়ি মোটা। কোন ডালপালা নেই। পাতা নেই। সোজা আকাশ পর্যন্ত উঠে গেছে। আমি যুবক হয়ে গেছি। আর কয়েকজন যুবককে সঙ্গে নিয়ে ঐ গাছটার চারদিকে কয়েক পাক ঘুরলাম। তারপর ওরা বলল, তুই গাছটায় ওঠ।উঠতে গিয়ে দেখি কতকগুলো খোপ খোপ করা আছে। তাতে পা রেখে ওঠা যায়। আর একটা বিশাল পাঁকাল

মাছ গোটা গাছটা জুড়ে লেপ্টে রয়েছে। আমি কয়েক ধাপ উঠে ঐ মাছটার একটু খুঁটে খেয়ে দেখলাম - অপূর্ব আস্বাদন। তারপর নেমে এলাম। ভাবছি এবার ওরা উঠুক। ওরা ঐ মাছটার আস্বাদন পাক।.....

— অরুণ ব্যানার্জী (শিমুরালী, নদীয়া)।

ব্যাখ্যাঃ অচিনে গাছ - পরম এক (Absolute One)। ডালপালা পাতা নেই — ব্রহ্মের একটিই গুণ - স একঃ। যুবক হয়ে গেছি - বয়স হয়ে গেলেও নির্গুনের শক্তি লাভে অনন্ত সম্ভাবনা জেগে উঠল। ফলে দ্রষ্টা যে কোন বড় অনুভূতি ও নূতন জ্ঞানের কথা ধারনা করতে পারবেন।

* দেখছি (১৪-০৯-১৪) — বিরাট একটা গাছ। আনারস গাছ। কে যেন বলল, উঠে পেড়ে নে। উঠে একটা আনারস পাড়লাম। দেখি তার চোখগুলো ভিতরের দিকে। প্রত্যেক চোখের উপর ছোট্ট জীবনকৃষ্ণ বসে আছেন। সব জীবনকৃষ্ণ মিলে একজন অজানা তেজস্বী যুবক হয়ে গেল। ....

ব্যাখ্যাঃ জীবনকৃষ্ণের বিশ্বব্যাপিত্বের effect প্রত্যক্ষ করার পর তার আরও বেশি শক্তির পরিচয় পাবে জগৎ- এই অবস্থায় তিনি সত্যিই অচিনে গাছ (অজানা যুবক)।

পরের মাসে এক স্বপ্নে দেখলাম - একটা তালগাছ। তার মাথায় পাতার পরিবর্তে অনেকগুলি হাত। অনির্বান (গাঙ্গুলী) স্বপ্নে আমার এই স্বপ্নটা ভাবছিল। তখন একজন বলল, তালগাছের কী থাকে? অনির্বান বলল, শুধুই কাণ্ড। উনি বললেন, 'ওটা আমার কর্মকাণ্ড। হাতগুলো জগতের মানুষের হাত - যা আমার কর্মের সাথে তালে তাল মেলাবে।' .... বোধ হল উনি জীবনকৃষ্ণ। ....

— সুস্মিতা দে (বেহালা)।

ছবি আঁক

* দেখছি ১৫-১০-১৪) — জীবনকৃষ্ণ আমাদের বাড়িতে এসেছেন। পাঠ হচ্ছে — হঠাৎ একটা তাল কাটারি দিয়ে অর্ধেক কাটলেন। তালটা পাকা। কিন্তু কাটার পর ভিতরে কচি তালের মত তিনটি চোখ দেখা গেল। আমি

অন্যদের জীবনকৃষ্ণের দেহ দেখিয়ে বলছি – এই দেহ যেমন উনি তেমনি ষোল আনা perfect জিনিসই দেন। এরপর জীবনকৃষ্ণ চলে গেলেন। ওনার বাড়ি যেন কাছেই, একই পাড়ায়। আমি ঐ কাটারি ও তালটা ওনাকে দিতে গেলাম। হঠাৎ বোনের (বিশাখা) চিৎকার করে কান্নার শব্দ শুনলাম। ছুটে গিয়ে দেখি ওর ছেলে জয় ও একটি বাচ্চা মেয়ে রয়েছে। মেয়েটির কপাল কাটারিতে কেটে দু'ফাঁক হয়ে গেছে। ওকে দেখে ঘাবড়ে গেলাম। কোন ডাক্তারের কাছে যাব ভাবছি। এমন সময় বোন ওকে রেগে আছাড় মেরে একেবারে মেরে ফেলল, "ভগবান কেন এত কষ্ট দিচ্ছেন" বলে। পরে নির্লিপ্ত হয়ে এগিয়ে যাচ্ছি। দেখি তমাল মামার স্ত্রী (গায়ত্রী) কয়েকজনকে নিয়ে কাশী যাচ্ছেন। আমাকে ঘরের চাবিটা দিয়ে গেলেন। তখন আর হাতে তাল ও কাটারি নেই। এরপর জিতেনের সঙ্গে দেখা। ওকে বললাম, তোমাকে গল্প লিখতে হবে না, তুমি শুধু ছবি আঁক। .... ঘুম ভাঙল।

— স্নেহময় গাঙ্গুলী (চারুপল্লী)।

ব্যাখ্যাঃ তাল – ভক্তি। পাকা ভক্তি ও জ্ঞান উভয়ই পরিত্যাগ করলেন জীবনকৃষ্ণ। কাটারি – জ্ঞান খড়্গ। বিশাখা - জীবনকৃষ্ণ অনুরাগীদের বিশেষ শাখা, ভক্তির শাখা (মেয়েটি) ব্যবহারিকের সঙ্গে আত্মিকের মিল না পেয়ে হতাশ হবে, টিকবে না। জ্ঞান ভক্তির উর্দ্ধে একত্ব বোধ। এর প্রতীক জয়। জয়ই থাকবে। চাবি দিল – নতুন পথে চলার চাবিকাঠি বা অভিজ্ঞান দিল জগৎ। জিতেন ছবি আঁকবে, গল্প লিখবে না – স্বপ্ন কথা বলবে – নিজস্ব ভাবনার কথা নয়।

* দেখছি (২৫-০৯-১৪) – স্নেহময়দা এসেছে।চা করে দেব বলে জল বসিয়েছি। জল আর ফুটছে না। অনেক দেরিতে জল ফুটল। তখন তাড়াতাড়ি চা দিতে গিয়ে নুন দিয়ে ফেললাম জলে।

— কৃষ্ণা ব্যানার্জী (বোলপুর)।

ব্যাখ্যাঃ চা – হরিরস – ভক্তিরস। জগৎ নুন অর্থাৎ রাম রস বা একত্বের মাধুর্য রস আস্বাদন করতে চায় – ভক্তিরস নয়।

* দেখছি (আগষ্ট,২০১৪) – আমার ডান হাত নেই। সেখানে জীবনকৃষ্ণের বাঁ হাতটা লাগানো রয়েছে। আমি ঐ হাতে সিঁন্দুর পরতে গেলাম। কিন্তু কিছুতেই পারলাম না। ..... ঘুমটা ভেঙ্গে গেল।

— প্রিয়াঙ্কা চ্যাটার্জী (কলকাতা)।

ব্যাখ্যাঃ নিজের ডান হাতের পরিবর্তে জীবনকৃষ্ণের বাঁ হাত – চেষ্টা বা সাধন ব্যতিরেকেই আপনা হতে জীবনকৃষ্ণের আত্মিক জগৎ লাভ অর্থাৎ আত্মিক একত্ব লাভ হয়েছে দ্রষ্টার। সিঁন্দুর পরতে পারলাম না – দ্বৈতবাদ থেকে অদ্বৈতবাদে উত্তরণ হয়েছে দ্রষ্টার।

নব পর্যায়

* দেখছি (১১-০৭-২০১৪) – রাস্তা দিয়ে একটা ট্রাক যাচ্ছে। তার ভিতর একটা কাঁচের জানলা – মধু ভর্তি – নিচের দিকে কল লাগানো। তা থেকে দু'এক ফোঁটা মধু ঝরছে। মনোজ বলল, অফিসে রাখা হবে ওটা। তারপর দেখি একটা মৌমাছি উড়ছে আমাদের সামনে। আমি ওটাকে করাত দিয়ে মারতে গেলাম। মনোজ বলল ওকে মারা যায় না, মৌমাছিটা উড়ে আমার ঘাড়ের কাছে এসে আমার দেহে ঢুকে গেল।

— অভিজিৎ রায় (ইলামবাজার)।

ব্যাখ্যাঃ নতুন করে বাজারে মধু বিতরণ হবে। মধু–চৈতন্য–বহুত্বে একত্ব। মানুষ মৌমাছি হয়ে মধুর আস্বাদন পাবে। ওকে মারা যায় না – কারণ ও যে নিজেরই সত্তা।

* গত অক্টোবরের শেষ দিকে এক স্বপ্নে দেখছি – একটা গুবরে পোকা হঠাৎ মধু পোকায় পরিবর্তিত হ'ল। দেহটা দেখতে ছোট্ট মৌচাকের মত। সে উড়তে শুরু করল আর দেখছি তার মুখটা যেন নলের মত। সেখান থেকে মধু ঝড়তে লাগল।

— অমৃত চ্যাটার্জী (শঙ্খ), ইলামবাজার।

ব্যাখ্যাঃ বিষ্ঠার পোকা ভাতের হাঁড়িতে রাখলে মরে যায় – শ্রীরামকৃষ্ণ। এযুগে, একত্ব লাভ হলে গুবরে পোকা মধু পোকা হয়ে যায়।

* দেখছি – অমর নামের একজন এসেছে বাড়িতে। রান্না করেছি। খেতে দেব। কিন্তু দিতে পারছি না। মহুয়াকে বললাম, একটু সাহায্য কর তাহলে ওনাকে খেতে দিতে পারব। মহুয়া গ্রাহ্য করল না। আমিও অমরকে খেতে দিতে পারলাম না। ..... একরাশ অস্বস্তি নিয়ে ঘুম ভাঙল।

— বিভা দাস (বাগুইআটি, কলকাতা)।

ব্যাখ্যাঃ মহুয়া – যে ভক্তি উন্মাদনা জাগায়। ভক্তির উন্মাদনা আর নেই (দ্রষ্টার)। দ্বৈতবাদে ভক্ত ভগবানের লীলা, ভগবানকে নৈবেদ্য দান আর হচ্ছে না – এখন থেকে একত্বের মহিমা অনুভব ও রসাস্বাদন হবে।

পাঠ প্রসঙ্গে

পাঠ ও আলোচনা প্রসঙ্গে কখনও কখনও নতুন কথা মনে জাগে তারই কিছু নমুনা এখানে উপস্থাপন করা হ'ল।

* যার যেমন পুঁজি সে জিনিসের সেই রকম দর দেয়। এই বলে ঠাকুর বেগুনওয়ালা, কাপড়ওয়ালা ও জহুরীর গল্প বললেন। বেগুনওয়ালা হীরেটার দাম দিতে চেয়েছিল নয় সের বেগুন দিয়ে – সে হ'ল জীবকটি মানুষ। কাপড়ওয়ালা ন'শ টাকা দিতে চেয়েছিল সে হ'ল ঈশ্বরকটি। আর জহুরী, যে একলক্ষ টাকা দাম দিতে চেয়েছিল সে হ'ল অবতার পুরুষ। পুঁজি – আত্মিক সম্পদ।

পুঁজিবাদীরাও তো বলে যে যার যেমন পুঁজি সে বস্তুর সেই রকম দর দেয়। তাহলে, "চাঁদা মামা সকলকার মামা" তো বলা হ'ল না?

তাহলে গল্পটা এখানেই শেষ না হয়ে যোগের দৃষ্টিতে এর সম্প্রসারিত রূপ হবে এইরকম –

মালিক চাকরকে বলেছিল, যে এই হীরেটা অমূল্য বলে বুঝবে তাকে বিনামূল্যে দিয়ে দিবি। চাকর কিছুদিন পর হীরেটা নিয়ে বাজারে গেল। তখন সেই জহুরী মারা গেছে। তার ছেলে বাবার জায়গায় বসে। তার কাছে গিয়ে চাকরটি বলল, তোমার বাবা এই হীরেটার দাম এক লাখ টাকা দিতে চেয়েছিল। তুমি এর সঠিক দাম কত বল দেখি। নবীন জহুরী বলল, এটি অমূল্য ধন। জগতের সব সম্পদ একত্র করলেও এর উপযুক্ত মূল্য দেওয়া যাবেনা। তখন চাকরটা সেই জহুরীকে হীরেটা দিয়ে দিল। বলল, আপনাকে দাম দিতে হবে না। এটা আমার বাবুর উপহার (Gift)। এবার জহুরী ঐ হীরেটা নিয়ে বেগুনওয়ালা ও কাপড়ওয়ালার কাছে গেল। হীরেটা যে মহার্ঘ বস্তু তা বোঝালো এবং সেটা যে সে বিনামূল্যে পেয়েছে তাও জানালো। বিনামূল্যে পেয়ে ওরাও হীরেটা নিতে আগ্রহী বলে জানালে জহুরী বলল, বেশ আজ থেকে এই হীরেটা আমাদের সকলেরই। এখন এটা কার ঘরে থাকবে তোমরা ঠিক কর। বেগুনওয়ালা ও কাপড়ওয়ালা বলল, আমাদের ঘর সুরক্ষিত নয়। চুরি হয়ে যেতে পারে ওটা।

তার চেয়ে তোমার ঘরেই থাকুক। বেগুনওয়ালার মাটির ঘর, আর কাপড়ওয়ালার দালান বাড়ি হলেও সুরক্ষা ব্যবস্থা নিশ্ছিদ্র নয়। একমাত্র জহুরীর বাড়ীর সুরক্ষা ব্যবস্থা অতি উন্নতমানের। তখন জহুরী বলল, বেশ। আমার তিন তলায় কাঁচের ঘর। হীরেটা সেখানে রাখব। তোমরা ইচ্ছামাত্র হীরেটা দেখতে পাবে আর হীরের দ্যুতি তোমাদের ঘরও আলোকিত করবে। সকলে এই ব্যবস্থায় খুশি হ'ল। পুঁজির ফারাকে কিছু এসে গেল না।

চাকরটা সব দেখছিল ও শুনছিল। হঠাৎ এই জহুরী ভদ্রলোক যখন জামা খুলে ফেলল, অমনি সে চিনতে পারল এই-ই তো তার মালিক। তখন তার কাছেই সে থেকে গেল।

ব্যাখ্যাঃ জহুরী বলল, এক লক্ষ টাকা দাম — জীবনের একমাত্র লক্ষ্য এই ভগবান (হীরে) দর্শন - অবতার তা বোঝে এবং বলে। নবীন জহুরী হীরে পেল - ভগবান দর্শন করে ভগবান লাভ করল অর্থাৎ ভগবান হয়ে গেল। বেগুনওয়ালা ও কাপড়ওয়ালাকে বোঝালো - অনুভূতি দান করে ঈশ্বর বোঝালো। পরে একত্ব দান করে (তার সাথে এক করে নিয়ে) আত্মিক জগৎকে পুঁজিবাদের অভিশাপ থেকে মুক্ত করল। ব্রহ্মত্বে (বা একত্বে) সকলের সমান অধিকার।

তিনতলায় কাঁচের ঘরে রাখলেন –

ক) মন অন্তর্মুখী হ'ল - অসতো মা সদ্গময় – এটি একতলা।

খ) মন সহস্রারে গিয়ে ভগবান দর্শন হ'ল – তমসো মা জ্যোতির্গময় - এটি দোতলা।

গ) ঈশ্বরত্ব লাভ করে স্ফটিক সাকার হলেন – সর্বজনীন ও সর্বকালীন হলেন Cosmic Body লাভ হ'ল – মৃত্যোর্মা অমৃতংগময় — এটি তিনতলা।

কাঁচের ঘর - স্ফটিক সাকার।

নবীন জহুরী আর অবতার নন, পরম এক তথা নির্গুণের মূর্ত রূপ। চাকর– ঈশ্বর সন্ধানী মন। জামা খুলে ফেলায় চিনতে পারল – আবরণ উন্মোচন করায় বুঝল ইনি সাকার সগুন ব্রহ্ম নন, সাকার অথচ নির্গুণ ব্রহ্ম। জহুরীর ঘরে সুরক্ষা (Security) আছে - দেহঘর ভোগে বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখায়, দেহ থেকে ভোগের সকল সংস্কার ত্যাগ হয়েছে এমনই পবিত্র দেহ।

✻ মহাভারতের যুদ্ধের পর নতুন যুগের, ভাগবতের যুগের সূচনা হয়েছে। রাজা পরীক্ষিৎকে মৃত্যুকালে শুকদেব ভাগবত শোনালেন। ফলে তিনি মৃত্যুর পর স্বর্গলাভ করলেন। এই ভাগবত অনার্যকৃষ্টির ফসল। আর্যকৃষ্টি জীবদ্দশায় জীবন্মুক্তির কথা বলে, মৃত্যুকালে মুক্তির কথা নয়। তাই যুধিষ্ঠির সশরীরে স্বর্গলাভ করেছিলেন বলা হয়। কিন্তু আর্যকৃষ্টির পতনের কারণও মহাভারতে বলা হয়েছে।

কৃষ্ণ একাধারে দ্বারকার রাজা, বৈদিক ঋষি আবার বৃন্দাবন নায়করূপে অনার্যকৃষ্টির অবতার। বস্তুত কালক্রমে এই তিন পৃথক চরিত্রের সমন্বয়ে কৃষ্ণচরিত্র রচিত্র হয়েছে। অর্জুন ও কৃষ্ণের ভগ্নী সুভদ্রার পুত্র অভিমন্যু যুদ্ধকালে চক্রব্যুহে প্রবেশ করেছিল। কিন্তু বেরোনোর পথ জানা ছিল না। ফলে মৃত্যুবরণ করতে হয়। শাস্ত্রমতে জীবকটি মানুষের মন সপ্তম ভূমিতে উঠে গেলে ২১ দিনের মধ্যে মৃত্যু নিশ্চিন্ত। অভিমন্যু জীবকটি অর্থাৎ সাধারণ মানুষ - ধর্ম জগতে। সুভদ্রা রোহিনীর কন্যা যিনি অনার্যকৃষ্টির সাথে সম্পর্কিত কৃষ্ণের বোন অর্থাৎ অনার্য কন্যা। তাই দেখা যায় পুরীতে সুভদ্রার পূজা হয় শবর মতে, বৈদিক মতে নয়। তিনি শবরদের (ব্যাধ) আরাধ্যা দেবী।

যাই হোক, আর্য ও অনার্যদের মিলনে সৃষ্ট পরবর্তী প্রজন্মের মানুষের দেহের quality খারাপ হয়ে গিয়েছিল (আত্মিক স্ফুরণের পরিপ্রেক্ষিতে)। বৈদিক দর্শনের অনুপযোগী হয়ে গিয়েছিল। অভিমন্যু চরিত্রে সে কথাই বোঝানোর চেষ্টা হয়েছে। সেই অভিমন্যুর বংশধররা অনার্যকৃষ্টির বিস্তারকে ত্বরান্বিত করেছে। পতন হয়েছে বৈদিক কৃষ্টির। কৃষ্ণের মৃত্যু ঘটল অনার্য ব্যাধের তীরে বিদ্ধ হয়ে – এই কাহিনীতেও সেকথা বলা হয়েছে কৌশলে।

তাই দেখি অভিমন্যুর পৌত্র পরীক্ষিৎ এক মৃত সর্পকে শমীক ঋষির ধর্মকে (দেহে কুণ্ডলিনী জাগরণও ব্রহ্মত্বলাভের কৃষ্টিকে) মৃত ও অর্থহীন বলে তাচ্ছিল্য করেছিলেন। স্থিরমতি ঋষি প্রতিক্রিয়া না জানালেও ঋষি সমাজের কেউ কেউ প্রতিবাদে গর্জে উঠেছিলেন। জানিয়েছিলেন অনার্যকৃষ্টির ভাবোন্মত্ততার ফল হ'ল মানুষের আত্মিক সম্ভাবনার অকালমৃত্যু। আর এই ভাবের উচ্ছাস চৈতন্যের জাগরণ তথা কুণ্ডলিনী জাগরণ (প্রতীকে সর্প) নয় – কল্পনার আতিশয্যে

মিথ্যাকে সত্য ভাবা – তক্ষককে বিষধর সর্প ভাবা।

পরীক্ষিতের বংশধররাও সর্পবিদ্বেষী অর্থাৎ আর্যকৃষ্টি বিদ্বেষী হয়ে ওঠে। রাজাদের পৃষ্টপোষকতায় অনার্যকৃষ্টি বিস্তার লাভ করলেও আস্তিকের মত কিছু ঋষি যারা জেনেছেন ধর্ম পজিটিভ (ইতিবাচক), নেতিবাচক নয়, তারা আর্যকৃষ্টিকে রক্ষা করেছেন। যদিও আবেগ কল্পনা ও ভক্তির ধর্ম, ভাগবতের ধর্ম যথেষ্ট প্রচার পায়। তাই পুরানে বলা হয়েছে পরীক্ষিতের রাজত্বকালেই পৃথিবীতে কলির অর্থাৎ মিথ্যার প্রবেশ ঘটেছিল।

✽ পরশমণির ছোঁয়ায় লোহা সোনা হয়ে যায়। তারপর সেই সোনা মাটিতে পুঁতে রাখলে হাজার বছর পরও সেই সোনাই থাকে।

নির্গুণের প্রসন্নতা লাভে প্রাণশক্তি আত্মায় পরিবর্তিত হয় - দেহ আত্মা পৃথক হয়। দেহে আত্মার সাক্ষাৎকার হয়েছে সে কথা চাপা থাকেনা - - তিনি (দেহী) চেপে গেলেও জগতের মানুষ একদিন না একদিন তা জানতে পারবে। শ্রীরামকৃষ্ণের আত্মা সাক্ষাৎকার হয়েছিল - তার সঙ্গকারীরা কেউই তা ধরতে পারে নি। কিন্তু পরবর্তীযুগে শ্রীজীবনকৃষ্ণ তা আবিষ্কার করেছেন। কথামৃতে যখন পড়লেন, ঠাকুর বলেছেন, "কেউ এসে বলবে, এই! এই! তবে জানবি ঠিক ঠিক দর্শন", উনি বললেন, ঠাকুর আমায় জ্যোতির সমুদ্রে অঙ্গুষ্ঠবৎ ঘনজ্যোতি দেখিয়ে বললেন, এই ভগবান, এই ভগবান দর্শন – তারপর ঐ-অঙ্গুষ্ঠবৎ আত্মার মধ্যে বিলীন হলেন। তাহলে ঠাকুর এখানে তার নিজের আত্মা সাক্ষাৎকারের কথা বললেন। তাছাড়া তাঁর আত্মা সাক্ষাৎকার না হলে তিনি অন্য কাউকে আত্মা দর্শন করাতে পারতেন না।

কিন্তু আত্মা বা ভগবান দর্শন জীবনের চরম লক্ষ্য নয়। চরম লক্ষ্য হ'ল – নির্গুণে লয় হওয়া – স্বস্বরূপ ফিরে পাওয়া, তথা পরশমণি হয়ে ওঠা।

তাই জীবনকৃষ্ণ পরশমণি হয়ে মাটির উপরেই থাকলেন, পোঁতা অবস্থায় নয়, দেহবান ব্রহ্ম হয়ে। জেনে বা না জেনে বহুমানুষ তার স্পর্শলাভে ভিতরে তাঁর রূপে ভগবান দর্শন করছে। তিনি কথামৃত খুঁড়ে রামকৃষ্ণের সোনা পাওয়া অর্থাৎ দেহতত্ত্বের ব্যাখ্যায় ভগবান দর্শনের কথা যা ধরিয়ে দিয়েছেন তা বুঝতে পারছেন এই সকল মানুষ। পরে পরশমণিকে আপনার করে পাওয়ায় প্রতিটি

মানুষই যে স্বরূপত ঈশ্বর তা জেনে সকলের সাথে আত্মিক অভেদ জ্ঞান লাভই জীবনের চরম লক্ষ্য তা অনুভব করতে পারছেন।

✽ সোনার একটু কণা সোনার চাপে যতই ঘষোনা কেন তবু একটু কণা থেকেই যায়।

সোনা = আত্মা। সোনার চাপে সোনার একটু কণা = নির্গুণের শক্তিলাভে যতই আত্মার পরিচয় লাভ করতে থাকে - সেই আত্মা ক্রমবিবর্তিত হয়ে বিন্দুতে পরিবর্তিত হয়, জড় সমাধি হয়। স্থিত সমাধি হয় না। ফলে আত্মার পূর্ণ পরিচয় জানা যায় না। নির্গুণের পরিচয় জানা যায় না। ঠাকুরের আত্মা সাক্ষাৎকার ও জড় সমাধি হয়েছিল। শ্রীজীবনকৃষ্ণ পরবর্তী প্রজন্মের মানুষকে নির্গুণের পরিচয় দান করেছেন, জানিয়েছেন আত্মা এক, জগৎব্যাপী এক অখণ্ড চৈতন্যই আছে, সেই একের সাথে এক করে নিয়ে, একত্ব দান করে।

✽ কালী পাঁচ রকম। মহাকালী, নিত্যকালী, রক্ষাকালী, শ্যামাকালী ও শ্মশানকালী।

মহাকালী – নির্গুণ। নিত্যকালী – নাদ। রক্ষাকালী – অনিত্য লীলারূপ – এই স্থুল দেহ। লীলাকে রক্ষা করেছেন। স্থুলচক্ষে একটানা সৃষ্টির দ্বারা। স্থুলদেহে প্রতিদিনই কয়েক কোটি কোষ তৈরী হচ্ছে আবার কয়েক কোটি কোষ মারা যাচ্ছে। প্রতিদিন সৃষ্টির দ্বারা স্থূল দেহ রক্ষা পাচ্ছে। ২৫ বছর পর্যন্ত সৃষ্ট কোষের সংখ্যা মারা যাওয়া কোষের থেকে বেশী। তখন দেহ রক্ষাকালী। ২৫ বছর থেকে ৬০ বছর পর্যন্ত সৃষ্ট কোষের প্রায় সমসংখ্যক কোষ মারা যায় – স্থিতি লাভ হয় দেহের। তখন দেহটি শ্যামাকালী। এরপর সৃষ্ট কোষের চেয়ে অনেক বেশি কোষ মারা যায় – জরাগ্রস্ত হয় দেহ – তখন দেহটি শ্মশানকালী।

✽ "কাঠুরে - ব্রহ্মচারী - এগিয়ে পড়ো" গল্পটিতে সচ্চিদানন্দগুরু লাভে অবতারতত্ত্ব পর্যন্ত সাধনের অনুভূতির কথা বলা হয়েছে। বিশ্বব্যাপীত্ব ও সমষ্টির ধর্মের নিরিখে গল্পটিকে বাড়ালে গল্পটি হবে নিম্নরূপ –

হীরে জহরত পেয়ে কাঠুরে বেশ কিছুদিন আনন্দে কাটালো। তারপর সে একদিন বনের শেষ সীমা দেখতে পেল। ভাবল এবার কী করব ব্রহ্মচারীকে পেলে জিজ্ঞাসা করতাম। হঠাৎ একদিন আয়নায় নিজেকে দেখে চমকে উঠল

– আরে আমিই তো ব্রহ্মচারীর মত দেখতে হয়ে গেছি। এও কী সম্ভব? এই সব ভাবতে ভাবতে বনের সীমা পেরিয়ে সামনে আরও কতকগুলি বন রয়েছে দেখল। একটা বনে ঢুকল। সেখানে এক কাঠুরে তাকে দেখে ব্রহ্মচারী বলে নমস্কার করল। তখন সে বুঝল সে সত্যিই ব্রহ্মচারী হয়ে গেছে। এবার নিজের বিচিত্র অভিজ্ঞতার কথা শোনাল সেই কাঠুরেকে। কাঠুরে বলল, আমি কিন্তু এগোতে পারব না। গভীর জঙ্গলে বাঘ আছে, বিষাক্ত সাপ আছে, আমার ভয় করে। হীরে পাবার আগে প্রাণটাই চলে যাবে। নতুন ব্রহ্মচারী বলল, তবে কী আমার কথা বিশ্বাস করছ না? কাঠুরে বলল, বিশ্বাস না করে উপায় কী? আমি তোমার কথার সত্যতার প্রমাণ পাচ্ছি। কী রকম? তোমার গলায় যে সোনার হার রয়েছে দেখছি, হাতে রূপোর তাবিজ রয়েছে। তুমি নিশ্চয় সোনা ও রূপো পেয়েছো। নবীন ব্রহ্মচারী এবার পাশের একটি বনে গেল। সেখানকার কাঠুরেও তাকে ব্রহ্মচারী বলে সম্বোধন করল। সেও বলল, তোমার সব কথা সত্যি। কেননা তোমার মাথায় একটা হীরে জলছে দেখতে পাচ্ছি। তুমি নিশ্চয় হীরের খনির সন্ধান পেয়েছো। ব্রহ্মচারী এইভাবে বন থেকে বনান্তরে ঘুরে সেখানকার কাঠুরেদের সাথে কথা বলে নিজের অভিজ্ঞতা জানায়। কিছুদিন পর কাঠুরেরা তাকে ব্রহ্মচারী না বলে সন্ন্যাসী বলে প্রণাম করতে লাগল। তাকে সবাই ভালবাসে। তার কথা যে সত্য তার প্রমাণ পায় কিন্তু নিজেরা এগিয়ে যেতে পারে না। তখন সন্ন্যাসী নিজের গায়ের সব অলংকার খুলে তাদের কাছে কাঠুরে বলে পরিচয় দিতে লাগল। তারা তাকে আপনজন ভাবতে লাগল। এবার সন্ন্যাসী কাঠুরে অন্য কাঠুরেদের নিজের কাঁধে চাপিয়ে বনে বনে ঘুরতে লাগল – কাঁধে থেকে যে যা দেখছে সেই অভিজ্ঞতার কথা অপরকে বলে। সকলে ধীরে ধীরে বুঝতে পারল সব বনেই এই কাঠুরের অবাধ গতি আর সব কাঠুরেই পরস্পরের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়। আর এই সন্ন্যাসী কাঠুরে যাকে কাঁধে নেয় সে সব আত্মীয়কে কাছে পেয়ে পরমানন্দ লাভ করে ও বিভিন্ন অরণ্যের বিচিত্র সৌন্দর্য উপভোগ করে জীবন কাটায়।

সচ্চিদানন্দগুরু (ব্রহ্মচারী) লাভে মানুষ ব্যষ্টির সাধনের শেষসীমা অবতারত্ব পর্যন্ত লাভ করতে পারে। পরে আরও এগিয়ে ভগবান হয়ে বিশ্বব্যাপী হ'ন।

শেষে সব উপাধি (গুরু, ভগবান, পরমব্রহ্ম) ত্যাগ করে পরম এক হয়ে জগতের মানুষের সাথে এক হয়ে যান। মানুষ পরস্পরকে আত্মার আত্মীয় জেনে আনন্দ করে ও দেহের আত্মিক ঐশ্বর্য প্রাণ ভরে উপভোগ করে। দেহস্থ আত্মিক চৈতন্য দ্বারা পরিচালিত হয় – দিব্যজীবন লাভ হয়।

✲ বিবিদিষায় নয়, বিদ্বতে বস্তু লাভ হয়। আর মায়া কৃপা করে দ্বার ছেড়ে দিলে তবে মন সপ্তম ভূমিতে প্রবেশ করে। একথা মাথায় রেখে রামকৃষ্ণ কথিত চাষার খানা কাটা গল্পটির যোগের নিরিখে সংশোধিত রূপ হল-

চাষারা খানা কেটে নদীর জল মাঠে আনার চেষ্টা করছে। একজন চাষী কাজ ছেড়ে একদৃষ্টে নদীর জলের দিকে তাকিয়ে আছে। ভাবছে যদি হড়পা বান আসে তো ভাল হয়। সত্যি সত্যিই একসময় হড়পা বান এল। জলস্তর বাড়তে লাগল। নালা আগে থেকেই ছিল। সেই নালা দিয়ে জল গিয়ে পড়ল ঐ চাষার জমিতে। ইত্যিমধ্যে বেলা হয়ে গেছে বলে তার স্ত্রী ও মেয়ে তাকে নাওয়া খাওয়ার জন্য ডেকে ফিরে গেছে। চাষা কারও কথা গ্রাহ্য করেনি। এবার সে আনন্দিত মনে বাড়ী গেল। নাওয়া খাওয়া সেরে তামাক খেতে লাগল। যোগের দৃষ্টি নিয়ে গল্পটিকে আরও বাড়ানো যায়।

পরদিন সকালে গ্রামের বাজারে বীজ আনতে গেল। দেখল অনেক দোকানে বিজ্ঞাপন দিয়ে নানান ফসলের বীজ বিক্রি হচ্ছে। কিন্তু চাষার বিশ্বাস হ'ল না যে বীজগুলি খাঁটি। কারণ ঐ বীজ যারা কিনেছে তাদের জমিতে শুধুই আগাছা জন্মেছে। আগে একজনের জমিতে ফসল হয়েছিল কিন্তু সে বীজ কোথা থেকে পেয়েছিল জানা নেই। এবার নিজের জমি দেখতে গেল। গিয়ে দেখে তার জমিতে একটা আম গাছের চারা বেরিয়েছে। বীজ তাহলে জমিতেই ছিল! যাই হোক চাষা বসে বসে গাছটির বাহার দেখতে লাগল। কালক্রমে গাছটা বড় হ'ল। আম ধরল প্রচুর। আম পাকল। একটা আম খেয়ে তো তাজ্জব হয়ে গেল। কী সুস্বাদু! মাঠের পাশ দিয়ে যারা যাচ্ছে তারা ঐ গাছ দেখে একটু দাঁড়িয়ে যাচ্ছে। চাষা ওদের ডেকে আম খেতে দিল। ওরা আম খেয়ে ধন্য ধন্য করল। ওরাও বলাবলি করতে লাগল আঁটিটা চাষার মুখের মত কেন? পথিকরা পেট ভরে খায় আবার সঙ্গে নিয়ে যায় লোককে বিলোবার

জন্য। ঐ আম যে খায় সে-ই চাষার কথা জানতে পারে আঁটিটা, দ্যাখে আর সুখ্যাতি করে। এত প্রশংসা চাষার ভালো লাগে না। পরদিন চাষা দ্যাখে আমগাছটার পাশে একটা পেঁপে গাছ জন্মেছে আপনা হতে। আম গাছের বৃদ্ধি থেমে গেছে কিন্তু পেঁপে গাছ বাড়ছে। পরে পেঁপে ধরল। একটি পেঁপে চাষা খেতে আর করল। দেখল – ভিতরে বীজগুলির প্রত্যেকটি এক একটি পথচারীর মুখের মত। চাষা এবার খুব খুশি। অন্য পেঁপেগুলো পথচারীদের খেতে বলল। তারা খেয়ে ধন্য ধন্য করল।

চাষা পরদিন সকালে আবার জমিতে এল। আজ পেঁপেও ভাল লাগছে না। সে চুপ করে বসে আছে। কিছুক্ষণ পর সে স্থির হয়ে গেল – নিজেই একটা গাছের আকৃতির হয়ে গেল। অচিনে গাছ। তার ডাল পালা নেই, পাতা নেই। বড় গুঁড়িওয়ালা আকাশ ছোঁয়া লম্বা গাছ। পথিকরা এসে ঐ গাছ দেখে অবাক। লক্ষ্য করল গাছে খোপ খোপ গর্ত রয়েছে। তাতে পা দিয়ে ওপরে ওঠা যায়। কয়েক ধাপ উঠে ঐ গাছের মিষ্টি রস একটু মুখে দিয়ে দ্যাখে অপূর্ব আস্বাদ, যেন মধু। উপরে উঠে কেউ যখন ঐ মধু খাচ্ছে, তখন তাকে দেখা যাচ্ছে না – ঐ গাছের রঙের সাথে এক রঙ হয়ে যেন মিশে যাচ্ছে। তারপর নিচে নেমে এলে দেখা যাচ্ছে সে খুব শক্তি লাভ করেছে, যেন যুবক হয়ে গেছে। শিশুবৃদ্ধ সকলেই এভাবে ভিতরে ভিতরে যৌবনের তেজ অনুভব করতে লাগল। অন্যদের তা বললেও অধিকাংশ লোক আমগাছ ও পেঁপে গাছের দিকে তাকিয়ে আছে। যদিও একটু একটু করে অচিনে গাছের কাছে এসে তার দিকে লক্ষ্য করার ও তার মিষ্টরস পান করার লোকের সংখ্যা বাড়তে লাগল। চাষাকে কেউ খুঁজে পেল না।

শ্রীরামকৃষ্ণ কথিত গল্পে চেষ্টা করে অবিদ্যামায়া ও বিদ্যামায়াকে (স্ত্রীও মেয়ে যার প্রতীক) জয় করে সহস্রারে প্রাণশক্তির গতিলাভ ও ভগবান দর্শনের নিশ্চয়তা লাভের কথা বলা হয়েছে। সংশোধিত গল্পে আপনা হতে ঐ অবস্থা লাভের কথা বলা হয়েছে। সম্প্রসারিত গল্পে দেহের মধ্যে আত্মার নামবীজ রূপে প্রকাশ পাওয়া, ব্যক্তির ব্রহ্মজ্ঞান (আম) লাভ, পরে ভূমানন্দ লাভ (পেঁপে) ও অবশেষে অচিনে গাছ পরম একে রূপান্তরের কথা বলা হয়েছে। এই একের

একত্ব লাভে প্রত্যেকের মধ্যে আত্মিক বিকাশের সর্বোচ্চ সম্ভাবনা জেগে ওঠে (যুবক হয়ে ওঠে) ও আত্মিক একত্বের মাধুর্য আস্বাদন করে। চাষাকে খুঁজে পেল না মানে ব্যক্তিপূজার (hero worship) অবসান হ'ল।

✻ মহাভারতে আছে পাণ্ডবদের বনবাসকালে একবার কৃষ্ণ একটি আম এনে পাণ্ডবদের সামনে দ্রৌপদীকে দিয়ে বলল, এটি আমাদের কেটে খাওয়াও। তবে কোন গোপন ইচ্ছা থাকলে আমটি কাটা যাবে না। দ্রৌপদী সত্যি সত্যিই আমটি কাটতে পারল না। তখন কৃষ্ণ বলল, ইচ্ছাটি সকলের সামনে বলে ফেল, তাহলে তুমি আমটি কাটতে পারবে। দ্রৌপদী তখন বলল, যখন আপনি জানালেন, কর্ণও পাণ্ডবদের ভ্রাতা তখন মনে হয়েছিল উনিও আমার স্বামী হলে ভাল হ'ত। পরে দ্রৌপদী বলল, সখা এভাবে আমাকে অপদস্থ করলে কেন? কৃষ্ণ বলল, তুমি আমার ভক্ত, তোমায় আমি অষ্টপাশ মুক্ত করলাম। গোপনতা যে অষ্টপাশের একটি পাশ।

দ্রৌপদী কর্ণকেও বিয়ে করলে কী হত? কানে শোনা কথার প্রভাব পড়ে যেত কারণশরীরের লীলায় - সাধকের দর্শনে। সাধক ব্রহ্মজ্ঞান লাভে সমর্থ হতেন না। সচ্চিদানন্দগুরু লাভ হলে, কৃষ্ণকে গুরু রূপে পেলে জৈবী স্বপ্ন আর হয় না, তখন সব স্বপ্নই দেবস্বপ্ন, আত্মিক জ্ঞানের আধার রূপে প্রকাশ পায়।

✻ ভাগবতের প্রত্যেক অধ্যায়ের শেষে বলা হয়েছে পরমহংসদের সংহিতার (আকর গ্রন্থের) অমুক অধ্যায় এখানে শেষ হ'ল (পরমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং)। আবার বেদান্ত মতে সিদ্ধ হলে পরমহংস হয়। তাহলে দাঁড়াল এই যে বেদ ও বেদান্ত ধর্ম জানার পর ভক্তি নিয়ে থাকার কথা বলছে ভাগবত।

আবার বলছে, এই ভাগবত বেদরূপ কল্পতরুর ফল। অর্থাৎ বেদান্তের সাধনের effect (ফল) বা পরিণতি এই ভক্তিতত্ত্ব। সত্যিই তাই, মহাকারণ থেকে মন তত্ত্বজ্ঞানে নামলে তত্ত্বফল আহরণ করার দর্শন হয়।

✻ হালদার পুকুরের পাড়ে লোকে বাহ্যে করত। দুর্গন্ধ উঠত। কারও কথায় কাজ না হওয়ায় চাপরাশী এসে নোটিশ টাঙিয়ে দিলে, "এখানে বাহ্যে

করিও না।” অমনি হালদার পুকুরের পাড়ে বাহ্যে করা বন্ধ হল। আধিকারিক পুরুষের কথায় বর্হিমুখী মন অন্তর্মুখী হ’ল।

কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের দেহ যাবার পর তিনি যে বাণী দিয়ে গেলেন – “মনুষ্য জীবনের উদ্দেশ্য ভগবান দর্শন ভগবান লাভ”, দেখা গেল সে দিকে মানুষের দৃষ্টি পড়ছে না। তিনি যে কর্মযোগ ছেড়ে মনযোগ অর্থাৎ সর্বদা ঈশ্বরের স্মরণ মননের মাধ্যমে যোগের কথা বলে গেছেন, তা চাপা পড়ে গেল। তার দর্শন অনুভূতি নিয়ে চর্চা হয় না। ফলে মানুষের মন আবার বহির্মুখী হ’ল।

এলেন নতুন চাপরাশী। তাঁর গায়ে লেখা ফুটে উঠল – “বাহ্যে করিও না”।পুকুর পাড়ে যারা তাকে কাছে থেকে দেখল তারা বাহ্যে করতে পারল না। কিন্তু যারা দেখেনি তারা বাহ্যে করা বন্ধ করেনি। এবার নতুন একটা কাণ্ড হল। তাঁকে যারা বেশিক্ষণ ধরে দেখছেন তারা লক্ষ্য করলেন তাদের গায়েও লেখা ফুটে উঠেছে – “বাহ্যে করিও না”। অনেক লোকের এরূপ অবস্থা হওয়ায় তারা জানল পুকুর পাড়ে বাহ্যে করা যাবে না। তখন বাহ্যে করা বন্ধ হল। এ বিষয়ে স্থায়ী একটি ব্যবস্থার সূচনা হ’ল। বোঝা গেল এবারে আর চাপরাশী নয়, কোম্পানীর Chief Executive Officer এসেছিলেন।

সচ্চিদানন্দগুরু রূপে নয়, যখন একজন মানুষ পরম একে পরিবর্তিত হন ও বহু মানুষকে তার সাথে এক করে নেন, তখনই জগৎ দুর্গন্ধমুক্ত অর্থাৎ ঈশ্বরমুখী হতে পারে।

✲ গয়লানী ও গুরুদেবের গল্পে ঠাকুর যে অক্ষয় ঘটের গল্প বলেছিলেন বস্তুত তা নিজেরই কথা – তিনিই অক্ষয় ঘট হলেন ভগবানের কৃপায়। তিনি বলছেন, আমার কথা যেই ফুরিয়ে আসে মা আমার কথার রাশ ঠেলে দেন। তিনি বললেন, আমি গুরু হতে পারি না, আমায় মন্ত্র দিতে নেই। গুরু এক সচ্চিদানন্দ। .... তাই তাঁর গুরুরা (ভৈরবী, তোতাপুরী ইত্যাদি) তাঁর কৃপা লাভে ধন্য হয়েছিলেন। তিনি নিজেই তাঁর গল্পের গয়লানী শিষ্যা হয়ে উঠেছিলেন। তিনি বলেছেন, ‘বিজ্ঞানীর এলানো ভাব’। ‘আমার মেদী ভাব’। অক্ষয় ঘট হয়ে তিনি সত্যিই হুড়হুড় করে দুধ দিয়েছেন জগতের সমস্ত মুমুক্ষু মানুষদের।

স্মৃতিকথা

শ্রীজীবনকৃষ্ণের পূতসঙ্গলাভে ধন্য কিছু মানুষের টুকরো কিছু স্মৃতিকথা এখানে উল্লেখ করা হলো।

নিতাই পাত্র

(ক) **১৯৫৬** সালের প্রথম দিকে একদিনের কথা মনে পড়ছে। সিংহরায় মহাশয় ভূতের প্রসঙ্গ তুললেন। বললেন – “ভূত কী বলুন তো? জীবনকৃষ্ণ বলতে লাগলেন - ভূত কী বলব? ভূত নিজের দেহ থেকে বেরোয়। তবে একটা ঘটনা বলি শুনুন। সারদা প্রসন্ন মহারাজ শিক্ষিত মানুষ। এফ.এ পাশ করে বরানগর মঠে এলেন। কিছু দিন পর শুনলেন অমুক জায়গায় ভূত আছে। তাঁর খুব কৌতুহল হল। খুঁজে খুঁজে তিনি সেই ভুতুড়ে বাড়িতে এসে পৌঁছালেন। দেখলেন একটা দোতলা বাড়ী। ভিতরে গিয়ে সেখানে বসে রইলেন। একটা আলো জ্বেলে রাখলেন। রাত একটু বেশী হতেই দেখলেন একটা জ্যোতি ঘুরে বেড়াচ্ছে। জ্যোতিটা দেখতে একটা বড় চোখের মত। পরে জ্যোতিটা তার দিকে আসতে লাগল, তখন তাঁর ভয় হল। তিনি ঠাকুরের নাম করতে লাগলেন। ঠাকুর এলেন, তাঁর হাত ধরে দোতলার ঘর থেকে তাঁকে নীচে বাইরে নিয়ে এলেন। তখন ঠাকুর তাঁকে বললেন, এরকম করে নিজেকে আর বিপদে ফেলিস না অর্থাৎ ভূত ভূত করিস না। তিনি ভূত ভূত করেছিলেন, তাই ভূত তাঁর দেহ থেকে বেরিয়েছিল।

(খ) শ্রীজীবনকৃষ্ণ মাঝে মাঝে আমাদের কাশীর গল্প বলতেন। মানুষ কত সহজে কত গভীরভাবে তাঁকে ভালোবেসে ফেলতেন তাঁর কথা শুনে বুঝতে পারলাম। একদিন বললেন - কাশীতে কিছুদিন “শ্রীনাথ ভবন” নামে একটি বাড়ীতে থাকার পর ঠাকুর জুটিয়ে দিলেন এক চমৎকার বাড়ী। বাইরের জগতের সঙ্গে তার কোন সংস্রব নেই। কুমারকৃষ্ণ নন্দী - যিনি ঠাকুরের “কথাসার”

লিখেছেন, তিনি বোধহয় বাড়ীটার সাথে কোনভাবে সংশ্লিষ্ট আছেন। যাই হোক বাড়ীর মালিক (কৃষ্ণানন্দ যোগাশ্রমের অধ্যক্ষ) খুব ভালো লোক। আমাদের সঙ্গে খুব সদ্ব্যবহার করেছেন। যাতে সেখান থেকে না আসি তার জন্য চেষ্টা চালাতে লাগলেন। শেষে একদিন আমাকে বলে দিলেন, যদি কখনও আসেন, দয়া করে এখানে এসে থাকবেন। এ বাড়ী আর কাউকে দেব না। এ আপনার জন্য খালি পড়ে থাকবে। কিন্তু হলে কী হবে, এখানেও সেই কারবার! অনেক লোক যেতে লাগল – কেউ এলাহাবাদ থেকে, কেউ পাটনা থেকে। একজন এসে বললেন, মশাই, দশ দিন আগে আপনাকে স্বপ্নে দেখেছি।

(গ) একদিন পাঠ হচ্ছে, শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন – 'আমি সব মেয়েকেই মা আনন্দময়ী দেখি' একথা শুনেই জীবনকৃষ্ণ আমাদের একটা কাহিনী শোনালেন। ঠাকুর একবার দেশে যাচ্ছেন। রামলাল বাবু বললেন, খুড়োমশাই আমিও দেশে যাব। মা বড় বেশী খরচ পত্র করেন। আপনি মাকে একটু বকে দেবেন তো। ঠাকুর দেশে এলেন। কিছুদিন পর রামলাল বাবুও দেশে এলেন। রামলালবাবু তখন বেশ দু পয়সা রোজগার করেন। তার কারণ কালীঘরের তিনি পূজারী। কালীঘরের প্রণামীটা তিনি সব পেতেন কিনা। তাঁর মা খরচ একটু বেশীই করতেন। রামলাল বাবুর সেটা ইচ্ছা নয়। একদিন ঠাকুর বাইরের ঘরটায় বসে আছেন। রামলালবাবু বললেন, খুড়োমশাই, চলুন না, মাকে একটু বকে দেবেন। তা ঠাকুর অমনি উঠে পড়লেন। রামলাল বাবুর মা অর্থাৎ ঠাকুরের মেজভাজ তখন রঘুবীরের দাওয়াটায় বসে ছিলেন। ঠাকুর চটি জুতো পায়ে দিয়ে উঠোন পেরিয়ে রঘুবীরের দাওয়ার সামনে এসে রামলাল বাবুর মাকে একটা প্রণাম করে আবার বাইরের ঘরে এসে বসে পড়লেন। ব্যাস বকা হয়ে গেল, কি বলিস?

রামলালবাবু বললেন, কি খুড়োমশাই, কি হল? ঠাকুর বললেন, বাবা কী হল জানিস? গিয়ে দেখলুম, দক্ষিণেশ্বরের মা বসে আছেন। তাই প্রণাম করে চলে এলুম॥

দিলীপ কুমার ঘোষ

(ক) পাঠে একদিন অষ্ট্রিয়ার শিল্পী ফ্রাঙ্ক ডোরাক শ্রীরামকৃষ্ণের যে ছবিটা এঁকেছিলেন, সে বিষয়ে কিছু তথ্য জানতে পেরে আশ্চর্য লাগলো। জীবনকৃষ্ণ বললেন - ফ্রাঙ্ক ডোরাকের ঠাকুরের ঐ অবস্থার ছবি আঁকতে গিয়ে আচম্বিতে মনে উঠল - আচ্ছা, লোকটির যদি চোখ খোলা থাকত, তা হলে মুখের ভাব তাঁর কেমন হতো? ভাবাও যা, আর হাতও বন্ধ হলো। ভদ্রলোক ৯মাস পরে ঠাকুরকে চোখ খোলা অবস্থায় স্বপ্নে দেখে - খুব vivid (স্পষ্ট)। তারপর সে এই ছবি আঁকে।

(খ) বৃটিশ শাসনে সাহসিকতার কথা বলতে গিয়ে আমরা স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় বা বিদ্যাসাগরের জীবনের কিছু ঘটনার কথা বলে থাকি। জীবনকৃষ্ণ আমাদের একদিন বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনের এ ধরনের একটি ঘটনার কথা শুনিয়েছিলেন।

বঙ্কিমবাবু কারোর কাছে মাথা নোয়াতেন না। এই হাওড়াতে তখন মিঃ ম্যাকওয়ারস ম্যাজিস্ট্রেট, আর বঙ্কিমবাবু সিনিয়ার অফিসার। এদিকে এই ইংরেজ মাথা নীচু করতে জানে না। প্রত্যেকদিন করত কি জানিস, পাঁচটা বাজবার সঙ্গে সঙ্গেই ওপর থেকে নামতেন। নীচে গাড়ি মজুত থাকতো। কোন কথা নয়, একেবারে সটান বাড়ী। অন্যান্যরা অফিসের কাগজপত্র বাড়ি নিয়ে যেত, সময় কুলিয়ে উঠত না বলে। বঙ্কিমবাবুর এসব ছিলো না। আর থাকবে কোথা থেকে? বাড়ীতে গিয়ে তাঁকে বই লিখতে হবে তো! সুতরাং ঐ জাজমেন্ট লেখা শেষ করে স্পট রেমিডি করে বাড়ি যেতেন। এর জন্য আধঘন্টা তিন কোয়ার্টার তাকে বেশী খাটতে হতো। কিন্তু ম্যাকওয়ারস আরদালী পাঠানো অব্দি আর এক মিনিটও অফিসে থাকতেন না। ম্যাকওয়ারস এদিকে রাগে ফুঁসতেন। একদিন তিনি ওই রকম ভাবে আরদালীকে পাঠিয়ে নীচে এসে দাঁড়িয়েছেন। ভালভাবেই জানেন আরদালীর কথায় বঙ্কিমবাবু আসবে না। বঙ্কিমবাবু নীচে নেমে দেখেন ম্যাকওয়ারস দাঁড়িয়ে। তা কুছপরোয়া নেহি। ম্যাকওয়ারসকে কি বললেন জানিস – মিষ্টার ম্যাকওয়ারস, ইউ ওয়্যার ইন দ্য

ক্রেডল হোয়েন আই স্টার্টেড মাই লাইফ হীয়ার (Mr. Macwars, you were in the cradle when I started my life here) অর্থাৎ শিশুকালে তুমি যখন দোলনায় দুলছো আমি তখন এখানে কাজ শুরু করেছি– বলেই গট্ গট্ করে গাড়িতে উঠে চলে গেলেন। যা পারে শালা করুক না, এখন তো বাড়ি যাওয়া যাক।

কাহিনী শেষ করেই তিনি হো-হো শব্দে হেসে উঠলেন।

অসীম বিশ্বাস

আমাদের প্রায়ই মনে হতো জীবনকৃষ্ণ আত্মিক উন্নতির কথা যা বলছেন সে তো খুব ধীর গতির প্রক্রিয়া। এই নিয়ে একদিন আলোচনা হচ্ছিল। জীবনকৃষ্ণ আমাদের বললেন, দ্যাখ খুব তাড়াতাড়ি হওয়া ভাল নয়। তিলে তিলে তিল ভাণ্ডেশ্বর হওয়াই ভালো। খুব তাড়াতাড়ি হওয়ার একটা ঘটনা বলি শোন্।

তখন আমার অন্য অবস্থা। ব্রহ্মবিদ্যা কিরূপ জানতে ইচ্ছা হল। ভাবলাম এমন লোক চাই যে কিছু জানবে না - মুখ্যু। আর খুব শক্তিমান হবে। আমি ভেবেছি আর আমার ঠাকুর ঠিক সেই রকম একটি লোক জোগাড় করে রেখেছেন। সে এখানে আসার আগে আমায় দেখেছিল। যেমন তুই দেখেছিস। তাকে একজন স্বপ্নেই বলে দিয়েছিল যে, দ্যাখ এই লোককে তুই এই অঞ্চলে খুঁজে পাবি। সে তাই খুঁজতে বেরুত মাঝে মাঝে। একদিন হাজির হল আর বলল আপনাকে আগে দেখেছি। দেখলাম, হাত পা গুলো যেমনটি চেয়েছিলুম - ঠিক তেমনি। জানলুম সে লরী ড্রাইভার। আমি জিজ্ঞাসা করিনি। সে একদিন বলল। তারপর শোন। সে আসতে যেতে লাগলো। মাত্র ২৭ দিনে তার সাধন শেষ হয়ে গেল। একদিন দুপুর বেলা এসে হাজির। ঘরে তখন কেউ ছিলো না। আমি তাকে বললুম যে, আয় একটু ধ্যান করি। অনেকক্ষণ পর আমার ধ্যান ভেঙ্গে গেল। ওর তখনও ভাঙ্গেনি। তারপর ধ্যান ভাঙ্গতে জিজ্ঞাসা করলুম যে কিছু দর্শন হলো কিনা। সে বললো, দেখুন চোখ বুজলে লোকে অন্ধকার

দেখে, আর আমি দেখলাম আকাশ। আমি এটুকু শুনে ভাবলাম যে হয়ত পঞ্চমভূমিতে মন উঠেছে, তাই আকাশ দেখেছে। তারপর সে বলল - সেই আকাশের নীচে একটা ওঁ ঝুলছে। তার নীচে ঠাকুর (শ্রীরামকৃষ্ণ); তারপর আপনি। তার নীচে মা কালী। শুনে আমি হতবাক। বেদের নিগমের সাধন তার হয়ে গেল। প্রথমে আকাশতত্ত্ব, তারপর বীজ নাদ (ওঁ), তারপর অবতার (শ্রীরামকৃষ্ণ) তারপর আমি (মানুষতত্ত্ব), তারপর আদ্যাশক্তি। — তারপর কি হলো বলতো? সে লরী ড্রাইভার ছিলো তো। এখন যেখানে কাজ করত, সেই চাকরী চলে গেল। শেষকালে কটকে গিয়ে ড্রাইভারের কাজ খুঁজে নিল। এখানকার সঙ্গে সম্বন্ধ শেষ হয়ে গেল। তাই বলছি তাড়াতাড়ি হওয়া ভালো নয়।

বঙ্কিম চক্রবর্তী

(ক) জীবনকৃষ্ণের ঘরে প্রতিদিন কত যে বিস্ময়কর ঘটনা ঘটতো তার সবগুলি কারও পক্ষেই মনে রাখা বা লিখে রাখা সম্ভব ছিলো না। — একদিনের ঘটনা। মনমোহন চক্রবর্তী নামে একজন ভদ্রলোক সেদিন প্রথম এসেছেন। ঘরের মধ্যে প্রবেশ করা মাত্র জীবনকৃষ্ণকে দেখে এতটাই বিহ্বল যে কোন কথা মুখ দিয়ে উচ্চারণ করার আগেই ভাবস্থ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন। অনেকক্ষণ তাঁকে ঐভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে সকলে বুঝতে পারলো যে উনি আর প্রাকৃত অবস্থায় নেই। তখন সকলে তাঁকে ধরাধরি করে বসিয়ে দিল এবং পাখার বাতাস করতে লাগলো। কিন্তু তিনি তখনও কথা বলার অবস্থায় নেই। যার সঙ্গে এসেছিলেন সেই ছেলেটি বললো যে, এখানে আসার অনেক আগে উনি শ্রীজীবনকৃষ্ণকে দর্শন করেছেন। আর সেই জন্য ঘরে প্রবেশ করে তার এমন অবস্থা হল। অনেকক্ষণ পর তিনি প্রকৃত অবস্থায় ফিরে এলেন।

(খ) ১৯৫৫ সাল। একদিন জীবনকৃষ্ণ বললেন, স্ত্রীলোক নিয়ে মহাপ্রভুর একটা গল্প শোন্। মহাপ্রভু যতদিন পুরীতে ছিলেন, ততদিন প্রতিবছর বাংলা থেকে রথের সময় বহু ভক্ত যেতেন তাঁকে দর্শন করতে। নবদ্বীপের মধু নামে এক ময়রা একবার স্ত্রীকে নিয়ে পুরীতে গেল। মহাপ্রভু তাকে খুড়ো বলতেন।

মহাপ্রভু তো তাকে খুব মেলানি দিলেন। তখন তিনি প্রার্থনা জানালেন খুড়িটিও যেন মহাপ্রভুর দর্শন পায়। শুনে মহাপ্রভু পার্ষদদের বলে দিলেন, মধুখুড়োকে বলে দাও, খুড়িটি যেন না আসে। বৈষ্ণবদের গানে তাই আছে "গোরা নারী হেরবে না।"

বিনয় কুমার মুখোপাধ্যায়

(ক) জীবনকৃষ্ণের ঘরে পাঠ ও অনুশীলন চলাকালীন টুকরো টুকরো নানা ঘটনা ঘটত। যার দ্বারা আমরা নানাভাবে সমৃদ্ধ হয়েছি। – একদিনের ঘটনা মনে পড়ছে, ঘরে কথামৃত পাঠ চলছে। এরই মধ্যে দিলীপ ঘোষ আর বিনয় রায় পরস্পরের মধ্যে কি সব কথাবার্তা বলে চলেছেন। পাঠে একেবারেই মনোযোগ নেই। সেটা লক্ষ্য করে শ্রীজীবনকৃষ্ণ তাঁর চোখ বন্ধ করতেই তাঁদের দুজনকে ভিতরে দেখতে পেয়ে বললেন, তোরা দুজনে অন্যমনস্ক হয়ে নিজেদের মধ্যে গল্প করছিস, তাই আমি তোরা দুজন হয়ে কথামৃত শুনছিলাম। আমরা স্তম্ভিত হয়ে গেলাম।

ভূমিকা

আত্মা নির্বিশেষ (গুণাতীত), সর্বব্যাপী ও অনন্ত। এরূপ অনন্ত বস্তু কখনও দুটি হতে পারে না। কারণ তাহলে এক অনন্তের দ্বারা অপর অনন্ত সীমাবদ্ধ হবে। তাই আত্মা এক।

এই আত্মা কোন মানুষের দেহে সংকলিত ও রূপান্তরিত হয়ে দৃশ্যমান হলে ঐ দেহী ষোল আনা অহংশূন্য হয়ে এক অখণ্ড আত্মাকে ধারণ করতে সক্ষম হন।

ঐ যুগে জগতের অপর কোন মানুষের ষোল আনা অহংশূন্য হওয়া সম্ভব হয় না। ঠাকুরের কথা, "অশ্বত্থ গাছের ডাল আজ কেটে দাও আবার কাল ফেঁকড়ি গজাবে।" অহং সম্পূর্ণ লোপ না পাওয়ায় সাধারণ মানুষ দ্বৈতজ্ঞানে থাকে এবং ঐ আত্মা-সাক্ষাৎকারীর চিন্ময়রূপ অন্তরে দর্শন করে তাঁকে পরমাত্মা রূপে এবং নিজেদেরকে জীবাত্মা বলে অনুভব করে। বোধ হয়, জীবাত্মা পরমাত্মারই ক্ষুদ্র অংশ বিশেষ।

পরবর্তী ধাপে, ঐ মানুষটির চিন্ময়রূপকে অখণ্ড চৈতন্যের মূর্তরূপ বলে বিভিন্ন দর্শনে জানলে ও তার সাথে এক হলে (একত্বলাভ হলে) আত্মিক জগতে মানুষের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য (individuality) লোপ পায়। প্রত্যেকের স্বরূপ যে এক অখণ্ড চৈতন্য তা উপলব্ধি হয়। অতঃপর প্রতিটি মানুষই আত্মিকে এক ও অভিন্ন সত্তা - এই বোধোদয়-ই যে প্রকৃত ধর্ম তা জানা যায়।

অখণ্ড মানবচৈতন্য প্রথমে একটি মাত্র মানবদেহ অবলম্বন করে বিকশিত হয় - অঙ্গুষ্ঠবৎ আত্মারূপে দৃশ্যমান হয় - কিন্তু অপরে তার প্রমাণ পায় না। এটি তার মধ্যে আবদ্ধ অর্থাৎ ব্যষ্টির সাধন। ব্যষ্টির সাধন কোন দেহে পূর্ণ মাত্রায় হলে পরে ঐ মানুষটির চিন্ময়রূপে তার দেহে জেগে ওঠা ব্রহ্মত্ব তথা অখণ্ড চৈতন্যের আলো জগৎব্যাপ্ত হয় – অসংখ্য মানুষ অন্তরে তা দর্শন করে,

তাঁকে সত্যমূর্তি (Real man) রূপে অনুভব করে – এটি বিশ্বব্যাপিত্ব। পরবর্তী ধাপে, অনেক মানুষ এই বিশ্বমানবের সাথে আত্মিকে এক হয় (একত্ব লাভ করে) – অন্তরে দৃষ্ট তাঁর চিন্ময় রূপকে নিজেদের real self বলে উপলব্ধি করে তখন তারাও সত্য হয়ে ওঠে, অনন্ত হয়ে ওঠে। এই অনেকের মধ্যে দিয়ে অখণ্ড চৈতন্যের বিকাশকে বলে সমষ্টির সাধন। এ যেন একজন রাষ্ট্রপ্রধান হয়ে আরও অনেককে মন্ত্রীসভার সদস্য করে গণতান্ত্রিক এক সরকার পরিচালনা করা।

এখন স্পষ্টতর ভাবে বোধগম্য হয় যে ঈশ্বর নৈর্ব্যক্তিক (impersonal)। মানুষের আত্মিক জীবন ও ব্যবহারিক জীবন সম্পূর্ণ আলাদা। ব্যক্তিমানবে ঈশ্বরীয় সত্তা আধারিত হলেও তা মানুষটির ব্যক্তিগত জীবনের (ব্যবহারিক জীবনের) সাথে সম্পর্কিত নয়। তাই সর্ব শ্রেণীর মানুষের পক্ষেই আত্মিক জীবন লাভ সম্ভব। এই আত্মিক জীবনে মানুষ ব্রহ্মানন্দের সাথে সাথে সমষ্টিগত জীবনেরও স্বাদ পায়। কেননা আত্মা হ'ল – সব মানুষের মধ্যে নিহিত দেবত্বের নির্যাস - (sum total of essence of life power of all individuals) - ব্যক্তিমানুষে গচ্ছিত রাখা সমষ্টির (মনুষ্যজাতির) ধন।

যারা এই সমষ্টির সাধনের শরিক হন তারা অফুরন্ত আত্মিক ঐশ্বর্য্য লাভ করেন। ব্রহ্মবিদ্যা চর্চা তথা স্মরণ মনন মাত্র যাতে দেহ যোগযুক্ত হয় তার জন্য প্রয়োজনীয় নিয়ন্ত্রণ আরোপিত হয় তাদের জীবনে আপনা হতে, আত্মিক শক্তির দ্বারা। কেননা তাদের জীবনযাত্রা হবে সহজ সাধারণ, ভোগ বিলাসের জীবন নয়। শুধু যে তারাই দেবত্বের বিকাশের সুফল ভোগ করেন তা নয়। এর সুফল পান সমগ্র মনুষ্যজাতি, যদিও তা ব্যবহারিক জগতে সুখ সুবিধার ক্ষেত্রে নয়।

যারা একত্ব লাভ করেনি তাদের অনেকে ব্যবহারিক জগতের ঘাত প্রতিঘাতে ক্লান্ত বিধ্বস্ত হয়ে ব্রহ্মত্ব বা একত্বের মূর্তরূপকে অন্তরে দর্শন করে ও একত্বলাভকারী মানুষজনের সান্নিধ্যে এসে শান্তির স্পর্শ লাভ করে।

একত্বলাভকারী মানুষরা উপলব্ধি করেন আত্মিকে সকলে এক সত্তা। তাই অপরকে আঘাত করলে নিজেকেই আঘাত করা হয়। এই শিক্ষার শুভ

প্রভাব পড়ে অন্যদের মধ্যেও। সর্বোপরি সমষ্টির সাধনে জেগে ওঠে নতুন এক সংস্কৃতি তথা উন্নত একটি কৃষ্টি - একটি বিশেষ জীবন ধারা, যা সমাজে কল্যাণকর প্রভাব ফেলে। সমাজে প্রচলিত মিথ্যা সংস্কারজ ভাবনা ও আচরণ যা মানুষের মনকে দুর্বল করে, মানুষে মানুষে ভেদ সৃষ্টি করে তা ধীরে ধীরে লোপ পায়।

ধর্মজগতে এই নতুন বিকাশের সূচনা হয়েছে। আমরা নিজেদের জীবনে তার কিছু আভাস পাচ্ছি। সেকথাই এখানে বলার চেষ্টা করা হয়েছে বিভিন্ন দর্শনের কথা উল্লেখ করে।

৭ই জ্যৈষ্ঠ, ১৪২২

মশারী

✲ দেখছি (মার্চ,২০১৫) – ঘরের চার দেওয়ালে বহু দেবদেবীর ছবি রয়েছে। সেগুলো দেখছি। ঘরের মাঝে খাট আছে – বিছানা পাতা – মশারী খাটানো। মশারীর দিকে চোখ যেতেই দেখি সেখানে একজন মহাপুরুষের ছবি – খালি গায়ে ধুতি পরে বসে আছেন। মাথায় ছোট ছোট চুল। ঘুম ভাঙল। পরে ফটো দেখে বুঝলাম স্বপ্নদৃষ্ট ঐ মহাপুরুষ আর কেউ নন, স্বয়ং জীবনকৃষ্ণ। এটি আমার তাঁকে দেখা প্রথম স্বপ্ন।

— ভাস্কর মণ্ডল (গোপালপুর)।

ব্যাখ্যাঃ দেওয়ালে দেবদেবীর ছবি – সংস্কারের ছাপ। মশারীতে জীবনকৃষ্ণের রূপ – কারণশরীরে সত্যমূর্তির অবস্থান।

✲ গত ফেব্রুয়ারীতে এক রাত্রে স্বপ্নে দেখছি – শ্রীজীবনকৃষ্ণ আমাকে অঙ্ক করাচ্ছেন। পারছি না বলে খুব মারছেন। ...... ঘুম ভাঙল। এই প্রথম তাঁকে দেখলাম। কিন্তু ভগবান মারছেন কেন?

— সৌম্যদীপ দাস (গড়গড়িয়া)।

ব্যাখ্যাঃ দেহকে যোগের অনুশীলনের উপযুক্ত করে তুলছেন।

✲ দেখছি – এক জায়গায় অনেক গেরুয়াধারী সন্ন্যাসী ধর্ম প্রচারক – তারা বক্তৃতা দিচ্ছে একজন একজন করে। হঠাৎ একজন ব্রহ্মচারী এলেন - – ধীর পায়ে মঞ্চে উঠলেন – তখন দেখি গেরুয়াধারী সকলে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। মনে হ'ল – এই দীর্ঘদেহী সুপুরুষ - 'পরম এক'।

— মৃত্যুঞ্জয় চ্যাটার্জী (শিলং, মেঘালয়)।

ব্যাখ্যাঃ সংস্কার উচ্ছেদ হয়ে মানুষের রূপে যে পরম একের প্রকাশ হয় তা ধারনা হ'ল।

পাথরের দেওয়াল

✲ গত (২০-১১-২০১৪) তারিখে পাঠে পড়া হচ্ছিল – "পাথরের দেওয়ালে কী পেরেক মারা যায়?" পাঠক - একথার ব্যাখ্যা করে চলেছেন, তখন আমার দর্শন হ'ল, কে একজন এসে আমার মাথার পিছনের অংশে বড় গজাল রেখে হাতুড়ি দিয়ে পিটিয়ে দিল। গজালটা মাথার ভিতর দিয়ে একেবারে কোমরের নীচ পর্যন্ত ঢুকে গেল। খোঁচা মারা একটা ব্যথা হ'ল। মনে হ'ল আর ব্যথা হবে না। এই শেষ। ....

— শুভাশিষ দাস (বোলপুর)।

ব্যাখ্যাঃ পেরেক মারা – চৈতন্যের অবতরণ। পাথরের উপমা অপ্রযোজ্য। নির্গুণের শক্তিতে সাধারণ মানুষের দেহে চৈতন্যের পূর্ণ ধারণা হবে এযুগে।

✲ গত ১৭ই জানুয়ারী প্রথম আমি স্বপ্নে শ্রীজীবনকৃষ্ণের দর্শন পেলাম। দেখছি – অমরেশ স্যারের বাড়িতে পড়ছি শঙ্খ আর আমি। পড়াচ্ছেন স্বয়ং জীবনকৃষ্ণ। আমি অনেক প্রশ্ন করছি। শঙ্খ চুপ করে আছে। সব প্রশ্ন শুনে জীবনকৃষ্ণ বললেন, তুই আমার লেখা RMS Velocity নামে বইয়ের ৩নং পাতাটা পড়লেই সব প্রশ্নের উত্তর পেয়ে যাবি। .... ঘুম ভাঙল।

- — নরেন দত্ত (ইলামবাজার)।

ব্যাখ্যাঃ RMS Velocity মানে অনুর গতি। আনবিক রূপে থাকা প্রাণচৈতন্যের গতিলাভে ব্যষ্টি চৈতন্যের বিকাশ ও পরিণতিতে বিশ্বব্যাপী চৈতন্যে রূপান্তরের তত্বটি Religion & Realisation বইয়ের ৩নং পাতায় সংক্ষেপে বলা হয়েছে।

তেলে জলে

✲ দুপুরে (১৩-১১-২০১৪) স্বপ্ন দেখছি – একজন লোক তেলে জলে মিশ খাওয়ানোর চেষ্টা করছে কিন্তু পারছে না। ওকে লোকে পাগল বলছে। পরে আর একজন বিশেষ মানুষ এসে বলল, তেলে জলে মিশ খায়, তবে পদ্ধতিটা আলাদা। সকলে মিলে পাত্রটা (বাটিটা) ধরতে হবে। তখন সকলে

একসাথে ঐ বাটিটা ধরল। অমনি তার ভিতরের তেল ও জল মিশে গেল।

— প্রকৃতি ব্যানার্জী (জামবুনি, বোলপুর)।

ব্যাখ্যাঃ তেল - চৈতন্য। জল - সংসার - বিষয়। ঠাকুর বললেন, তোমাদের চৈতন্য হোক। সাধারণ সংসারী মানুষের চৈতন্যময় হওয়া সম্ভব হ'ল না। কারণ ঠাকুরের ছিল ব্যষ্টির সাধন। বিশ্বব্যাপিত্বে – বহুমানুষ তাঁকে অন্তরে দেখলে, তাঁর সাথে এক হলে তাঁর তেজের দ্বারা এই অসম্ভব সম্ভব হয়। ঠাকুরের ক্ষেত্রে বাটিটা ছিল তাঁর কারণশরীর। আর বিশেষ মানুষ জীবনকৃষ্ণের ক্ষেত্রে বাটিটা হ'ল তাঁর মহাকারণশরীর। তাই সকলের ধরা সম্ভব হল।

✻ স্বপ্নে দেখছি (১০-১১-২০১৪) – এক নির্বাচক কমিটি বহু লোকের মধ্যে তিন জনকে নির্বাচন করলেন। তারপর একজন অচেনা ভদ্রলোক তাদের ইঞ্জেকশন দিতে এগিয়ে এলেন। প্রথমে একজনকে ইঞ্জেকসন দিতে শুরু করলেন। আমি পাশে দাঁড়িয়ে দেখছি আর ধীরে ধীরে আমার দেহও শান্ত হয়ে যেতে লাগল। মনে হচ্ছে এই ইঞ্জেকসন্ নিলে মানুষ শান্ত হয়ে যায়। এটি একত্বের ইঞ্জেকসন্। ......

— অরুন ব্যানার্জী (শিমূরালী, নদীয়া)।

ব্যাখ্যাঃ তিনজন - তিন প্রজন্ম - চিরকালীনতার প্রতীক। একত্বের শুভ সূচনা হয়েছে - একত্বলাভ হলে মানুষ শান্ত হয় - শান্তি পায়।

পেট সামলাও

✻ দেখছি (৬-৫-১৫) – একটা নদী সমুদ্রে মিলিত হয়েছে। সমুদ্র থেকে প্রবল জোরে জল ঢুকছে নদীতে – জোয়ারের জল – বড় একটা ঢেউ আসছে। অনেকে দেখছে। নদীর মাঝে জলে দাঁড়িয়ে রয়েছেন বিশাল দেহী জীবনকৃষ্ণ। উনি বুক দিয়ে ঐ ঢেউ আটকে দিলেন ও সমুদ্রের দিকে ঠেলে সরিয়ে দিলেন। তখন দেখি আমিও জলের মধ্যে জীবনকৃষ্ণের পাশে দাঁড়িয়ে আছি। আমি বললাম, ঢেউয়ের সাথে এই খেলাটা বেশ ভাল লাগছে। জীবনকৃষ্ণ

বললেন, ঢেউ আমি সামলাব – তুমি নিজের পেট সামলাও – অনেকটা জল খেয়ে ফেলে পেট কেমন ফুলে উঠেছে দেখ। ওটা ঠিক কর। আমি দেখি সত্যিই তো! পেটটা বেশ ফুলে জয়ঢাক হয়ে গেছে। ... ঘুম ভাঙল।

— ভাগ্যধর মণ্ডল (বোলপুর, বীরভূম)।

ব্যাখ্যাঃ সংসার সমুদ্রের ঢেউ জীবন নদীতে আলোড়ন আনবে – কিন্তু তা সামলাবেন ভগবান। আমাদের কর্তব্য তিনি যে সুযোগ করে দিচ্ছেন তা কাজে লাগানো। নিরুদ্বিগ্ন হয়ে ঈশ্বর চর্চায় সময় দেওয়া – তাহলে বিষয় জল পেট থেকে বের হয়ে যাবে ও সুন্দর জীবনযাপন করা যাবে।

✻ দেখছি (মার্চ, ২০১৫) – একজন দুষ্টু লোক এল। ওকে ঘুষি মেরে আমি ঘায়েল করে দিলাম। ও পড়ে গেল। তখন জীবনকৃষ্ণ এলেন, বললেন, তোকে পরীক্ষা করছিলাম। তুই বাজে জিনিসকে বিনাশ করতে পারিস কিনা দেখছিলাম। পরে বললেন, ঐ বাজে লোকটাও আমি ছিলাম। একথা শুনে চম্‌কে উঠলাম। ....

— প্রার্থিতা ঘোষ (বেলঘরিয়া)।

ব্যাখ্যাঃ আত্মিকে এক তিনিই আছেন — এই সত্য ধারণা করিয়ে দিচ্ছেন দ্রষ্টাকে।

প্রাকৃতিক বেড়া

✻ স্বপ্নে দেখছি – বাবা জঞ্জাল পরিষ্কার করছে। আমাকে একটু সাহায্য করতে বলল। তারপর দেখি বাবা এক প্যাকেট ঘাসের দানা এনেছে। দানাগুলো মাটিতে ফেলে দিল। একদম সবুজ নরম দানা। আমি বললাম, এগুলো কী? বাবা বলল, এগুলো কামিনী গাছের বীজ। পাহাড় থেকে আনা হয়েছে। Natural (প্রাকৃতিক) বেড়া তৈরী হবে, কোন চোর ঢুকতে পারবে না। তখন বাবার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখি উনি স্বয়ং জীবনকৃষ্ণ।.....

— অতনু মাইতি (কাষ্ঠডাঙা)।

ব্যাখ্যাঃ সংসার ভোগের স্থান – শ্রীরামকৃষ্ণ। শ্রীজীবনকৃষ্ণ এই সংসারকেই যোগের অনুকূল করে তুলছেন ঘরে ঘরে বিদ্যার সংসার সৃষ্টি করে, প্রাকৃতিক বেড়া তৈরী করে।

বৌভাত নয়

✻ দেখছি (২৩-১-১৫) – দাদা (জয়) চাকরী পেয়েছে। কোয়ার্টারে আছে। আমি ওর সাথে দেখা করে ফিরে আসার সময় এক জায়গায় দেখি একটা মন্দির। মনে হচ্ছে জীবনকৃষ্ণের মন্দির। ভিতরে ঢুকে দেখি, আরে! এটা তো আমাদের বাড়ী।....

— রজনী দাস বৈরাগ্য (ইলামবাজার)।

ব্যাখ্যাঃ মানুষের দেহঘরই শ্রীজীবনকৃষ্ণের মন্দির।

✻ দেখছি (ফেব্রুয়ারী, ২০১৫) – পাঠের পর আমরা অনেকে একটা হল ঘরে শুয়ে পড়লাম। আমার কাছে হাওড়ার স্বপনদা ছিল। আমি ভাবলাম, ওনার সব শক্তি টেনে নেব। ওনার শক্তি টেনে নেবার পর বুঝলাম ওনার ভক্তির ঐশ্বর্য টেনে নিলেও ওনার ব্রহ্মতেজ টেনে নেওয়া গেল না। ওটা ওনার থেকেই গেল। .....

— অমরেশ চ্যাটার্জী (ইলামবাজার)।

ব্যাখ্যাঃ স্বপনদা - স্বপ্নসিদ্ধ হয়েছেন যিনি। এই স্বপ্নে দেখালো ভক্তের আত্মিক শক্তি সীমিত। তা বিনষ্ট হতে পারে কিন্তু একত্ব লাভ হলে যে ব্রহ্মতেজ জাগে তা স্থায়ী ও অশেষ।

✻ দেখছি (২১-৩-১৫) – অনাদি বাবুর বিয়ে। আমরা ৭/৮ জন গেছি। বাড়ীতে উঁচু জায়গায় বসে এক সন্ন্যাসী পাঠ করছেন। পাঠ শুনতে বসে গেলাম। খাওয়া দাওয়ার কোন আয়োজন নেই। এই বাড়ীতে বৌভাত হয় না। কোন একবার বৌভাতের সময় বৌ-এর দুর্ঘটনা ঘটেছিল। তাই বৌভাত উঠে

গেছে। অনাদি বাবুকে দেখছি না। ..... ঘুম ভাঙল।

— রুদ্রনাথ দত্ত (গড়গড়িয়া)।

ব্যাখ্যাঃ অনাদি বাবু – নির্গুণব্রহ্ম। বিয়ে – মিলন – একত্ব। বৌভাত নয় – ভোগের আয়োজন নয়। শুধু পাঠ – সম্মিলিত অনুশীলন।

মরুভূমি

✻ দেখছি (২-২-১৫) – আরবে বেড়াতে গেছি। মরুভূমিতে আছি। সেখানে মাঝে মাঝে বন্যা হয় হঠাৎ করে। পরে সেই জল আবার বালিতে মিলিয়ে যায়। বন্যার সময় কারও কারও কাছে নৌকা এসে হাজির হয়। বন্যা এসেছে – আমি গামছা পরে চান করছি – পিছনে স্ত্রী, মেয়ে ও দাদা রয়েছে। ওদের গলা পাচ্ছি। একজন প্যান্টশার্ট পরা অজানা লোক বলল, ভাগ্য ভালো হলে এই সময় নৌকা পাওয়া যায়। তুমি নৌকা পেয়েছ? বললাম, আমি দুটো নৌকা পেয়েছি। একটা সরু ও ছোট, অন্যটা বেশ চওড়া ও বড়। বড় নৌকাটা হাত দিয়ে ধরে আছি। দেখতে দেখতে জল টেনে গেল বালিতে। নিজেকে খুব ভাগ্যবান বলে মনে হচ্ছিল। ..... ঘুম ভাঙল।

— সব্যসাচী ঘোষ (চারুপল্লী)।

ব্যাখ্যাঃ সংসার – বিদেশ – যেন মরুভূমি। তবুও ঈশ্বরের কৃপায় (কৃপা বন্যায়) শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীজীবনকৃষ্ণকে ভিতরে দেখায় ব্যষ্টি ও বিশ্বব্যাপীত্বের সাধনতত্ত্ব বোঝার (দুটি নৌকা ধরার) সুযোগ পেলেন দ্রষ্টা। অন্যথায় ধর্মজগতে কোন স্পষ্ট ধারণা লাভ হত না।

✻ দেখছি (১৪-৩-১৫) – চোখের পলকে অনেক দূর থেকে একটা জল জাহাজ উড়ে এসে একটা বাড়ীর ছাদে দাঁড়াল। পরের দৃশ্যে দেখছি – দুই বন্ধু মিলে একটা ঘরে মদ খেয়ে খেলা দেখব বলে তৈরী হচ্ছি।.....

— অভিজিৎ রায় (ইলামবাজার)।

ব্যাখ্যাঃ ব্যষ্টির সাধনে, ডাঙায় ডিঙি চলে – কুণ্ডলিনী দেহফুঁড়ে সহস্রারে

আসে। এখানে জলজাহাজ উড়ে আসছে – সমষ্টি চৈতন্যের বিকাশের কথা বোঝাচ্ছে। তাই দু'জনে মদ খেয়ে খেলা দেখবে – অহংশূন্য হয়ে সম্মিলিতভাবে ঈশ্বরীয় লীলা উপভোগ করবে।

পরিবেশের বাধা

* দেখছি (১২-১-১৫) – পাঠের ক'জনকে নিয়ে গরুর গাড়ীতে করে রামকৃষ্ণ চলেছেন। উনি গাড়ী চালাচ্ছেন। পথে প্রচুর গরু দাঁড়িয়ে। উনি তার মধ্যে দিয়েই গরুগুলোকে সরিয়ে গাড়ী চালিয়ে নিয়ে গেলেন। এক জায়গায় জীবনকৃষ্ণ বসে পাঠ করছিলেন। সেখানে আমরা গিয়ে বসলাম। রামকৃষ্ণ ঠিক জীবনকৃষ্ণের পাশে গিয়ে বসলেন।

— গৌরব দত্ত (গড়গড়িয়া)।

ব্যাখ্যাঃ অবতার পুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণ জগতে প্রথম ভগবান দর্শন করেছিলেন, তিনি মানুষকে এগিয়ে দিলেন চৈতন্যের পরবর্তী ধাপে। তিনি এগিয়ে না দিলে গরুতে পথ আটকে দিত অর্থাৎ আত্মিক অগ্রগতি থমকে যেত সংসার তথা পরিবেশের বাধায়।

* দেখছি (ফেব্রুয়ারী, ২০১৫) – একজন ব্রাহ্মণ বলল, সাধুকে পুজো করতে হয়। আমি এক সাধুর মাথায় হাত দিলাম। ব্রাহ্মণ মন্ত্র পড়তে লাগল। শেষে বলল, এবার সাধুকে প্রণাম কর। আমি "জয় জীবনকৃষ্ণ" – বলে চেঁচিয়ে উঠলাম। অমনি সাধুটা আমার দিকে অবাক হয়ে তাকাল। আমি বললাম, আমি কে জানিস? তারপর শূন্যে উঠে গেলাম ও বিরাট শরীর হয়ে গেল আমার। .... ঘুম ভাঙল।

— রণিত পাল (আড়িয়াদহ)।

ব্যাখ্যাঃ বিরাট শরীর - ব্রহ্ম। অহং ব্রহ্মাস্মি – আত্মিক জগতে কারও চেয়ে ছোট নই – এই উপলব্ধি হ'ল।

শিল্পী পাখী

* দেখছি (৬-৩-১৫) – একটা ঘরে আমরা পাঠের কয়েকজন বসে আছি। একটা বাবুই পাখী আমাদের সবাইকে মুখে করে একটা চিরকুট দিচ্ছে। তাতে লেখা রয়েছে, MRK-168... ঘুম ভাঙল।

— রাজ পাত্র (নিউ আলীপুর, কলকাতা)।

ব্যাখ্যাঃ বাবুইপাখী – শিল্পী পাখী – আত্মা পাখী। ইনি জীবন শিল্পী। জীবন নিয়ে অনবদ্য শিল্পকর্ম করছেন। M- ম - ঈশ্বর। RK - রামকৃষ্ণ। MRK - ভগবান রামকৃষ্ণ। 2015 - 168 = 1847. শ্রীরামকৃষ্ণ জন্মেছিলেন 1836 সালে। ১১ বছর বয়সে অর্থাৎ 1847 সালে জ্যোতিদর্শন করে সমাধি হ'ল তার। অন্য মানুষ হয়ে গেলেন। ঠাকুর রামকৃষ্ণের জন্ম হ'ল। গত ১৬৮ বছর ধরে আয়োজন চলছে, পরিকাঠামো গড়া চলছে – এবার সকলকে আত্মিকে এক করার অনবদ্য শিল্প প্রত্যক্ষ করবে জগৎ।

* স্বপ্নে দেখছি (২-১-১৫) – অসীম জেঠু ফোন করছেন আমাকে। বললেন, ফোনেই আমার ফটো তুলে নে। আমি কথা রেকর্ড করার মত ফোনে একটা অপশন (option)-এ গিয়ে ওনার ছবি তুলে নিলাম। উনি এবার বললেন, আমার ফটো সামনে রেখে ধ্যান করবি, আমার কথা ভাববি প্রতিদিন সকালে। বললাম, বেশ তাই হবে। ..... ঘুম ভাঙল।

— স্নেহময় গাঙ্গুলী, বোলপুর।

ব্যাখ্যা ঃ অসীম অনন্তের যে পরিচয় স্বপ্নে ফুটে উঠছে (নাদ থেকে রূপ ফুটছে) তা নিত্য সকালে অনুধ্যান করতে হবে। প্রতিদিন ঘুম থেকে উঠে বিছানা ছাড়ার আগে বা কাজে যোগ দেবার আগে নিজের বা অন্যের দেবস্বপ্নের মনন করার কথা বলা হয়েছে এই স্বপ্নে।

পথ কী ?

* দেখছি (১৯-১২-১৪) – প্রবীর আমাকে একটা রাস্তা দেখিয়ে

বলছে, এই রাস্তাটা কী বল? আমি বলতে না পারায় প্রবীর বলল, পুরী থেকে লোক এসে বলে দিচ্ছে আর তুমি বলতে পারছ না? ....

ঘুম ভাঙার মুহূর্তে চোখের সামনে ভেসে উঠল "ধর্ম ও অনুভূতি" গ্রন্থের ৩য় ভাগের শেষ পাতার শেষ অংশ যেখানে লেখা রয়েছে – "ওঁ শান্তি, ওঁ শান্তি, ওঁ শান্তি – পুরী।"

— সঞ্জয় চ্যাটার্জী (সখের বাজার)।

ব্যাখ্যাঃ পুরী থেকে আসা লোকেরা এই পথ কি তা জানে। পুরীতে বসেই শ্রীজীবনকৃষ্ণ লিখেছিলেন 'ধর্ম ও অনুভূতির" ৩য় ভাগ। যারা এই ৩য় ভাগ ঠিক মতো পড়েছেন তারা জানেন আত্মিকে সমস্ত প্রশ্নের মীমাংসার একমাত্র পথ হ'ল "একত্ব"।

স্মরণ সভা

✻ দেখছি (১৩-১১-১৪) –এক একটা স্বপ্ন যেন এক একটা পাতা হয়ে উড়তে উড়তে পাশাপাশি এসে জীবনকৃষ্ণের রূপ ফুটিয়ে তুলল। ভীষণ আনন্দ হতে লাগল। পরের দৃশ্যে দেখছি – অমরেশ কাকু, স্নেহময় স্যার ও অনেকে বসে রয়েছেন। আমি স্যারকে স্বপ্নটা বললাম। স্যার প্রথমে বুঝতে পারছিল না। শেষে বুঝতে পেরে বলল, বাঃ, দারুন স্বপ্ন। স্বপ্নের মধ্যে দিয়েই জীবনকৃষ্ণের পরিচয় জানতে হবে।

— শোভন ধীবর (অবিনাশপুর)।

✻ দেখছি (নভেম্বর, ২০১৪) – জ্যোতি বসুর স্মরণ সভা হচ্ছে। একজন স্টেজে উঠে বলছেন, কোন এক সভা চলার সময় উনি জ্যোতি বসুকে একটা ছবি দেখাতে চাইলে জ্যোতিবাবু ওনাকে তীব্র ভর্ৎসনা করেছিলেন। কারণ সভার বিষয় থেকে তার মন অন্যদিকে আকর্ষণ করায় উনি ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। জ্যোতি বসু খুব মন দিয়ে সব শুনতেন। তারপর জিন্নাদা বলতে উঠল। ও বলল, যার সম্বন্ধে বলতে হবে তাকে আগে ভালো করে দেখতে হবে।

যেমন করে প্রেমিক প্রেমিকাকে এবং প্রেমিকা প্রেমিককে দেখে। এরপর একটি ভজন শুরু করল যার সুরে প্রিয় মিলনের আর্তি ফুটে উঠেছে। ভজনটি শুনতে শুনতে ঘুম ভাঙল।

— বরুণ ব্যানার্জী (বোলপুর)।

ব্যাখ্যাঃ জ্যোতি বসু - পরমজ্যোতি প্রাপ্ত হয়েছেন যিনি - ঈশ্বরত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি। তার স্মরণ সভা - তাঁর জীবন থেকে শিক্ষা নিয়ে অনন্যমন হয়ে তাঁর স্মরণ মনন করতে হবে॥

পোপ

✻ দেখছি (৯-১১-১৪) – রোমে গেছি। পোপের সঙ্গে দেখা হ'ল। উনি আমায় ধরে ধরে ভ্যাটিকানে মূল গীর্জার একদম উপরে চারতলায় নিয়ে গেলেন। সেখানে দেওয়ালে কত উদ্ধৃতি লেখা। একটা আবার বাংলায় লেখা। আকৃষ্ট হলাম - পড়লাম – "ঈশাবাস্যম্ ইদং সর্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভূঞ্জিথা, মা গৃধ কস্যচিদ্ ধনম্॥"

খুব আনন্দ হ'ল শ্লোকটা পড়ে। পোপকে প্রণাম করলাম। মাথা তুলে ওনার মুখের দিকে তাকাতেই দেখি উনি জীবনকৃষ্ণ। প্রচণ্ড আনন্দে ঘুম ভাঙল।

— অনুপম চ্যাটার্জী (গড়গড়িয়া, বীরভূম)।

ব্যাখ্যাঃ পোপ – First man of the world - আদি পুরুষ। চারতলায় - তুরীয় অবস্থায়। ঈশাবাস্যম্ ইদং সর্বং = জগতের সবকিছু ঈশ্বরময়। আসক্তি শূন্য হয়ে সেই ঈশ্বরের ঈশ্বরত্ব উপভোগ করতে হবে। প্রণাম করলাম... - অহংশূন্য হলে ঈশ্বরই তার পরিচয় প্রদান করেন।

✻ স্বপ্নে দেখছি (নভেম্বর, ২০১৪)। একটা পাহাড়ের গায়ে একটা শালগ্রাম শিলা কুড়িয়ে পেলাম। খুঁজে দেখছি তাতে বইতে পড়া শালগ্রাম শিলার বৈশিষ্ট্যগুলো আছে কিনা। হঠাৎ দেখি আমার সঙ্গে যারা ছিল (পাঠের লোকজন) তারা সকলে একে একে শালগ্রাম শিলা হয়ে গড়িয়ে পড়ল। অবাক হয়ে দেখছি।.....

— রেণু মুখার্জী (সখের বাজার, বেহালা)।

ব্যাখ্যাঃ শালগ্রাম শিলা নারায়নের বিশ্বরূপের প্রতীক। দেখাচ্ছে – প্রতিটি মানুষই জগতব্যাপ্ত চৈতন্যের ক্ষুদ্র প্রতিরূপ।

স আগত

✲ দেখছি (১২-৫-১৫) — শ্রীজীবনকৃষ্ণ আমার কাছে এসে কাঁদছেন আর বলছেন, আমার সত্তাটা নিয়ে নে না। আমি ভাবছি আমি কী করে তা নেবো? আমি তো পারব না। ওনার কান্না দেখে বিস্মিত হয়ে ওনার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে ঘুম ভাঙল।

— অভিরূপ দাস (গড়গড়িয়া)।

ব্যাখ্যাঃ জীবনকৃষ্ণ তাঁর সত্তা মানুষকে দেবার জন্য, আত্মিকে তাঁর সাথে এক করে নেওয়ার জন্য ব্যাকুল। কিন্তু জগৎ প্রস্তুত নয়। তবে এবার তার প্রস্তুতি শুরু হ'ল।

✲ কালীচরণ স্যারের মেয়ে শ্রুতি বেশ ফর্সা। কিন্তু স্বপ্নে দেখছি (এপিল,২০১৫) – ওর রঙ কালো। আদর করে ওর মাথায় হাত দিয়ে নেড়ে দিলাম। কিন্তু ও কাঁদতে লাগল। মনে হ'ল কালো হয়ে গেছে বলে কাঁদছে।

— মনোজিৎ সাহা (গড়গড়িয়া)।

ব্যাখ্যাঃ কালীচরণ – শিব – এক। তাঁর মেয়ে শ্রুতি – বৈদিক একত্ব (শ্রুতি – বেদ)। মাথায় হাত দিলাম – একত্বের কথা Abstract নয় বোধ হ'ল। কালো বলে কাঁদতে লাগল – অনুশীলনের দ্বারা একত্বের ধারণা পরিস্কার হলে এই কান্না থামবে।

✲ সারারাত্রে ৩বার একই দর্শন হ'ল। দেখছি – স্নেহময়দা ও বিশাখার মাঝে ২৫/২৬ বছরের সুদর্শন এক যুবক বসে আছে। ওকে দেখিয়ে কে যেন বলছে – "এই ! এই সেই শক্তিশালী পুরুষ!" ভিতরটা আলোড়িত হ'ল। ঘুম ভাঙল।

— স্বপ্না সিনহা (সখেরবাজার)।

নবীনা

সিঁদুর দান

✲ স্বপ্নে দেখছি (১২-০৩-১৫) – বোনপো টাবলুর বিয়ের সিঁদুর দান অনুষ্ঠান হচ্ছে। টাবলু ও বুলা বসে আছে। আর স্নেহময়দা ওদের পিছনে দাঁড়িয়ে দুপাশ দিয়ে দু'জনকে ধরে আছে। আমি বললাম, দাদা আপনি আসবেন না বললেন তাও তো এসেছেন। উনি বললেন, এত সুন্দর একটা অনুষ্ঠান, না এসে পারি। তারপর দেখছি – গঙ্গার জল সমুদ্রের জলের মতো ফুলে আছড়ে এসে পড়েছে ঘরে। স্নেহময়দা পাঠ করছেন। বলছেন, ওদের "আমি" খুন হয়েছে, সেই খুনের রক্ত দিয়ে পড়ানো হয়েছে সিঁদুর আর এইটা হ'ল প্রকৃত সিঁদুর দান অনুষ্ঠান। ....

— আলপনা রায় (শিমূরালী, নদীয়া)।

ব্যাখ্যাঃ বিয়ের সময় সিঁদুর দানের প্রথাটির যোগাঙ্গ এই স্বপ্নে জানা গেল।

✲ বিয়ের পর পরই আশ্চর্য এক স্বপ্ন দেখলাম। ১৩ই মার্চ, ২০১৫ -- রাত তখন অনেক। হঠাৎ মনে হ'ল আমার ও স্বামী অতীন্দ্রের মাঝে কেউ একজন শুয়ে আছে। তিনি স্বাভাবিক নন, কারণ পুরুষ ও নারী – এই দুই লিঙ্গের মধ্যে তিনি পড়েন না। তিনি দীর্ঘাকৃতি, টিকালো তার নাক, বড় বড় সুন্দর চোখ – নাকে গোল নথ। আমি হতবাক। আমি যখনই স্বামীকে ডেকে বলছি, আমাকে বাঁচাও, আমাকে বাঁচাচ্ছো না কেন? ঠিক সেই মুহূর্তে আমার মনে হ'ল আমার পাশে শুয়ে থেকেও ও যেন আমার থেকে অনেক দূরে শুয়ে আছে। আমি ওকে ডাকতে পারছি না। আর এটা দেখে ঐ ব্যক্তি আমার দিকে তাকিয়ে হাসতে লাগল। হাসতে হাসতে উপুড় হয়ে মাথাটা নিচু করে নিলেন। তারপর আর তাকে দেখতে পেলাম না। তখনই আমার ঘুমটা ভেঙে গেল।

— বুলা ব্যানার্জী (শিমুরালী, নদীয়া)।

ব্যাখ্যাঃ যিনি সকলের ভিতর আছেন ও ভিতর থেকে (আত্মিক জগতে) মানুষে মানুষে ঐক্য বিধান করেন তিনি নারীও নন, পুরুষও নন। বাইরের প্রয়োজন ভিত্তিক ঐক্য সত্যিকারের ঐক্য নয়, সেখানে যথেষ্ট দূরত্ব থেকে যায়।

✻ দেখছি – পাগলা নামে একটি ছেলে আমাকে দুটো আম দিয়ে গেল। একটু পর চন্দ্রশেখর এল। সঙ্গে ওর বৌ ভগবতী। হাবে ভাবে বোঝালো আম দুটো ওর গাছের। তখন আম দুটো ওকে দিয়ে দিলাম। তখন দেখি হাতে এখনও একটা ছোট আম রয়েছে। মনে হ'ল এটা আমার নিজস্ব। ছুটে বাড়ীর ভিতর গিয়ে "ধর্ম ও অনুভূতি" বইয়ের মলাট খুলে আমটা তার উপর রাখলাম। কী আশ্চর্য বইটা ল্যাপটপ হয়ে গেল। স্ক্রীনে নানা রঙের আলোর সাথে নানা তথ্য সমৃদ্ধ লেখা ফুটে উঠল। বুঝলাম ইন্টারনেট কানেক্সন্ হয়ে গেছে। ....

— পঞ্চানন মণ্ডল (বেহালা)।

ব্যাখ্যাঃ পাগল – পাগলা ঠাকুর রামকৃষ্ণ। দুটি আম দিলেন – দ্বৈতবাদে অমৃত আস্বাদনের কথা বললেন মানুষকে। চন্দ্রশেখর – শিব – জীবনকৃষ্ণ। তাঁর দেহে আম – অমৃতফল – ব্রহ্মত্ব লাভ হয়েছে। তিনি মানুষকে তার ব্রহ্মত্ব দান করেছেন। 'ধর্ম ও অনুভূতি'র প্রেক্ষাপটে নিজের নির্গুণের অনুভূতি মনন করলে উপলব্ধি হয় যে আমিও ব্রহ্ম – অখণ্ড চৈতন্যের সাথে এক (ইন্টারনেটে যোগ আবিষ্কৃত হয়)।

এঁটো ফল

✻ স্বপ্নে দেখছি (মার্চ, ২০১৫) – কয়েকজন বন্ধু বেড়াতে গেছি। একটা নাট মন্দিরে ঢুকেছি। হঠাৎ একটা হাতি তাড়া করল। ছুটে মূল মন্দিরে ঢুকলাম। মন্দিরে কোন ঠাকুরের মূর্তি নেই। কিছুক্ষণ পর একজন ভদ্রলোক এলেন। খালি গায়ে, ধুতি পরে। বললেন, এসো আমি তোমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাব। আমরা ওনার কথায় বিশ্বাস রেখে ওনার সাথে যেতে শুরু করলাম। উনি আমাকে একটা বড় ফল দিলেন। নাম জানি না। বন্ধুদের মধ্যে একজন আমার অপরিচিত ছিল। সে জোর করায় আমি তাকে ফলটা দিয়ে দিলাম।

তখন ঐ ভদ্রলোক আরেকটি ফল একটু খেয়ে এঁটো আমাকে দিলেন। সকলকে উনি এঁটো ফল দিতে লাগলেন। দু'জন পায়নি। আমার থেকে দিলাম একটু। ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করলেন, ফলটার স্বাদ কেমন? অমনি অপরিচিত মেয়েটি, যে গোটা ফল নিয়েছিল সে বলে উঠল রেজিনের (আঁঠার) মত। আমরা অবাক হ'লাম। কেননা আমার তো খুব মিষ্টি লেগেছিল।

— পূজা দাস (বোলপুর)।

ব্যাখ্যাঃ ভগবানকে খুঁজতে বেড়িয়ে শেষে হাতি তথা মন ঈশ্বরের ইচ্ছায় দেহমন্দিরে ঢুকল।অন্তর্মুখী হ'ল।পরে মানুষের রূপে অখণ্ড চৈতন্য দেখা দিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের দেহে প্রথম ভগবান দর্শন হয় –তারই ফল স্বরূপ আমরা পেলাম শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত (গোটাফল)। শ্রীজীবনকৃষ্ণ নিজের অনুভূতির আলোকে কিভাবে কথামৃতরূপ ফলকে আস্বাদন করতে হবে তা জগৎকে জানালেন – দিলেন কথামৃতের দেহতত্ত্বে ব্যাখ্যা সমৃদ্ধ গ্রন্থ "ধর্ম ও অনুভূতি" এটি তাঁর দেওয়া এঁটো ফল। এইভাবে দেহতত্ত্বে ব্যাখ্যা করে পড়লে কথামৃতের অমৃত আস্বাদ পাওয়া যাবে – নতুবা মিলবে আঁঠার স্বাদ। সংস্কারের আঁঠা। ঠাকুর বলছেন - - "বিধিবাদীয় বলিতে দোষ নাই। যেমন — অষ্টমীতে একটি পাঁঠা" — "আমি কেশবের জন্য ডাব চিনি মেনেছিলাম" –ইত্যাদি। এসব কথা পড়ে সঠিক অর্থ করতে না পেরে মানুষ সংস্কারকেই আঁকড়ে ধরবে।

✻ স্বপ্নে দেখছি (১১-৩-১৫) – রামানন্দ নামে একজন ভদ্রলোককে বলছি – কথামৃত পড়লে শান্তি ও আনন্দ পাবেন মনে। তারপর ব্যাগ থেকে একটা "ধর্ম ও অনুভূতি" বের করে ওর হাতে দিয়ে বলছি, এটা দিয়েই শুরু করুন। তারপর অন্য আরও বই পড়বেন।

— স্বস্তিকা চ্যাটার্জী (চারুপল্লী)।

ব্যাখ্যাঃ কথামৃত - সংস্কারের আঁঠা বর্জিত ও দেহতত্ত্বের ব্যাখ্যা সমৃদ্ধ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত হ'ল "ধর্ম ও অনুভূতি" গ্রন্থ (বিশেষত ১ম ও ২য় খণ্ড)। অন্য আরও বই পরে পড়বেন – ইংরাজী "রিলিজিয়ন অ্যাণ্ড রিয়েলাইজেশন" এবং জীবনকৃষ্ণের ঘরের পাঠ ও আলোচনা সমৃদ্ধ বিভিন্ন দিনলিপি সমূহ।

তল্পিবাহক

✽ দেখছি (৬-৪-২০১৫) – ভুবনেশ্বরে স্নেহময়দা পাঠ করতে গেছেন। ওনার সাথে বেশ কিছু লোক গেছেন। আমিও গেছি। ওখান থেকে ফেরার পথে আমরা সবাই বাসে করে বোলপুর গেলাম। বোলপুর ঘুরে আবার কলকাতায় অর্থাৎ বাড়িতে ফিরে আসছি। আমাদের মধ্যে একটি ছেলে ছিল যে ভুবনেশ্বরের জয় নামে এক ভদ্রলোকের সন্তান। উনিও আমাদের পাঠের লোক। ছেলেটিকে বলছি – তোমার ব্যাগ (জামা কাপড় রাখার) কোথায়? ও বলল, আমি খুব ক্লান্ত, তাই ওকে বইতে দিয়েছি – বলে বাসের মধ্যে একটা কুকুরকে দেখিয়ে দিল। দেখি কুকুরটা মুখে করে ধরে আছে ওর ব্যাগটা।

পরের দৃশ্যে বাবার সাথে কথা বলছি।যদিও বাবা ঠিক দেখতে বাবার মত নয়। আমি তখন feel (অনুভব) করতে পারছি One is all. বাবা বললেন, তুমি যেটা বুঝেছ সেটা আরও সবাই বুঝবে খুব তাড়াতাড়ি। সেটা শুরু হয়ে গেছে। তখন দেখবে পৃথিবীটা কত সুন্দর।

— মিথুন বসু (টালিগঞ্জ, কলকাতা)।

ব্যাখ্যাঃ ভুবনেশ্বর – বিশ্বমানবের চর্চা হয় যেখানে। জয় – Absolute One – অখণ্ডচৈতন্যের মূর্ত রূপ। জয়ের ছেলে – একত্ব (Oneness)। বোলপুর - - একত্বের ঘর – যেখানে অহং নাশ হয়ে একত্ব লাভ হয়। কলকাতায় ফিরছি – দেহে মন ফিরে আসছে – সম্বিৎ ফিরে আসছে। জয়ের ছেলে ক্লান্ত – বিজ্ঞানীর এলানো ভাব – ওর ক্রিয়া চলবে স্বতঃস্ফূর্তভাবে। কুকুর ব্যাগ বইছে – ধর্ম তাকে অনুসরণ করবে – তল্পিবাহক। একত্ব যেভাবে বিকশিত হবে সেটিই হবে ধর্মের প্রকৃত পরিচয়। One is all – আত্মিকে একজনই আছেন, তিনিই বহু হয়েছেন।

✽ দেখছি (১-২-২০১৫) – কে যেন বলল, আমার নাকি ১২ কোটি ৩৭৬ টাকা আছে ব্যাঙ্কে। ব্যাঙ্কে গেলাম। ওরা জানালো এখন তোলা যাবে না। আমার নামে টাকা আছে কিন্তু Transaction হয় না বলে ঐ টাকা তোলা

যাবে না। Transaction চালু করার জন্য আপাতত কিছু কিছু করে টাকা জমা করতে হবে। ফিরে আসছি – একজন লোকের সাথে দেখা – সে আমাকে ৩ আনা দিল। বলল, এটা ব্যাঙ্কে জমা রাখ। মনে হচ্ছে ওর নাম "জীববৃত"। ব্যাঙ্কে গিয়ে ৩ আনা জমা দিলাম আমার অ্যাকাউন্টে। ফেরার পথে জীবনকৃষ্ণের সঙ্গে দেখা হ'ল। উনি সব শুনে বললেন, খুব ভাল হয়েছে। এই যে ৩ আনা জমা দিলি, ভবিষ্যতে খুব কাজে দেবে। আমি ভাবছি, বাবা! তিন আনা পয়সার এত গুরুত্ব! ..... ঘুম ভাঙল।

—রাজ পাত্র (নিউআলিপুর, কলকাতা)।

ব্যাখ্যাঃ জীববৃত – যে জীবকে ঈশ্বর বরণ করেছেন তাঁর লীলা দেখাবেন বলে – সম্প্রসাদ। তিন আনা – দাস্য, সখ্য ও মধুরভাবের দর্শন। ঈশ্বর কর্তৃক নির্বাচিত মানুষদের দর্শন অনুভূতি শুনে তা মাথায় (ব্যাঙ্কে) রাখলে একসময় "একত্ব লাভ হবে ও নিজের ভিতর নির্গুণের অনন্ত শক্তির প্রকাশ হবে (Transaction চালু হবে)। শ্রীজীবনকৃষ্ণ এইসকল দর্শনের গুরুত্ব ও অনুশীলন পদ্ধতি (দেহতত্ত্বে ব্যাখ্যা) জানিয়েছেন মানুষকে।

ধনী শ্রেষ্ঠ

(১) গত ১৯-১২-২০১৪ এ আমার আংটি আঙুল থেকে খুলে পড়ে গেছে। স্বপ্ন দেখছি – আংটিটা ফিরে পেয়েছি। দিদিকে জিজ্ঞাসা করলাম, তুমি খুঁজে দিলে আংটিটা? দিদি বলল, ভগবান তোমাকে দিয়েছে। কয়েকজন বলল, ওটা সোনার বটে তো? আমি আঙুল থেকে খুলে ভাল করে দেখে বললাম, হ্যাঁ, এটা আগের সোনার আংটিটাই। তারপর দেখি ওটা অস্বাভাবিক মোটা হয়ে গেল। যেন বাঁশের মত মোটা। খুব আশ্চর্য হলাম। ঘুম ভাঙল।

ব্যাখ্যাঃ আংটি – ভালোবাসার স্মারক। দ্রষ্টার জীবনে ঈশ্বর প্রেম অন্য মাত্রা পাবে।

(২) ৮-৩-২০১৫ তে আর একটি অদ্ভুত স্বপ্ন দেখলাম। একজন ধনী ব্যক্তি। তার বাড়ীতে ভাড়া নিয়ে একটা ব্যাঙ্ক চলছে। সেই ব্যাঙ্কের অধিকাংশই তারই গচ্ছিত টাকা। সেই ব্যক্তি ও আমি দু'জনে কথা বলতে বলতে একসাথে দরজা দিয়ে ঐ ঘরে ঢুকে পড়লাম। ও একদিক দিয়ে আর আমি অন্য দিক দিয়ে (ডানদিকে) গেলাম। দেখি সকলে আমাকে স্যালুট করছে। ভাবছে আমিই ঐ ধনী ব্যক্তি। আমরা দু'জন দেখতে যেন একই রকম। ও টাকা তুলতে গেল ব্যাঙ্কে। দুষ্কৃতীরা নাকি টাকা চেয়েছে, জোর করছে। টাকা তোলার পর দু'জনে আবার দেখা হ'ল। দুই বাক্সভর্তি টাকা। দু'জনে দুটি বাক্স ধরলাম। আমি বললাম, ওদের টাকা দিতে হবে না, ম্যানেজারকে বলি পুলিশকে খবর দিতে। তাই করা হ'ল। মনে মনে ভাবছি, ওর তো নিরাপত্তা রক্ষী আছে, আমার তো কিছু নেই। অথচ আমাকে ঐ ব্যক্তি ভেবে দুষ্কৃতীরা মারবে না তো! জানলা দিয়ে দেখি পুলিশের গাড়ী আসছে। নিশ্চিন্ত হয়ে দু'জনে গল্প করতে লাগলাম। বললাম, দেখ আমাদেরকে তো লোকে যমজ বলে, কিন্তু আমার তো মনে হয় দুজনের মুখে অনেক অমিল আছে। যেমন তোমার মুখটা একটু লম্বা। আর আমার মত চুলও ওঠে নি। ও বলল, মায়ের কথা মত ছোট থেকে আমের আঁটি ঘষেছি মাথায়। তাই চুল ওঠেনি। আমি বললাম, আরে! আমের আঁটি ঘষলে যে চুল ওঠে না তা তো জানি না। স্বপ্ন ভেঙে গেল।

পরের দৃশ্যে দেখছি – ঐ স্বপ্নটা পাঠে বলছি। ......

— জয়কৃষ্ণ চ্যাটার্জী (জামবুনি, বোলপুর)।

ব্যাখ্যাঃ ধনী ব্যক্তি – ভগবান – মানবব্রহ্ম।

লোকে ভাবছে দু'জনে এক – আত্মিকে এক। একই চৈতন্য দ্রষ্টার দেহখোলে লীলা করছে।

আমের আঁটি ঘষেছেন – সচ্চিদানন্দ গুরুলাভে তাকে নিয়ে মগ্ন থেকেছেন ব্যষ্টির সাধনে। যোগৈশ্বর্য জেগেছে। তা তো জানি না – দ্রষ্টার ব্যষ্টির সাধন হয় নি। তাই মা অর্থাৎ দেহ সেকথা জানায় নি। চুল কম – দ্রষ্টার বাইরে যোগৈশ্বর্য তত দেখা যাচ্ছে না। তবে জীবনকৃষ্ণের সত্তা লাভে তিনিও আত্মিকে ধনীশ্রেষ্ঠ।

আপন ঘর

স্বপ্নে দেখছি (মানিক্য, ৯৫ সংখ্যা) – শূন্যে Zenith লেখা। আমি সেখান থেকে নিচে পড়ে যাচ্ছি। এক জায়গায় এসে দেখলাম নীচে ত্রিপল বিছানো। আমি কাছাকাছি আসার সঙ্গে সঙ্গে ত্রিপলটা দু'ফাঁক হয়ে গেল। আমি তার মধ্যে দিয়ে নিচে একটা মাটির বাড়ীর উঠোনে পড়লাম। একজন অপরিচিত লোক আমাকে ধরে ফেলল, এবং বলল, লাগেনি তো? আমি বলাম, না, না, ঠিক আছে।

স্বপ্নের মধ্যে জীবনকৃষ্ণকে উপরের স্বপ্নটা বলায় তিনি তিন বার বললেন, খুব ভাল জিনিস দেখেছিস! তারপর একটি লোক তাঁর ঘরে এল। তিনি তাকে দেখে খুব আনন্দিত হলেন এবং বললেন, যত ভাল ভাল খাবার আছে কিনে আন। আমার মনে হ'ল খাবারগুলি এই লোকের পয়সায় আনা হবে। ভাবছি, জীবনকৃষ্ণ তো কারুর পয়সায় খান না, তবে এর পয়সায় কী করে খাবেন! তিনি সঙ্গে সঙ্গে আমায় বললেন, ওর সঙ্গে আমার দেওয়া নেওয়া চলে। এমন সময় একজন বৃদ্ধলোক – রং খুব ফরসা, বড় গোঁফ আছে, গায়ে পাঞ্জাবী, সেই ঘর থেকে চলে যেতে যেতে বললেন, আমি চলে যাচ্ছি। তাঁর কথার উত্তরে জীবনকৃষ্ণ কিছু বললেন না। আমি ঘরের বাইরে এসে দেখলাম, সেই নতুন লোকটি বাথরুমে দরজা বন্ধ করে স্নান করছে। বন্ধ দরজার ফাঁক দিয়ে আলো বাইরে এসে পড়ছে। তারপর একটা ঘরে এসে ঢুকলাম। সেই ঘরটা যেন আমার নিজের ঘর। ঘরটি গোল, মধ্যে বিরাট খাটপাতা। ঘরের সিঁড়ি রাস্তা পর্যন্ত বিস্তৃত। আমি মনে মনে ভাবছি – আমার সঙ্গে যারা দেখা করতে আসবে – রাস্তা থেকে বেশ সোজা আমার কাছে চলে আসতে পারবে, ভালই হয়েছে।......

— সুশীল মিত্র (শ্রীজীবনকৃষ্ণের সঙ্গকারী)।

ব্যাখ্যাঃ Zenith – শীর্ষবিন্দু – নির্গুণ। ত্রিপলের নিচের এলাকা – সগুণের এলাকা। মাটির বাড়ি – স্থূল দেহ। নির্গুণ থেকে সগুণে এসে, পরে স্থূলদেহ ধারণ হয়। এই সত্য (নির্গুন স্বরূপকে) জানতে হবে।

এর জন্য জীবনকৃষ্ণের সমপর্যায়ের নতুন লোকের আবির্ভাব ঘটবে। তিনি জীবনকৃষ্ণকে খাওয়াতে পারবেন (শুনিয়ে ও লিখে খাওয়াতে)। যেমন জীবনকৃষ্ণ "ধর্ম ও অনুভূতি" লিখে শ্রীরামকৃষ্ণকে খাইয়েছেন। স্নান করতে শুরু করলে – অর্থাৎ তার ক্রিয়া শুরু হলে – মানুষ নিজের ঘর খুঁজে পাবে। জানবে সে বাবু – ঈশ্বর। একজন বৃদ্ধ উঠে চলে গেল – পুরোন ধ্যান ধারণা দূরে গেল।

✱ দেখছি (১৬-৫-২০১৫) – ঘরে বসে আছি। হঠাৎ একটা শুয়োর এসে আমার বুকের দুধ খেতে শুরু করল। কামড়াচ্ছে না। ওকে কিছুতেই তাড়াতে পারছি না। পুতনার মত আমার সমস্ত দুধ নিঃশেষে টেনে খেলে যেন এর শান্তি হবে। ওকে তাড়ানোর জন্য স্মরণ নামে একটি ছেলেকে ডাকছি। ... ঘুম ভাঙল।

— জয়াবতী বারিক (সুলতানপুর)।

ব্যাখ্যাঃ অবতারতত্ত্বের ভক্তিরস আস্বাদন ও তা দানের পর্ব শেষ – এবার সাধারণ মানুষেরও ঈশ্বরত্ব লাভ হবে। তাই ভক্তিরস (দুধ) সব টেনে খেয়ে নিচ্ছেন।

পাঠ প্রসঙ্গ

পাঠ ও আলোচনা প্রসঙ্গে যেসব নতুন কথা উঠে আসে তারই কিছু নমুনা এখানে উল্লেখ করা হ'ল।

১। আদ্যাশক্তি সহায়ে অবতার লীলা। অবতার লীলা শেষ হয়ে নিত্যলীলা যোগের সূচনায় শ্রীজীবনকষ্ণ দেখলেন, তিনি সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠছেন, আর উপর থেকে মাঠাকরুন সিঁড়ি বেয়ে নামছেন। উনি পাশ কাটিয়ে উপরে উঠে গেলেন। সেখানে অন্ধকার আর তার মধ্যে মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ রেখা দর্শন হচ্ছে।

মাঠাকরুন অর্থাৎ আদ্যাশক্তির ভূমিকা ক্রম হ্রাসমান আর উনি পরবর্তীধাপে উত্তীর্ণ হচ্ছেন, অবতার লীলা ছাড়িয়ে যাচ্ছেন। অন্ধকারে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে অর্থাৎ সেটি নির্গুণের তথা নিত্যের এলাকা।

২। কালীর জিভ বাইরে বেরিয়ে কেন?
কালীর জিভ বাইরে বের করা, দাঁত দিয়ে চেপে ধরা। কারন তাঁর থেকে যে ধ্বনি আসে তা অনাহত ধ্বনি (তালুর সঙ্গে জিভের সংঘাত ছাড়াই উদ্ভূত ধ্বনি)। কারণ কালীই বাক্‌দেবী। দৈববানী যা হয়, ঈশ্বরীয় বাণী দেহাভ্যন্তরে যা শুনি, তা আসে কালী অর্থাৎ নির্গুণ ব্রহ্ম থেকে। তাই কালীপূজা ও দুর্গাপূজার মন্ত্রে "কং নম, খং নম, গং নম, ঘং নম" – ইত্যাদি প্রতিটি বর্ণকে শ্রদ্ধায় বরণ করার কথা বলা হয়েছে।

৩। "নিচু জায়গায় বৃষ্টির জল জমে" – শ্রীরামকৃষ্ণ।

ব্যষ্টিতে – কুণ্ডলিনী জাগ্রত হলে বারবার তা সহস্রারে ওঠে, নৃত্য করে নিচু জায়গা তৈরী করে (Depressed area) ও সেখানে আত্মা সংকলিত হয়। তিনিই যথার্থ কৃপাবারি লাভ করেছেন যিনি এই আত্মা সাক্ষাৎকার করেছেন।

সমষ্টিতে – সমষ্টি চৈতন্যের মূর্তরূপ যিনি – তিনিই একমাত্র নীচু জায়গা – তিনি যেন সমুদ্র, বাকীরা সেই সমুদ্রের ঢেউ। ঢেউ উঁচুতে থাকে সমুদ্র নীচে। একজনেরই অহং যায় – বাকীদের কম বেশি অহং থাকেই, যায় না।

উপায় নীচু জায়গা অর্থাৎ ঐ সমুদ্রের দিকে নজর রাখা – অখণ্ড চৈতন্যের মহিমার স্মরণ মনন। আমি সমুদ্রেরই ঢেউ – আমার পৃথক অস্তিত্ব নেই – এই বোধ দৃঢ় হলে অহং নিষ্ক্রিয় হয়ে যায় – সাধারণ মানুষও ষোল আনা কৃপা অনুভব করে।

৪। মহামায়ার শক্তি।

শ্রীরামকৃষ্ণ যখন শুনলেন হৃদয়বাবু যে এঁড়ে বাছুরটাকে এনেছে তাকে বড় করে একদিন সিহোড়ে নিয়ে গিয়ে বলদ হিসাবে চাষের কাজে লাগাবে, উনি মুর্চ্ছা গেলেন। অনেকক্ষণ পর জ্ঞান ফিরেছিল। বললেন, মায়ার কী শক্তি। কবে ঐ বাছুর বড় হবে, তারপর দক্ষিণেশ্বর থেকে সুদূর সিহোড়ে নিয়ে গিয়ে চাষের কাজে লাগবে। পাশে স্বয়ং অবতার পুরুষ রয়েছেন তবুও মন রয়েছে সুদূর সিহোড়ে – বিষয়কর্মে লিপ্ত। মহামায়ার কী শক্তি!

৫। ঋষিরা ছিলেন মন্ত্রদ্রষ্টা।

সে যুগে "স্বেনরূপেন অভিনিষ্পদ্যতে" যদি কারও হ'ত তাহলে সে ঋষির নাম পাওয়া যেত। এমন কোন ঋষির উল্লেখ নেই যার চিন্ময় রূপ সর্বশ্রেণীর অসংখ্য মানুষ ভেতরে দেখতে পেত। তাই এসব উপলব্ধির কথা নয় – এ সব মন্ত্র তারা দর্শন করেছিলেন মাত্র। এযুগে সপ্তর্ষি মণ্ডলের ঋষি স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, ঈশ্বর টীশ্বর কিছু দেখলাম না – তবে অনেক মন্ত্র জ্বল্ জ্বল্ করছে দেখেছি। এতদিন পর সেই সব্ বৈদিক মন্ত্র বাস্তবে রূপ পেল। আমরা যারা শ্রীজীবনকৃষ্ণকে, বিশ্বমানবকে অন্তরে দর্শন করছি তারা সত্যদ্রষ্টা। বেদ বলছে - - একং সৎ – সেই এক চৈতন্য মূর্ত হয়ে ঐ রূপ ধারণ করেছে।

আমাদের মন্ত্র তাঁর নাম – তাঁকে নিয়ে নানান দর্শনে বৈদিক মন্ত্রগুলি অর্থবহ ও জীবন্ত হয়ে উঠছে আমাদের জীবনে – তাই তাঁরই নাম বলব নানাভাবে, দর্শন-অনুভূতিকে ভিত্তি করে – শোধ হবে আমাদের ঋষিঋণ।

৬। শ্রীজীবনকৃষ্ণ আলোচনা প্রসঙ্গে একদিন বললেন, "I am the Protoplast". Protoplast মানে "First Formed" – আদি পুরুষ। এটি গ্রীক শব্দ। কোষের নিউক্লীয়াস (Nucleous) ও অন্যান্য উপাদান গঠন হয়ে গেছে, কিন্তু কোষ প্রাচীর (cell wall) তখনও তৈরী হয়নি – এই অবস্থাকে

বলে Protoplast.

ছত্রাকের (Fungus) Spore cell অর্থাৎ Reproductive Unit প্রতিকূল পরিবেশে cell wall শক্ত করে। পরে অনুকূল পরিবেশ হ'লে ঐ cell wall নষ্ট করে দেয়, এবং ভিতরের বস্তু বহুখণ্ডে বিভক্ত হয় – প্রতিখণ্ড থেকে fungus জন্মায় – অর্থাৎ একটি fungus জনন কোষ তখন fungus এর বহু সংখ্যক বীজ হিসাবে কাজ করে।

শ্রীজীবনকৃষ্ণ আদিপুরুষ – নির্গুণ ব্রহ্মের মূর্তরূপ। বেদ বলছে – একং বীজং বহুধা যঃ করোতি। শ্রীজীবনকৃষ্ণের দেহে ব্রহ্মবীজ বিকশিত হয়েছে – ব্রহ্মবিদ্যা লাভ হয়েছে। আবার তার চিন্ময় রূপ যা অসংখ্য মানুষের অন্তরে ফুটে উঠছে তাও ব্রহ্মবীজ স্বরূপ – দ্রষ্টাদের দেহে ব্রহ্মবিদ্যার প্রকাশ ঘটাচ্ছে।

৭। কুড়িয়ে পাওয়া মানিক।

মূল্যবান উপদেশ বা জ্ঞানের কথাকে আমরা অমূল্য রত্নরাশি বলি। সব দেশে ছড়িয়ে থাকা এইসব মানিক কুড়িয়ে নিলে, অন্তরে ধারণ করলে মানুষের মঙ্গল হয় বলে জানি। জীবনকৃষ্ণ বলছেন – জ্ঞানের কথাগুলি নয় – জ্ঞানীই মানিক – তাকে কুড়িয়ে পেলে – অর্থাৎ আপনা হতে ভিতরে তাঁকে দর্শন করলে তবে তার বাণীগুলি ধারণা করা সম্ভব হয় ও মানুষের মঙ্গল হয়। তাই তিনি লেখক হিসাবে নিজের নাম দিলেন 'কুড়িয়ে পাওয়া মানিক'।

এই মানিক শ্রীজীবনকৃষ্ণকে অন্তরে দর্শন করলে তার অমূল্য বাণীগুলির যথাযথ গুরুত্ব অনুধাবন করা যায়।

৮। মনের বাস ষষ্ঠভূমিতে কিন্তু দৃষ্টি লিঙ্গ গুহ্য নাভিতে।

ষষ্ঠভূমিতে মন গিয়ে ইষ্ট মূর্তি ও নানাবিধ দর্শন অনুভূতি লাভ হলেও মন ওঠানামা করে। ঠাকুরের মন ষষ্ঠ ও পঞ্চম ভূমির মধ্যে বাচ খেলাতো। কখনও বা চতুর্থ ভূমিতেও মন নেমে আসত। নিজের সাথে তুলনা করে বুঝেছেন তাহলে সাধারণ মানুষের কী হয়। তাদের মন তো আরও নিচে লিঙ্গ গুহ্য নাভিতেই থাকবে, মুখে ঈশ্বরীয় কথা বললেও। মন সপ্তমভূমিতে প্রবেশ করলে ও ভগবান দর্শন হলে সর্বক্ষণের জন্য ঊর্ধ্বদৃষ্টি লাভ হয়। বিষয়াসক্তি থাকে না।

দ্বিতীয় স্তরে সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে সপ্তমভূমির অনুভূতি হলেও, মনের ওঠানামা চলতেই থাকে। তবে বিষয়াসক্তির তীব্রতা যথেষ্ট কমে যায় যদি তূরীয় অবস্থায় অনুভূতি হয় তথা আত্মিক একত্ব লাভ হয় ও নিরন্তর অনুশীলনের মধ্যে থাকেন দ্রষ্টা।

৯। আংশিক চিত্তশুদ্ধি।

ধর্ম ও অনুভূতিতে আংশিক চিত্তশুদ্ধির উদাহরণ হিসাবে বলা হয়েছে ঠাকুর শ্রাদ্ধান্ন খেতে বারণ করেছেন শুনেও একজন ব্যক্তি শ্রাদ্ধের ভোজ খেয়েছিল। রাত্রে স্বপ্নে দেখল, ঐ স্থানে ভোজ খাচ্ছেন। উনি মাছ খান না। কিন্তু যা খাচ্ছেন তাতেই মাছের আস্বাদ পাচ্ছেন। তাই থু থু করে মুখের খাবার ফেলে দিচ্ছেন।

এখানে মাছ মানে আত্মা নয় – মাছ মানে দেহজ্ঞান। শ্রাদ্ধান্ন খেলে দেহজ্ঞান বাড়ে। চিত্তশুদ্ধি হওয়ায় দেহ ও জিনিস ত্যাগ (Reject) করছে। কিন্তু আংশিক চিত্তশুদ্ধি কেন? পূর্ণ চিত্তশুদ্ধি হলে ঠাকুরের বারণ আছে শুনলেই ধারণা হয়ে যেত এবং তিনি শ্রাদ্ধান্ন আদপেই খেতে যেতেন না।

১০। ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে চারযুগের যোগসম্মত ব্যাখ্যা।

কলিযুগ – আত্মিক স্ফুরণ যখন হয়নি – দেহজ্ঞান প্রবল – ঈশ্বরবিমুখ – তার জীবনে কলিযুগ – সে ভোগে আছে।

দ্বাপর – সদ্গুরু লাভে ও ইষ্টমূর্তি দর্শনে ঈশ্বরে বিশ্বাস জন্মে – পরে নিগমের সাধনে পাকাভক্তি লাভ হলে মানুষটা দ্বাপর যুগে প্রবেশ করে।

ত্রেতা – ব্যষ্টির ব্রহ্মজ্ঞান লাভ – নির্গুণ নিরাকার ব্রহ্মের ধারণা লাভ হয় যখন। রাম — এক। এক তিনিই আছেন এই বোধ – অভয়পদ লাভ। এই অবস্থায় মানুষ ত্রেতা যুগে প্রবেশ করে।

সত্য যুগ – ঠাকুর বললেন, আমি সবাইকে রাম দেখছি – তারা নিজেরাও যখন এই সত্য উপলব্ধি করবে – সমষ্টির সাধনে সত্যের পূর্ণ পরিচয় লাভ হবে – মানুষ সত্যযুগে প্রবেশ করবে। সেখানে ব্যক্তিমানুষের প্রাধান্য (Supremacy) থাকে না – তাই অবতার দরকার নেই।

১১। 'ভক্তি হিমে জল জমে বরফ হয়।' – শ্রীরামকৃষ্ণ।

ঠাকুর সংস্কারজ মূর্তি দর্শনের কথা বলছেন। কিন্তু একজন জীবন্ত মানুষকে অসংখ্য মানুষ যখন চিন্ময়রূপে দেখে তখন তা স্ফটিক সাকার রূপ। তা সর্বজনীন, কোন জনগোষ্ঠীর দেব বা দেবী নয়। ইলামবাজারের নরেন দত্তের সাম্প্রতিক দেখা একটি স্বপ্ন নিম্নরূপ। তিনি দেখছেন - একটি পা – স্বচ্ছ। তলদেশ থেকে দেখছেন পায়ের ভিতর একটা সাপ ঘোরা ফেরা করছে।.....

সাপ – ক্রিয়াশীল চৈতন্য। স্ফটিক সাকারকে পেলে – পরমপদ লাভ হলে – উপলব্ধি হয় নিরাকার নির্গুণ ব্রহ্মও ক্রিয়াশীল।

১২। 'অহং ব্রহ্মাস্মি' — বেদ।

নিজের স্বরূপ জানলে মানুষটা বুঝবে যে সে ব্রহ্ম – সে আত্মিকে রাজা। তার ইন্দ্রিয় সকল দাস ও মায়া দাসী। আর সে অফুরন্ত আত্মিক ঐশ্বর্য উপভোগ করে তার দর্শনে ও অপর অনেকের দর্শনে, কিন্তু ব্যবহারিক জগতে যে রাজা তার সঙ্গে এর পার্থক্য আছে। ব্যবহারিক জগতে যে রাজা সে ইন্দ্রিয়াদি সম্বন্ধে জগৎকে ভোগ করার বিষয়ে সর্বপ্রধান। অপরপক্ষে, অধ্যাত্মবিদের ব্যবহারিক জীবন অতিসাধারণ ও তিনি নির্লিপ্ততার প্রতিমূর্তি হন।

তাই জীবনকৃষ্ণ বলতেন আত্মিক জীবন ও ব্যবহারিক জীবন সম্পূর্ণ আলাদা। যদিও উন্নত আত্মিক জীবন মানুষটিকে ব্যবহারিক জীবনে সৎ ও ধীর হতে সাহায্য করে।

১৩। "গাছে না উঠতেই এক কাঁদি।" (ধর্ম ও অনুভূতি – ৩য় ভাগ - - ব্যাখ্যা নং ৬৮৮)

ব্যষ্টিতে – গাছ – দেহ। গাছে ওঠা – ষষ্ঠভূমি পার হওয়া। কাঁদি – ডাব – চেতন সমাধি।

সমষ্টিতে – গাছ – মনুষ্য জগৎ। কাঁদি – বহুত্বে একত্ব।

এই প্রসঙ্গে দুইজনের স্বপ্ন উল্লেখ করা হল –

পঞ্চানন মণ্ডলের স্বপ্ন – নারকেল গাছে ওঠার পর টিফিন কৌটা গেল পড়ে, আর ঢাকনা খুলে দুদিকে পড়ল। অনেক কাঁদি ডাব পারলাম – সকলকে বিলি করছি – সবাই পাবার পরও অনেক থাকল – দেবার লোক নেই। ....

এখানে নারকেল গাছ – দেহ। গাছে ওঠা – নির্গুণে লয় হওয়া ও

আত্মিক একত্বের বোধ নিয়ে নামা। টিফিন কৌটা পড়ে যাওয়া – ব্যষ্টির সাধন মূল্যহীন হয়ে যাওয়া। অনেক কাঁদি – বিভিন্ন পর্যায়ে অসংখ্য অনুভূতির মাধ্যমে একত্বের জ্ঞান লাভ। সকলকে দেবার পরও থেকে গেল – এ যে অশেষ, অনন্ত। অনুভূতির কথা বলে শেষ করা যায় না।

দেবরঞ্জন চ্যাটার্জীর স্বপ্ন – অনেক নারকেল গাছ। গাছগুলো নুইয়ে রয়েছে। নাগালের মধ্যেই রয়েছে ডাবগুলো। দেখে অবাক হলাম। ভাবছি এখানে তো গাছে না উঠেই কাঁদি পাওয়া যাবে।

এখানে গাছে ওঠারও দরকার হচ্ছে না। বহুত্বে একত্বের জ্ঞান মানুষের কাছে সহজলভ্য হচ্ছে আপনা হতে এযুগে। অনেকগুলো গাছ অর্থাৎ বহু মানুষের দর্শন-অনুভূতি শুনে এই জ্ঞান হয়।

১৪। শ্রীরামকৃষ্ণের সব কথা বহু অর্থবহ – একথা ঠিক নয়। তাতে বহু অর্থ দান করেছেন শ্রীজীবনকৃষ্ণ। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় —

ক) শ্রীমকে ঠাকুর বললেন, সেখানে যেও (বলরাম বসুর বাড়ী)। শ্রীম বললেন, আজ্ঞে বড় মানুষের বাড়ি। ঠাকুর – 'তাতে কী হয়েছে। তুমি আমার নাম করবে। কেউ তোমায় আমার কাছে পৌঁছে দেবে।'

একথার একটাই অর্থ। বলরাম বসুর ঘরে রামকৃষ্ণদেব অত্যন্ত শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি – ঐ ঘরে গিয়ে কেউ তার সঙ্গে দেখা করতে চাইলে যে কেউ তাকে ঠাকুরের কাছে পৌঁছে দেবেন। এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু জীবনকৃষ্ণ এর আর একটি অর্থ করলেন – ঈশ্বরের নাম করলে অজানা কেউ অর্থাৎ সচ্চিদানন্দগুরু তাকে সাততলা বাড়ীর সাততলায় ঈশ্বরের কাছে পৌঁছে দেবেন।

খ) ঠাকুর শ্রীমকে বললেন, কেশবের ভারী অসুখ। তাই কেশবের জন্য ডাব চিনি মানত করেছি। বললুম, মা, কেশব না থাকলে কলকাতা গেলে কার সাথে কথা কব।

শ্রীম ঠাকুরের হয়ে ডাব চিনি দিয়ে এসেছিলেন ঠন্ঠনিয়ার কালীবাড়ীতে – কেশব সেন আরোগ্য লাভ করার পর। সুতরাং ঠাকুরের কথার সাধারণ অর্থ ছাড়া অন্য অর্থ ছিল না।

শ্রীজীবনকৃষ্ণ এর যোগের একটি অর্থ দান করলেন। তিনি বললেন,

চিনি মানে অনুভূতি। ডাব – মুখ মণ্ডল। মা কেশবকে বাঁচিয়ে দিলে ঠাকুর কথা দিচ্ছেন তিনি শুধুই তার দর্শন অনুভূতিকে ভিত্তি করে মায়ের মহিমার কথা বলবেন কেশবের সঙ্গে, অন্য কথা নয়।

১৫। মিথ্যা থেকে সত্যে আসা যায় কিন্তু মিথ্যার দ্বারা (ভ্রান্তির দ্বারা) সত্যকে লাভ করা যায় না।

সত্যের দ্বারা সত্যকে লাভ করা যায়। ঋগ্বেদেও বলা হয়েছে – "ঋতেন ঋতং ধরুণং ধারয়ন্তং"– ঋতের দ্বারা ঋতকে ধারণা করা যায় যে ঋত সকল কিছুকে ধারণ করে আছে।

জীবনকৃষ্ণ বলতেন, তোরা আমায় ভিতরে পেয়েছিস তাই এসব কথা নিতে পারছিস (মানতে পারছিস)। না হলে এসব নতুন কথা, প্রচলিত ধারার বিপরীত কথা, গ্রহণ করা সম্ভব হ'ত না। তোরা খুঁটি পেয়েছিস কিনা– খুঁটি হ'ল এই আমাকে ভিতরে দেখা। স্বামীজিও বলেছেন, নিম্নতর সত্য থেকে উচ্চতর সত্যে উত্তীর্ণ হওয়া যায়। সচ্চিদানন্দগুরু লাভ থেকে সত্য লাভ শুরু – পরিশেষে চরম সত্য – মনুষ্যজাতি ব্যাপ্ত এক অখণ্ড চৈতন্যের উপলব্ধিতে উত্তরণ ঘটে। পূজা মিথ্যা। তাই পূজা করে কেউ সত্য দর্শন – ত্রিপুটি অবস্থায় ভগবান দর্শন – করতে পারে না। শ্রীরামকৃষ্ণের যে ভগবানদর্শন হয়েছিল তার কারণ এগারো বছর বয়সে আনুড় যাবার পথে জ্যোতি দর্শন করে সমাধি হয়েছিল। উনি বলেছেন, "তখন থেকে আমি অন্য মানুষ হয়ে গেলুম, আমার মধ্যে আর একজনকে দেখতে পেতুম। সে-ই সব করে।" তখন থেকে ঠাকুর সত্যলাভ করেছিলেন – তাই পরবর্তীকালে চরম সত্যকে – পরম এক (অখণ্ড চৈতন্যকে) বা জগৎ চৈতন্যকে জানতে পেরেছিলেন। বাহ্যপূজা উঠে গিয়েছিল তার জীবন থেকে।

শ্রীজীবনকৃষ্ণ ১২ বছর বয়সে শ্রীরামকৃষ্ণকে সচ্চিদানন্দগুরু রূপে লাভ করেছিলেন – তাই পরবর্তীকালে অখণ্ডচৈতন্যকে জেনে অখণ্ড চৈতন্য বা পরম এক হয়ে উঠলেন – বহু মানুষ তার প্রমাণ পেল।

১৬। সাধারণ মানুষেরও কি অহংশূন্য হওয়া সম্ভব ?

মৃত তারার আলো দেখা যায় কিন্তু বাস্তবে তার অস্তিত্ব নেই। তেমনি

আত্মিকে একত্ব প্রতিষ্ঠিত হলে সাধারণ মানুষও অহংশূন্য হয়ে যায় যার effect ব্যবহারিকে পুরো বোঝা না গেলেও আত্মিক জগতে স্পষ্ট বোঝা যায়।

বটগাছের গুঁড়ি একটা আর তার নামাল (ঝুড়ি) বহু। তেমনি মনুষ্যজাতির মধ্যে একজন ঈশ্বরত্ব লাভ করে বাকীরা তার ঈশ্বরত্বের একটু আধটু আস্বাদন পান মাত্র। কিন্তু দীর্ঘসময়ের প্রেক্ষাপটে গুঁড়ি ও নামাল সমার্থক হয়ে যায় - তখন আলাদা করে গুঁড়ি খুঁজে পাওয়া যায় না - তেমনি বহু মানুষের যখন ঈশ্বরত্বলাভকারী মানুষটির সাথে একত্বলাভ হয় তখন ব্যক্তি প্রাধান্য থাকে না।

১৬। Pantheism (সর্বেশ্বরবাদ) বলছে, One is all, All is one and All is all. এর অনুভূতিমুলক ব্যাখ্যা আমরা যা পাই তা হল -

A) One is all — একজন মানুষ রাজযোগের মাধ্যমে নিজের সহস্রারে আত্মা বা ব্রহ্ম দর্শন করে ব্রহ্মত্ব লাভ করেন। এর পরিনতিতে তিনি সর্বজনীন হন। জাতিধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে তাকে বহু মানুষ অন্তরে দর্শন করে।

B) All is One — বহু মানুষ ঐ সর্বজনীন মানুষটিকে ভিতরে দেখে উপলব্ধি করে আত্মিকে এক তিনিই আছেন, বহু নেই।

C) All is all — সাধারন মানুষ সর্বজনীন মানুষটির সাথে আত্মিকে একত্বলাভ করলে তারাও তাঁর সত্তা লাভ করে, ব্রহ্মত্ব লাভ করে বিভিন্ন মানুষের দর্শনে তার প্রমান ফোটে। তখন সর্বেশ্বরবাদের প্রমাণ ফোটে।

১৭। ঠাকুর বলতেন, "পানকৌটির মত থাকবে। গায়ে জল লাগছে, ঝেড়ে ফেলবে।"

শ্রীজীবনকৃষ্ণ দেহতত্ত্বে এর মানে করলেন, এই জীব মনে করলেই পরমুহূর্তে শিব, সমাধিস্থ। ব্রহ্মবিদ্যা স্মরণ মনন মাত্র দেহে প্রকাশ পায় — বিজ্ঞানীর অবস্থা।

বিশ্বব্যাপিত্বে - অন্যেরা তোমার আত্মিক অবস্থার পরিচয় ভিতরে দেখে সেকথা তোমায় জানাবে। এখানে বিজ্ঞানী নাই।

সমষ্টির সাধনে - অখণ্ড চৈতন্যের সাথে একত্ব লাভ হয়। একত্বে ব্যষ্টির সাধনের যোগৈশ্বর্য্য (অর্ধবাহ্য দশা, সচ্চিদানন্দ অবস্থা, কুণ্ডলিনী জাগরণ,

সমাধি ইত্যাদি) নেই - একত্ব গরিব মানুষ, শুধু জানায় আত্মিক জগতে সকলে এক। এই অবস্থায় মানুষটা যথার্থ বিজ্ঞানী হয় - মানুষ যে আত্মিকে অনন্ত অসীম তা জানতে ও জানাতে পারে।

এ বিষয়ে স্বস্তিকা চ্যাটার্জীর (চারুপল্লী) একটি স্বপ্ন অনুধাবন যোগ্য। তিনি দেখছেন - রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে ছাতিমতলায় ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে প্রণাম করলেন ভক্তি ভরে, তারপর গড়াগড়ি দিতে লাগলেন। পূর্বদিকে সূর্য উঠেছে, সূর্যের ভিতর শ্রীজীবনকৃষ্ণ বসে আছেন - সেদিকে উনি তাকালেন না। কিন্তু সবকিছু একটা গাছের আড়াল থেকে লক্ষ্য করছিলেন বিজ্ঞানী আইনস্টাইন। তিনি এবার সেখানে থেকে বেরিয়ে প্রথমে সূর্যের মধ্যে লিখলেন $E=mc^2$। তারপর গাছে গাছে লিখে বেড়াতে লাগলেন $E=mc^2$ সূত্রটি।

রবীন্দ্রনাথ –এখানে, সূর্যের ন্যায় সর্বজনীন ও সর্বকালীন এক মানবের রূপে জগৎচৈতন্যের যে প্রকাশ ঘটে তার কৃপাকিরণ লাভ করেও প্রচলিত ধর্মের কবি কল্পনায় ও ভাবাবেশে বিভোর থাকেন যারা তাদের প্রতিনিধি।

আইনস্টাইন – বিজ্ঞানী — যিনি একজন মানুষের রূপে প্রকাশিত জগৎচৈতন্যের পূর্ণ পরিচয় লাভ করেন। পরে, আত্মিকে সকলেই তাঁর সাথে এক, তাই সকলেই অনন্ত — এই সত্য উপলব্ধি করেন।

১৮। এ যুগের আত্মজিজ্ঞাসুরা তৃপ্ত।

০৫/২/১৯৬৭ - তারিখে পাঠ শেষে রাত্রি ৮.৩০মিঃ শ্রীজীবনকৃষ্ণ উঠলেন - স্বামীজির ছবিতে চোখ পড়তেই দেখলেন - স্বামীজি নয় সুশান্ত সরকারের রূপ। উনি একজন জীবনকৃষ্ণের কৃপাধন্য মানুষ।

স্বামীজি সপ্তর্ষিমণ্ডলের ঋষি। অর্থাৎ আত্মজিজ্ঞাসু। তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের প্রচারকও ছিলেন। কিন্তু তিনি নিজেই বলছেন, ঠাকুর যে এতসব বললেন, কই কিছু তো হ'ল না। ভগবান দর্শন হ'ল কৈ? তবে রামকে পেলাম না বলে শ্যামকে নিয়ে কি ঘর করতে হবে? তা করতে পারব না। অর্থাৎ তার অন্তর তৃপ্ত হয়নি। এদিকে - January, ১৯৬৩ -তে সুব্রতবাবু লণ্ডনে শ্রীজীবনকৃষ্ণ সম্পর্কে বক্তৃতা দিলেন - তিনি কিন্তু তৃপ্ত — শান্ত (সুশান্ত)। কেননা অন্তরে জীবনকৃষ্ণকে তথা রামকে পেয়েছেন। আবার অপরে তার প্রমাণও পেয়েছে (বক্তৃতারত অবস্থায় তার কপালে জীবনকৃষ্ণকে দেখে)।

স্মৃতিকথা

শ্রীজীবনকৃষ্ণের পূত সঙ্গ লাভে ধন্য কিছু মানুষের টুকরো কিছু স্মৃতিকথায় ধরা পড়েছে তাঁর অসামান্য জীবনের কিছু দিক।

শ্রী গৌরমোহন দত্ত

১) শ্রীজীবনকৃষ্ণ তখন হালদার পাড়া লেনে থাকতেন। সেটা মনে হয় উনিশশো আঠাশ সাল হবে। দু'একদিনের দৃশ্য আমার স্মৃতিতে আজও ভেসে আছে। যেমন প্রায়ই যখন চৈতন্যদেবের কথা কিংবা শিব -এর কথা কিছু বলতেন, দেখতাম কথা প্রসঙ্গে শ্রীজীবনকৃষ্ণের মাথাটা সামনে বুকের পানে ঈষৎ থপ থপ করে ওঠানামা করতো। ওই রকম মাথা নাড়ার অর্থ তখন কিছুই বুঝতে পারিনি। আর উনিও খুব চাপা ছিলেন। কাউকে কিছু বলতেন না, বা জানাতেন না। উত্তরকালে জানলাম – কুণ্ডলিনী জাগ্রত হওয়ার ঐ একটা অবস্থা।

২) নির্জনতা লাভের জন্য একবার নস্কর পাড়া এরিয়ায় যেটা লিচু বাগান বলত, সেখানে একটা ঘর আমরা ভাড়া নিলাম। লোকেনবাবু, ভণ্ডুল মহারাজ এরাও সঙ্গে ছিলেন। লোকেনবাবুই ঘর ভাড়ার যা কিছু সব দায়িত্ব নিয়েছিলেন। সেখানে আমাদের নিজেদের মধ্যে আধ্যাত্মিক আলোচনা হতো। এখানে জীবনবাবু প্রায়ই আসতেন। এখানে যখন কুণ্ডলিনী জাগতো – ওঃ সে কী ভীষণ দৃশ্য। বলে বোঝানো যাবে না। কেবল তাঁর বিপুল দেহটা ডানদিক থেকে বাঁদিকে, বাঁদিক থেকে ডান দিকে ঘন ঘন হেলে ঝাঁকুনি দিয়ে উঠতো। আর মনে হ'ত যেন বিছানা সমেত খাট এক্ষুনি ভেঙ্গে পড়বে।

৩) তিনি ঠিক সাধারণ মানুষের মতই ছিলেন। খুব রসিকও ছিলেন। একবার হরেক-রকমের আম ঝুড়িখানেক এনে সকলকে বললেন – নাও আজ শুধু আম খাওয়াই হবে, খাও। আমার দিকে চেয়ে বললেন – ছোট গৌর এর তো পেট খারাপ। আমি হেসে বললাম – তা আম খাওয়া যেতে পারে। তখন সবাই হেসে উঠলাম। বিষ্টু (ভট্টাচার্য) বাবু মাঝে মাঝে আসতেন, উনিও এদিন এসে গেলেন। সকলে পেট ভরে আম খেলাম। সে এক আনন্দে দিন কাটতো

.......। বেশ এক রকম দিনগুলো কাটছিল। হঠাৎ এলো হিটলারের যুদ্ধ (২য় বিশ্বযুদ্ধ)। যুদ্ধ বেশ ঘনিয়ে উঠলো। তখন প্রায় সবাই শহর ছেড়ে চলে যাচ্ছে। আমিও দেশে ফিরে গেলাম। বহুদিন এদের সঙ্গে আমার মেলামেশা হয়নি।

শ্রী ধীরেন রায়

১) পুরীতে জীবনকৃষ্ণ থাকাকালে অযোধ্যা নামে এক পাচককে পাঠানো হয়। সে এক ইতিহাস। জয়পুরে কাজ করছিল। একদিন স্বপ্নে দেখলো তাকে উটে তাড়া করেছে, পালাবার পথ নেই। এমন সময় এক মহাপুরুষ আবির্ভূত হয়ে আমাকে এবং মেজদা (কবিরাজ শৈলেন্দ্র রায়)-কে দেখিয়ে বললেন শ্রীঘ্র কলকাতায় এদের কাছে যা। এদের অসুবিধা হচ্ছে। অযোধ্যা পূর্বে আমাদের বাসায় রান্না করতো। তারপর সে কলকাতায় আসে এবং জীবনকৃষ্ণের কাছে যেতে আগ্রহী হয়। জীবনকৃষ্ণকে দেখামাত্র চিনতে পারে ও বলে যে তার স্বপ্নে দেখা মহাপুরুষ তিনিই।

পুরীতে যাবার কয়েকদিন পরেই এক সকালে সে বলল, রাত্রে স্বপ্নে দেখেছে কাঁসর ঘন্টা ও নানা বাদ্য বাজিয়ে ঠাকুরের মিছিল বেরিয়েছে। রাজপথে সুন্দর সুসজ্জিত ঠাকুরের চতুর্দোলা। কাছে আসতে দেখে যে তার মধ্যে জীবনকৃষ্ণ বরবেশে সজ্জিত। কপালে শ্বেতচন্দনের ফোঁটা দিয়ে সাজানো। মুখমণ্ডলে অপূর্ব শোভা। স্বপ্নে জীবনকৃষ্ণ অযোধ্যাকে জড়িয়ে ধরে আদর করলেন। অযোধ্যাও একেবারে আনন্দে বিস্ময়ে অভিভূত।

২) জীবনকৃষ্ণের কাছে যাবার পর আমার ব্রাহ্মণের সংস্কার কিভাবে গেল, সেটা বলছি। একদিনের কথা। সাধারণত উপনয়নের পর থেকে সর্বদাই গলায় যজ্ঞোপবীত থাকতো। একদিন কোন কারণে অফিস যাবার সময় পৈতেটো খুলে পড়ে যায়। তাড়াতাড়ি ছিলো, পৈতের গ্রন্থি দেবার সময় ছিলো না। তাই একটা আস্ত পৈতে পকেটে নিয়ে খুঁত খুঁত মনে অফিস গেলুম। ইচ্ছা, অফিস গিয়েই এক ফাঁকে পৈতেটো তৈরী করে নেবো। আর মনে মনে ভাবছি ইতিমধ্যে যেন কথা বলতে না হয়। কিন্তু সারাদিন এত কাজের চাপ ও দৌড় ঝাঁপ ছিলো যে পৈতেটো আর করা হলো না। রাত্রে দেখছি – ঠাকুর রামকৃষ্ণ আমাকে এক

ল্যাবরেটরীতে একটা চেয়ারে বসালেন। আর আশ্চর্য আমার শরীরের বদলে শুধু skeleton টা দেখছি আর মেরুদণ্ডে তিনটি সরু নিওন লাইটের মত জলছে। তা দেখিয়ে ঠাকুর বললেন "ঈড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্না – ব্রহ্মসূত্রই যজ্ঞসূত্র, বাইরের পৈতের আর দরকার নেই।"

অরুনকান্তি ঘোষ

১) আলপুকুরে থাকার সময় একদিন সুধীনদা ও আমি জীবনকৃষ্ণের সাথে হাঁটছি, মাঝে মাঝে কথা হচ্ছে। সুধীনদা স্বামীজির ভাই পরলোক গত মহেন্দ্রনাথ দত্তের কথা তুললেন। আমি বললাম তাঁর কাছে দুবার গেছি। শ্রীজীবনকৃষ্ণ-কে সেই কথা বললাম। যে ইচ্ছা নিয়ে আমি গিয়েছিলাম, তা পূর্ণ হয় নি। আর তারপর তাঁকে যারা সেবা করতো তারা বিরক্ত করতে লাগলো তার লেখা বই কেনার জন্য। আমি তখন চাকরি করি না। তেমন বই কেনার সঙ্গতি কোথায়? বলেছিলাম, লাইব্রেরী থাকলে এসে পড়ে যেতে পারি। শ্রীজীবনকৃষ্ণ সব শুনতে লাগলেন, বললেন, "হ্যাঁরে, ওই রকম হয়।" সুধীনদা তখন সৌরেনের কথা বললেন, ও যখন প্রথম প্রথম আসতো ও বাড়ীতে, তিনি রামনামের বই দেওয়াতে ও ভেবেছিল না জানি কত পয়সা দিতে হবে এর দাম। ও তখন বেকার ছিলো কি'না। জীবনকৃষ্ণ এসব পুরোনো দিনের কথা শুনে হাসছিলেন আর কথা প্রসঙ্গে দু-চারটে কথা বললেন।

২) আলপুকুরে ওনার সাথে হাঁটছি। মাঠের পর মাঠ একটানা চলেছি। একসময় আমরা 'বড়জলা' বলে একটা মাঠে এসে পড়লাম। জীবনকৃষ্ণ বললেন, "এটা হচ্ছে বড়জলা" একদিন সন্ধ্যে বেলায় খুব ভাব হয়েছিল এইখানে। ভাবেতে ঠাকুরের কথা কয়েছিলাম। এহেন পবিত্র মাঠ। তাঁর কথা শুনে আমাদেরও অদ্ভুত আনন্দ হতে লাগলো।

৩) আলপুকুরে থাকার সময় জীবনকৃষ্ণের এক বিশেষ ভক্ত গোলাম হোসেনের সাথে আমাদের আলাপ হয়। মনে পড়ছে ওনার সাথে জীবনকৃষ্ণের কথোপকথনের কথা। একদিন জীবনকৃষ্ণের এক কথার উত্তরে গোলাম ভাই বললেন, 'বুঝতে তো পারছি, কিন্তু আমাদের তো জানেন, চুন খেয়ে গাল পুড়ে

গেছে, এখন দৈ খেতে ভয় হয়।' আপনি তো আমার সব জানেন। কত মন্দ কাজ করেছি। এখন উপায় কি? জীবনকৃষ্ণ বললেন, 'মন্দ কাজ, ভাল কাজ! দূর দূর আল্লাকে পেতে হলে কি চাই জানো ভাই, শুধু আল্লার কৃপা, আর কিছু না। আর তুমি যে কৃপা পেয়েছো ভাই। ওরে গোলাম ভাইকে চা দিস, আর বিস্কুট'। গোলাম সাহেব বলে চললেন, 'দেখুন, আমি প্রায়ই ভাবি, হিন্দু মুসলমান কি আবার ভাই ভাই হবে না? আপনি বলুন। তিনি বললেন, 'ও ভাই গোলাম, কিন্তু আল্লার কাছে কি জাত বিজাত আছে, না geographical boundary আছে ? তাঁর কাছে সব সমান। যা হয়েছে, তা জানবে তারই ইচ্ছায়। এ জগত তোমারও নয়, আমারও নয় – আল্লার। তাঁর যা ইচ্ছা হয়, তা করুন।' আমরা তন্ময় হয়ে তাঁর কথা শুনতে লাগলাম। বুঝলাম কিভাবে সমস্ত সংস্কারের উর্দ্ধে উঠে কথা বলতে হয়। আর গোলাম সাহেবও কেন তাকে এত ভালোবাসতেন।

৪) একদিন কথা প্রসঙ্গে জীবনকৃষ্ণ বললেন, ইংরাজী বড় ভয়ানক ভাই। Reward মানে punishment, আমাকে reward পেতে হবে। আমি স্বপ্ন দেখেছিলাম, একজন একখানা বই নিয়ে এসেছে আর আমায় বলছে - তোমার reward হবে এতে লেখা আছে। তারপর বই খুলে সে জায়গাটা যেন বার করতে চেষ্টা করছে। আমি তার হাত থেকে বইখানা নিয়ে বললাম, দাও আমিই খুঁজে নিচ্ছি। গোলাম ভাই বললেন, "হ্যাঁ জগতের ইতিহাসে এর প্রচুর instant আছে। সক্রেটিসকে হেমলক পান করিয়েছিলো। মহম্মদকে মক্কা থেকে তাড়িয়ে দিল, যিশুকে ক্রুশবিদ্ধ করেছিলো, আবার গান্ধীজীকেও নাথুরাম গড়সে গুলি করলো।" দিলীপ বললো, reward মানে যে punishment হয়, তার reference Bible - এ আছে। সেদিন আমি ও বিনয় দেখেছি। Christ Peter -কে বলছে – 'আমি যেমন ভাবে মরেছি, তুমিও তেমনি ভাবে মরবে, এই তোমার reward'। শ্রীজীবনকৃষ্ণ সোৎসাহে বলে উঠলেন, 'এই দেখ গোলাম, এরা আমায় শিক্ষা দিল, তাই না কি? আমাকে Bible খানা এনে দেখাস তো। তা পিটারকে তো পুড়িয়ে মেরেছিলো, এ পাওয়া যায়। লোকে বই লিখতে গিয়ে অনেক fact distort করে ফেলেছে।'

সে দিনের আলোচনায় আমরা সকলেই বেশ সমৃদ্ধ হয়েছিলাম।

ভূমিকা

দর্শন ও Philosophy শব্দ দুটি একই অর্থে ব্যবহার করা হয় – কিন্তু বুৎপত্তিগত অর্থ আলাদা। দর্শন মানে দেখা। আর Philosophy মানে জ্ঞানের প্রতি আসক্তি বা ভালবাসা।

দর্শন শাস্ত্রের এক অর্থ অধ্যাত্মবিদ্যা। অধ্যাত্মবাদীর দর্শন চিন্তার মূল ভিত্তি নিজের ভিতর দর্শন ও অনুভূতি। অপর পক্ষে ইউরোপীয় দার্শনিক বা Philosopher-রা শুধুমাত্র যুক্তিবিচার করে ঈশ্বরকে বুঝতে চান, যা প্রায় অসম্ভব। তাই দার্শনিক হ্যামিলটন বলেছেন – a learned ignorance is the end of Philosophy and beginning of religion.

আচার তান্ত্রিকতার ঊর্ধ্বে এই religion বা ধর্মবোধ জেগে উঠলে জীবন সম্বন্ধে একটি বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে ওঠে। তারা দেহস্থ চৈতন্যের রসাস্বাদন ও মনুষ্যজাতির সাথে আত্মিক একত্ব উপলব্ধি করে জীবনের অন্য এক মাধুর্যরস উপভোগকেই জীবনের চরম লক্ষ্য বলে মনে করেন। প্রাত্যহিক জীবনের নানা অভাব অভিযোগ থাকা সত্ত্বেও এই মাধুর্য ম্লান হয় না।

ধর্ম শব্দের অর্থ হলো যিনি ধারণ করে আছেন তাঁকে জানা – প্রথমত দেহস্থ চৈতন্য বা আত্মাকে জানা, পরে মনুষ্য জাতি যে অখণ্ড চৈতন্যে বিধৃত তাকে জানা। এই অখণ্ড একের তথা জীবনসত্যের প্রকাশের একটি গতি-শীলতা আছে। যত এই সত্যকে জানা যাবে ততই সত্যদ্রষ্টা জ্ঞানের রাজ্যে এগিয়ে যেতে থাকবেন – এরূপ মানুষকেই উপনিষদ বলেছে, "ঋষি" – যার জীবনের মূলমন্ত্র "চরৈবেতি"।

একযুগে একজন মানুষ এ বিষয়ে বাকীদের থেকে অনেক এগিয়ে থাকেন – অন্যেরা তাকে অবতার বলেন। তার জীবনদর্শন অনুসরণ করার চেষ্টা করেন কিন্তু পারেন না। এরূপ পুরুষের জীবনদর্শন তখনই অনুসরণ করা যায়

যখন তাঁকে ভিতরে দেখে তার আত্মিক সত্তা লাভ করে মানুষ। এইভাবে তার জীবনদর্শন সাধারণ মানুষের মধ্যে ব্যাপ্ত হতে পারে আর ঠিক এই ব্যাপারটিই ঘটল এ যুগে শ্রীজীবনকৃষ্ণকে কেন্দ্র করে। তাঁকে দর্শন করে জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে অসংখ্য মানুষ। তাদের মন্ত্র নেই, তন্ত্র নেই, পূজা নেই, নৈবেদ্য নেই – আছে শুধু অন্তরে প্রাণের বিচিত্র রূপ দর্শন ও সমবেত ভাবে তাঁর মহিমা বিশ্লেষণ। তখন পরিবার, বংশমর্যাদা, জাতি গৌরব ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্রের সকল মর্যাদাকর উপাধি মন থেকে ত্যাগ হয়ে যায় ও একজন সাধারণ মানুষ হয়ে মনুষ্যজাতির সঙ্গে নিবিড় ঐক্য উপলব্ধি করা যায়। জীবনচর্চায় গৃহীত হয় একত্বের চর্চা, আসে সংসারে নির্লিপ্ততা, সহজ-সরল হয় জীবনযাত্রা, জীবনে মূর্ত হয় অপরিগ্রহ, প্রয়োজনাতিরিক্ত অর্থের জন্য সে ছোটে না ও বেশি কাজে নিজেকে জড়ায় না।

শ্রীজীবনকৃষ্ণকে যারা অন্তরে দর্শন করেন তাদের জীবনদর্শন মিলে যায় এক সুরে। একত্বের রাগিনী অনুরণিত হতে শোনা যায় এরূপ কিছু মানুষের সম্মিলনে তাদের দর্শন অনুভূতির চর্চায়।

আর এটাই ধর্ম, 'fulfilment of requirement of human body'। দেহের কিছু জৈবী ধর্ম আছে, ঐ জৈবীধর্ম পালনে দেহধারণের সার্থকতা লাভ হয় না। মানব দেহের একটি বিশেষ ক্ষুধা আছে – আত্মিক ক্ষুধা – The great hunger – আত্মিক একত্ব লাভেই এই ক্ষুধার নিবৃত্তি হয় – জীবন সার্থক হয় – জীবনকৃষ্ণকে অন্তরে পেয়ে জীবন এই সার্থকতা লাভ করে।

২৬শে কার্ত্তিক, ১৪২২

স্বপন মাধুরী

আদম

* একদিন (১৯.০৯.১৫) আমি স্বপ্নে দেখছি যে আমি আর মা বাড়ির কাছেই হাইস্কুলের পিছনে নিমগাছে নিমপাতা পাড়তে গেছি। এমন সময় রাস্তার উল্টো দিকে একটা উঁচু বেদির উপর একটা কঙ্কাল বসে আছে দেখলাম। কিছুক্ষণ পর কঙ্কালটার গোটা দেহ সাদা হয়ে গেল। হাড়গুলো আর দেখা যাচ্ছে না। দেহ আর মুখ থেকে আলো বের হচ্ছে। কঙ্কালের হাতে রয়েছে একটা আধ খাওয়া আপেল। ওর মুখটা ঠিক রামকৃষ্ণের মত। আমি মা-কে কিছু প্রশ্ন করলে মা উত্তর দেবার আগেই কঙ্কালটা উত্তর দিয়ে দিচ্ছে। তখন আমি আর মা খুব ভয় পেয়ে গেলাম। তারপর আমরা আসার পথে এক দোকানদারকে সব ঘটনা বলাতে সেও আমাদের সঙ্গে গিয়ে দেখে যে, ঐ কঙ্কালটার সামনে যা কিছু জিজ্ঞেস করা হচ্ছে সে তার উত্তর দিচ্ছে।

তারপর বাড়ি ফিরে দেখি টি.ভি.-তে breaking news দিচ্ছে যে পৃথিবীতে মানুষের সঙ্গে এই প্রথম কঙ্কাল কথা বলেছে। বিভিন্ন টি.ভি. চ্যানেলের লোকেরা এসে আমাকে প্রশ্ন করছে। যেখানে ঐ কঙ্কালকে দেখেছিলাম সেখানে যেতে বলছে। আমি ভয়ে যাচ্ছি না। রাতে শুতে যাবার সময় মাকে বারবার বলছি সব জানলা লাগানোর জন্য যাতে কঙ্কালটা ঢুকে না যায়। তারপর ঘুম ভেঙে গেল।

- তানিয়া রহমান (ইলামবাজার, বীরভূম)।

ব্যাখ্যাঃ শ্রীরামকৃষ্ণই প্রথম মানুষ (আদম) যিনি জ্ঞানবৃক্ষের ফল খেয়েছেন অর্থাৎ ঠিক ঠিক ঈশ্বর দর্শন করেছেন, কেননা ঈশ্বরকে জানার নাম জ্ঞান। তিনি কঙ্কাল অর্থাৎ দেহে দেহবুদ্ধি নাই অর্থাৎ অহং নাই। শ্রীরামকৃষ্ণের প্রকৃত পরিচয় এবার জগতে প্রচার পাবে।

* দেখছি – আমাদের স্কুলের প্রথম অবসর প্রাপ্ত শিক্ষক সত্যদাস বাবু মারা গেছেন। আমরা দেখতে গেছি। দেখি ওনার মৃতদেহের পাশে ওনার ছেলে

বসে আছে। ... ঘুম ভাঙল। বুঝলাম, সত্যের নূতন রূপ জগতে প্রকাশ পেতে চলেছে। -

- অভিজিৎ রায় (ইলামবাজার, বীরভূম)।

পিতা নো বোধি

* দেখছি (১৮.০৮.২০১৫) – বিছানায় আমার পাশে এক ভদ্রলোক শুয়ে আছে সাদা ধবধবে ধুতি পাঞ্জাবী পরে। মাথা ন্যাড়া, টুপী পরে আছে। ভদ্রলোককে আমার বাবা বলে মনে হচ্ছে – অথচ বাবার মত দেখতে নয়। ... ঘুম ভাঙলে বুঝতে পারলাম স্বপ্নে আমি জীবনকৃষ্ণকে দেখছি।

– আত্রেয়ী ঘোষ (বয়স ৫) চারুপল্লী, বোলপুর।

ব্যাখ্যাঃ দ্রষ্টা পরমপিতাকে (ঈশ্বরকে) দেখছে নিজের বিছানায় অর্থাৎ সহস্রারে। প্রতিটি মানুষ যেন ব্রহ্মসমুদ্রে এক একটি ঢেউ। ঢেউ এর উৎস ঐ সমুদ্র। আবার ঐ সমুদ্রেই সে বিধৃত – ধরা আছে। এই সমুদ্রকে পরমপিতা রূপে জানা ও তার সঙ্গে অচ্ছেদ্য সম্পর্ক অনুভবই ধর্ম।

* স্বপ্নে দেখছি (১৫ই আগষ্ট, ২০১৫) – আমার একটা সুন্দর Timex ঘড়ি আছে। স্নেহময় মামা এসে ঐ ঘড়িটা চাইল। ঘড়িটা আমার খুব প্রিয়। তাই দিতে ইচ্ছা করছিল না। কিন্তু মামা দ্বিতীয় বার যখন বলল, 'ঘড়িটা দে' - - তখন আমি অনিচ্ছা সত্ত্বেও ওটা দিয়ে দিলাম। ... ঘুম ভাঙল।

– দেবরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় (চারুপল্লী, বোলপুর)।

ব্যাখ্যাঃ স্নেহময় মামা – স্নেহশীল ভগবান। ঘড়ি চাইছেন – ১) দ্রষ্টাকে কালাতীত অর্থাৎ শাশ্বত জীবনের পরিচয় দান করতে চান। ২) ভগবান চাইছেন দ্রষ্টা যেন আরও বেশি সময় দেন ভগবৎ চর্চায়।

* স্বপ্নে দেখছি (০৪.০৯.১৫) – মানিক পত্রিকার প্রচ্ছদ নীল ভেলভেটে মোড়া, তার উপর শোলার কাজ করা। মাঝখানে একটি সুন্দর বাচ্চা ছেলে

খালি গায়ে উড়ছে। দুটি ডানা রয়েছে। ডানা দুটি নড়ছে। মনে হচ্ছে এটি এবারের মানিক পত্রিকা।

– পিউ কয়াল (বড়িশা, কলকাতা)।

ব্যাখ্যাঃ ধর্ম জগতে নূতন অধ্যায়ের সূচনা হচ্ছে যার প্রতিফলন ঘটবে মানিক পত্রিকায়।

কোন আলো

* স্বপ্ন দেখছি – জীবনকৃষ্ণ, আমার স্বামী (বৈদ্যনাথ) ও মেজদা (প্রেমময়) বসে আছে। জীবনকৃষ্ণ মেজদার মুখে কী যেন খাইয়ে দিচ্ছেন। মেজদার খুব আনন্দ হচ্ছে, চোখে মুখে সেই আনন্দ ফুটে উঠছে। ... খুব স্পষ্ট দেখলাম জীবনকৃষ্ণকে, তাই আমারও খুব আনন্দ হল ও ঘুম ভাঙল।

– বিশাখা চট্টোপাধ্যায় (জামবুনি, বোলপুর)।

ব্যাখ্যাঃ বৈদ্যনাথ – শিব – ঐক্য স্থাপনকারী।

খাইয়ে দিচ্ছেন – শ্রীজীবনকৃষ্ণ তাঁর সাধনার ফল দান করে, তাঁর প্রতি প্রেম জাগ্রত করে (প্রেমময় করে তুলে) তাঁর সাথে এক করে নিচ্ছেন।

* দেখছি – একজন লোক ক্রমাগত এক আত্মীয় বাড়ি থেকে আর এক আত্মীয় বাড়ি ঘুরে বেড়াচ্ছে। স্বপ্ন ভাঙল। একজন বলল, তোমার একত্ব লাভ হয়েছে। এরপর সত্যি সত্যিই ঘুম ভাঙল।

– কল্পনা রায় (ইলামবাজার)।

ব্যাখ্যাঃ একত্ব লাভ হলে সকল মানুষকে আত্মীয় বোধ হয়।

অন্য হাট

* ২৯.০৭.২০১৫ – স্বপ্ন দেখছি – হাটে গেছি। ওখানে শ্রীজীবনকৃষ্ণের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। কিন্তু স্বপ্নে মনে হচ্ছে ওনার নাম জগবন্ধু। উনি বললেন, সব পটল কিনবি না বনকাঠির ভাল পটল নিবি। আর সব শাক কিনতে নাই।

ভাল দেখে শাক কিনবি। মনে হল হাটের সব কিছু ওনার নখদর্পণে। ... ঘুম ভাঙল। শ্রীজীবনকৃষ্ণকে এই প্রথম স্বপ্নে দেখলাম। খুব আনন্দ হল।

– তারাশঙ্কর চট্টোপাধ্যায় (অযোধ্যা, বর্ধমান)।

ব্যাখ্যাঃ হাটে – অর্থাৎ ৭ম ভূমিতে মন প্রবেশ করলে বাবুর সঙ্গে দেখা হয় – তিনি সত্য জানিয়ে দেন।

* গত আগষ্টে এক রাত্রে স্বপ্নে দেখছি – সামনে শ্রীজীবনকৃষ্ণকে দেখে জিজ্ঞেস করলাম, আপনাকে নাকি দেহের ভিতর দেখা যায়? উনি বললেন, 'যায় তো। আমি তোর ভিতরে আছি দেখ।' নিজের দিকে তাকিয়ে দেখি 'ধর্ম ও অনুভূতি' বইতে ওনার যেমন আউটলাইন আছে সেই রকম আউটলাইন আমার বুকের ভিতর রয়েছে। অবাক হলাম। আবার জিজ্ঞাসা করলাম – আপনি সকলের দেহের ভিতর আছেন? উনি বললেন, হ্যাঁ। তখন দেখি বহু মানুষের দেহের ভিতর ওনার আউট লাইন রয়েছে। বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলাম। এই প্রথম আমি জীবনকৃষ্ণকে স্বপ্নে দেখলাম।

পরের স্বপ্নে চতুর্ভুজ নারায়ণ সামনে এসে দাঁড়াল। জিজ্ঞেস করলাম, তুমি কে? উত্তর হল – নারায়ণ। আমি বললাম, 'নারায়ণ হলে তো দুটি হাত হবে। চার হাত কেন?' তারপর মোবাইল থেকে ছবি দেখিয়ে বলছি, 'এই দেখ গৌরাঙ্গের দুটি হাত, এই দেখ রামকৃষ্ণের দুটি হাত, এই দেখ জীবনকৃষ্ণের দুটি হাত।' তখন ঐ নারায়ণ মূর্তির ভিতর থেকে জীবনকৃষ্ণ বেরিয়ে এসে বলছেন, তোকে পরীক্ষা করছিলাম। ... বুঝলাম, সংস্কারজ মূর্তি নয়, জীবন্ত মানুষ ভগবান হয় – এটি ধারণা হয়েছে।

– গদাধর দাস (গড়গড়িয়া, বীরভূম)।

জ্বালানি

* স্বপ্নের মধ্যে স্নেহময়দার দেওয়া দুর্গাপূজার ব্যাখ্যাটা মনে করার চেষ্টা করছি। সবটা মনে করার চেষ্টা করছি। কিন্তু সবটা মনে আসছে না। কেবল বিজয়া দশমীর ব্যাখ্যাটা মনে পড়ছে। আর দেখছি জীবনকৃষ্ণের মুখের আউটলাইন পরপর অনেকগুলো, আমার সামনে ফুটে উঠল। ...

– অভিজিৎ রায় (ইলামবাজার)।

ব্যাখ্যাঃ সত্য অনুশীলনের প্রমাণ ফোটে অনুভূতিতে। ভেদবুদ্ধির তথা বহুরূপতার মায়া (দশানন) ভেদ করে একের (রামের) একত্ব শক্তির বিজয় মহিমা স্মরণ পর্বই বিজয়া দশমী। শ্রীজীবনকৃষ্ণকে কেন্দ্র করে এই একত্ব বোধ জাগে।

* গত অক্টোবর মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে এক স্বপ্নে দেখছি – বাবার কাছে কেরোসিন তেল নিয়ে আমার বাইকে ভরছি। তখন একজন বলল, কেরোসিনে তোমার ইঞ্জিন খারাপ হয়ে যাবে। আমি বললাম, রাস্তার সব দোকানেই কেরোসিন মেশানো তেল (পেট্রোল) বিক্রি হয়। আমি মূল ট্যাঙ্ক থেকে খাঁটি তেল (পেট্রোল) কিনেছি। মাঝে মাঝে কেরোসিন ভরলে অসুবিধা নেই। .....

– বিশ্বরূপ মণ্ডল (অযোধ্যা, বর্ধমান)।

ব্যাখ্যাঃ বাবার কাছ থেকে পাওয়া কেরোসিন – বংশগতির ধারায় প্রাপ্ত অনার্য সংস্কার। পেট্রোল তেল – বৈদিক কৃষ্টি – একত্বের তথা সত্যের অনুশীলন। এই স্বপ্নে দ্রষ্টাকে অনার্য সংস্কার মুক্ত হয়ে সত্যের অনুশীলনে একনিষ্ঠ হতে বলছেন। অন্যথায় আত্মিক গতি ব্যাহত হবে॥

* গত ২৮শে জুন, ২০১৫, পাঠ শুনতে শুনতে দেখছি – একটা তীব্র জ্যোতি এসে জীবনকৃষ্ণের ফটোর উপর পড়ল। আর ছবিটা দেখা গেল না, শুধু ফ্রেমটা দেখা যাচ্ছে। ...

– সুনন্দা বিশ্বাস (ইলামবাজার)।

ব্যাখ্যাঃ অনুশীলনের মাধ্যমে জানা যায় তিনি সর্বজনীন, তাই সব রূপ-ই তাঁর রূপ – কোন একটি নির্দিষ্ট রূপ নয়। ফ্রেম – মনুষ্যজাতি। মানুষের মধ্যেই তাঁর প্রকাশ।

নতুন যুগ

* স্বপ্নে দেখছি (সেপ্টেম্বর, ২০১৫) – একটা বড় মাঠ পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। পাঁচিলের বাইরে রাস্তায় বসে ৭/৮ জন শিশুকে নিয়ে ঈশ্বরতত্ত্ব আলোচনা করছেন শ্রী

জীবনকৃষ্ণ। আমিও একজন শিশু হয়ে ঐ আলোচনা শুনছি ও আনন্দ পাচ্ছি। ...

– অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় (শিমুরালী, নদীয়া)।

ব্যাখ্যাঃ শ্রী জীবনকৃষ্ণ বলেছেন – ‘ভগবান আমাকে নিয়ে সৃষ্টিছাড়া এক খেলায় মেতেছেন।’ শুরু হয়েছে নতুন যুগ – দ্রষ্টাও এই নতুন যুগে নতুন হয়ে সমষ্টির ধর্মে একত্বের রসাস্বাদনে সমর্থ হচ্ছেন। রাস্তা – সমষ্টির ধর্ম। পাঁচিল ঘেরা মাঠ – বৃহৎ ব্যষ্টি বা বিশ্বব্যাপীত্ব।

* অক্টোবর, ২০১৫-তে মায়ের মৃত্যুর কয়েকদিন পর পুরীতে থাকার সময় এক রাত্রে স্বপ্নে দেখছি – আমার মা রয়েছে। পাশে বসে আছেন শ্রী জীবনকৃষ্ণ। মা বলল, তুই তো আমার শ্রাদ্ধাদি কাজ কিছুই করিস নি – তোর কথাই ভাবছিলাম। তা রণজিৎ বলল (পাশে থাকা জীবনকৃষ্ণকেই রণজিৎ বলছেন), তুমি ভেব না, তোমার বড় ছেলে ঠিক পথেই আছে। ... ঘুম ভাঙল।

– শ্রীধর ঘোষ (চারুপল্লী)।

ব্যাখ্যাঃ রণজিৎ – সত্যকে ধরে জীবনে চলার পথে সকল বাধা অতিক্রমের শক্তি দেন যিনি। শ্রাদ্ধ না করে দ্রষ্টা যে সঠিক কাজ করছেন তার সমর্থন মিলল এই স্বপ্নে।

* স্বপ্নে দেখছি (অক্টোবর, ২০১৫) – স্নেহময়ের পাঠে শোনা কথাগুলি একটা খাতায় লিখেছি। জয় খাতাটা দেখতে চাইল। তারপর লাল কালি দিয়ে রাইট চিহ্ন (✓) দিয়ে দিল। ঘুম ভাঙল।

– মণি দেবনাথ (সখের বাজার, কলকাতা)।

আতপ ছোঁয়া

আশ্বিন মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে আমার একটা স্বপ্ন হয়। দেখছি – স্নান করে কাচা শাড়ী পরে ছিন্নমস্তা মায়ের মন্দিরে পুজোর থালা নিয়ে পুজো দিতে যাচ্ছি। তখন আমার বড় বৌদি বললেন, ছুটু ঐখানে একটা কৌটো আছে আমাকে দাও তো। আমি বললাম, আমি তো ওটা ছোঁব না, আমি তো পুজো দিতে যাচ্ছি। তখন আমার বড়দিদি বলল, আরে কৌটো ছুঁলে কিছু হবে না, তুই

আতপ ছুঁয়ে নে, তাহলে সব শুদ্ধ। আমি বললাম, দিদি, আতপ মানে তো সূর্য, আতপ ছোঁব কেন? তারপরই ঘুম ভেঙে গেল।

– রূপশ্রী মজুমদার (গড়গড়িয়া)।

ব্যাখ্যাঃ আতপ – সূর্য – ভগবান। আতপ ছোঁয়া – ভগবানের বাণীরূপ, যেমন শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত এবং ধর্ম ও অনুভূতি গ্রন্থ পাঠ করা – এতে দেহ মন শুদ্ধ হয়ে যায়।

* স্বপ্নে দেখছি (১০.০৭.১৫) – একটা গাছের গুঁড়ি। ডালপালা, পাতা নেই। তার উপর একটা নীলপাখি বসে আছে। হঠাৎ ও একটি ছানা প্রসব করল। ছানাটা ভারী সুন্দর। এটিও নীলপাখি। এবার সে উড়তে শুরু করল। মা পাখিকে আর দেখছি না। ছানাটা উড়ছে। দেখে মন প্রাণ জুড়িয়ে গেল।

– বনানী পোদ্দার (লগুন)।

ব্যাখ্যাঃ আত্মার (আত্মাপাখির) বিকাশের নব পর্যায় শুরু হয়েছে।

মূল্যমান

* স্বপ্নে দেখেছি (২৪.০১.১৫) – অমরেশ স্যার পাঠ করছেন। আমরা শ্রোতারা প্রত্যেকে এক প্যাকেট করে চিনি সঙ্গে নিয়ে গেছি। পাঠ শুনছি আর দু'এক দানা চিনি খাচ্ছি। হঠাৎ প্রচণ্ড ঝড় এল। সবার প্যাকেট উড়ে গিয়ে এক জায়গায় পড়ল। তারপর সব চিনি গলে গিয়ে এক হয়ে গেল। সবাই নিজের চিনি খুঁজছে কিন্তু পাচ্ছে না। ...

– নরেন্দ্রনাথ দত্ত (ইলামবাজার)।

ব্যাখ্যাঃ অমরেশ–শিব- শ্রীজীবনকৃষ্ণ। নিজের প্যাকেট থেকে চিনি খাওয়া – পাঠ শুনে ব্যষ্টির কিছু কিছু অনুভূতির মর্ম গ্রহণ করা। ঝড় এল – সময় হল। এবার সমষ্টিগত সাধন, একত্ব আস্বাদনের যুগ, তাই সব চিনি একত্রিত হয়ে গেল।

* গত অক্টোবর মাসে এক রাত্রে অদ্ভুত এক স্বপ্ন দেখলাম। দেখছি -

- শ্রীজীবনকৃষ্ণ ও আমার জ্যাঠা তক্তার উপর বসে আছেন পা ঝুলিয়ে। আমি ওনাদের নীচের অংশ দেখতে পাচ্ছি। জ্যাঠার পায়ের কাছে ১০০০ টাকার আর জীবনকৃষ্ণের পায়ের কাছে ৫০ টাকার নোট পড়ে আছে। ১০০০ টাকার নোটটা ৫০০ টাকার মত হলদে। আমি জীবনকৃষ্ণের পায়ের কাছে পড়ে থাকা ৫০ টাকার নোট তুলে নিলাম। কী আশ্চর্য! ওটা ১০০০ টাকার নোট হয়ে গেল। ...

– প্রিয়াঙ্কা দালাল (গড়গড়িয়া, বীরভূম)।

ব্যাখ্যাঃ জ্যাঠা – বড় বাবা – প্রচলিত সংস্কারজ ভগবান। সাধারণ মানুষ মনে করে এই ভগবানের চরণের কাছে ছড়িয়ে আছে প্রচুর জাগতিক ঐশ্বর্য। শ্রীজীবনকৃষ্ণ – সত্যমূর্তি। দ্রষ্টা সত্য চান। ৫০ টাকার নোটটা ১০০০ টাকার নোট হয়ে গেল – বাইরে থেকে সত্যের সঠিক মূল্য বোঝা যায় না। সত্য লাভ করলে, সত্যের ঐশ্বর্য লাভ করলে, তার প্রকৃত মূল্য বোঝা যায়।

বাপের বাড়ি

* স্বপ্নে দেখেছি (০৮.০৯.২০১৫) – একটি বছর তিরিশের ছেলে আমাকে ধরে বহু বছর আগে ছেড়ে আসা বাপের বাড়ি নিয়ে গেল। বাস্তবে সে বাড়ি এখন ভেঙে মাটিতে মিশে গেছে। কিন্তু স্বপ্নে দেখছি বাড়িটা অক্ষত আছে। সব ঘর ঘুরে ঘুরে দেখছি। কিন্তু কী আশ্চর্য প্রত্যেকটা ঘরেই আমার বাবা বসে আছেন দেখছি। যদিও কোন কথা হল না বাবার সাথে, তবু বেশ ভাল লাগল। মনে আনন্দ হল।

– মিনতি বন্দ্যোপাধ্যায় (জামবুনি, বোলপুর)।

ব্যাখ্যাঃ বাপের বাড়ি – মনুষ্যজাতি। কারণ মানুষ থেকেই মানুষ সৃষ্টি হয়। এই বাড়ি আজও অক্ষত অর্থাৎ মনুষ্যজাতি অশেষ – শাশ্বত। প্রতি ঘরে অর্থাৎ প্রতি দেহের ভিতর আমাদের সত্যিকারের বাবা, পরম পিতা আছেন। তিনি সর্বজনীন, সর্বকালীন মানব।

* দেখছি (০৫.০৯.১৫) – এক বান্ধবীকে সঙ্গে নিয়ে এক মহিলা এলেন আমাদের বাড়ীতে। ওনার বান্ধবী যেন আমাকে ছবি আঁকা শেখাবেন। কিন্তু ওনার পরণের শাড়ীটা খুব নোংরা – পাশে বসে কেমন অস্বস্তি হচ্ছে। মনে হল আমরা পাঠে শুনি যে সবার মধ্যে ভগবান – তাই ঘৃণা করব না কাউকে। তারপর ওনার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখি ওনার মাথা ন্যাড়া, দেখতে ঠিক জীবনকৃষ্ণের মত।

– অর্চনা দাস বৈরাগ্য (ইলামবাজার, বীরভূম)।

সাদা জামা

* স্বপ্নে দেখেছি (০১.১০.১৫) – আমাদের স্কুল (Bolpur Boys' High School) co-ed হয়ে গেছে। মেয়েরাও পড়ছে। স্কুল থেকে বাড়ী ফিরে জামা খুলে ফেললাম – দেখি ভিতরে আরও একটি জামা রয়েছে। পরে আর এক জায়গায় (অন্য এক শিক্ষকের বাড়ি) গেলাম। সেখানেও জামা খুলে ফেললাম। এটাই যেন রীতি। আমার দেখাদেখি অন্য ছাত্র ও ছাত্রীরাও তাই করছে। তখনও দেখি ভিতরে আরও জামা পরে আছি। সকলেরই একই অভিজ্ঞতা হচ্ছে। কী আশ্চর্য সব জামাগুলোই সাদা, রঙীন নয়। ... অন্যদের ক্ষেত্রেও তাই। খুব অবাক হলাম। ...

– সাগর বন্দ্যোপাধ্যায় (বোলপুর)।

ব্যাখ্যাঃ Co-ed স্কুল – দ্রষ্টা সমষ্টির ধর্মের অনুশীলনে যুক্ত। জামা – দেহ – কারণশরীর। সাদা জামা – যে ঈশ্বরীয় রূপে সংস্কারের রং লাগে নি। কালী, কৃষ্ণ, রাম ইত্যাদি রূপে নয়, মানুষের রূপে কারণশরীর জেগে উঠে ঈশ্বরীয় মহিমা দেখায় বিভিন্ন আত্মিক অবস্থায়। শ্রীজীবনকৃষ্ণ কালীকে দেখছেন কালীবাবুর রূপে, মানুষরতনকে দেখছেন জওহরলাল রূপে... এই রকম অনেক উদাহরণ দেওয়া যায়।

এখানে দেখাচ্ছে দ্রষ্টা সংস্কার মুক্ত।

* স্বপ্নে দেখছি (০৫.১০.১৫) – আমাদের ঘরে জীবনকৃষ্ণ বসে আছেন। উনি এক থালা ভাত মাখছেন। মাখা ভাত প্রথমে একটু মাকে দিলেন, তারপর একে একে বাড়ির অনেককে একটু একটু করে দিলেন। শেষে আমাকে দিয়ে বললেন, তোকে চতুর্থ ভাগটা দিলাম। ... স্বপ্ন ভাঙল।

– চন্দ্রাশিস মুখোপাধ্যায় (বড়িশা, কলকাতা)।

ব্যাখ্যাঃ চতুর্থ ভাগ – শ্রীজীবনকৃষ্ণ ৩টি ভাগে লিখলেন "ধর্ম ও অনুভূতি" গ্রন্থ। এই ধারার-ই ৪র্থ ভাগ লিখলেন "বৈদিক সত্য ও একজন হিন্দু হিসাবে শ্রীরামকৃষ্ণ" নামে। দ্রষ্টাকে অনার্য সংস্কার থেকে মুক্ত করে বৈদিক সত্য ধারণের উপযুক্ত করে নিচ্ছেন॥

নতুন পালা

* স্বপ্নে দেখেছি (২০.০৮.১৫) – শ্রীধরদা একাই যাত্রা করবে। লোকজন কম। ভাবছি ওনার খারাপ লাগবে। গ্রামের একজন বলল, খারাপ লাগবে না – কারণ উনি তো এর আগে এখানে (দেশের বাড়ি সুলতানপুরে) আরও দুবার অভিনয় করেছেন। তখন মনে হচ্ছে, তাই তো! আমি সে অভিনয় দেখি নি, কারণ ঘুমিয়ে ছিলাম। এবার আর ঘুমাব না, অভিনয় দেখব। ...

– কৃষ্ণা বন্দ্যোপাধ্যায় (বোলপুর)।

ব্যাখ্যাঃ জগৎচৈতন্য শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীজীবনকৃষ্ণের দেহমধ্যে প্রকাশ পেয়ে লীলা করেছেন। এবার নতুন এক লীলা হতে চলেছে। এই লীলা দেখার জন্য দ্রষ্টা সদা উন্মুখ থাকবেন – ঘুমাবেন না, উদাসীন থাকবেন না।

* দেখছি (২৭.০৮.১৫) – পাঠে কলকাতা থেকে এক ভদ্রলোক এসেছেন – তিনি পাঠ করছেন। কিছুক্ষণ পরে স্নেহময়দা ওর সব ব্যাখ্যার বিরোধিতা করে নতুন ব্যাখ্যা দিতে লাগলেন। আমরা স্নেহময়দার কথা শুনতে লাগলাম। ঐ ভদ্রলোককে গুরুত্ব দিলাম না। একটু পর জয় এল। ও আসা মাত্র স্নেহময়দা ওর দিকে তাকিয়ে চুপ করে বসে ওর কথা শুনতে লাগল। আমরাও সকলে

জয়ের কথা শুনতে লাগলাম। কী তেজপূর্ণ ওর শরীর। হাতে ছড়ি দেখছি না কিন্তু মনে হচ্ছে ছড়ি আছে ওর হাতে॥

– সুরজিৎ রুদ্র (বোলপুর)।

ব্যাখ্যাঃ নূতন লীলায় ছড়ি অর্থাৎ অদৃশ্য আত্মিক নিয়ন্ত্রণ আরোপিত হবে।

অন্নপ্রাশন

* স্বপ্নে দেখেছি (৩০.০৭.১৫) – গ্রামের অন্নপূর্ণা তলায় আছি – একা। বাড়ি ফিরছি – এক জায়গায় ট্রেনের একটা কামরার ভিতর থেকে কিছু মেয়ে অবাক হয়ে আমাকে দেখছে। আমি তাই তাড়াতাড়ি হাঁটতে লাগলাম। রঘুনন্দনের সাথে দেখা হল। আমি বললাম, পরিবেশটা কী সুন্দর বল্! ও বলল, হ্যাঁ।

ঘরে গিয়ে দেখছি একটা ফটো – আমার অন্নপ্রাশনের। ভাল করে লক্ষ্য করে দেখলাম, ওটা জীবনকৃষ্ণের ছবি। মাথাটা জীবনকৃষ্ণের মত দেখতে কিন্তু ধড়টা আমারই। এক মহিলা ওকে মুখে ভাত খাইয়ে দিচ্ছে। পাশে জীবনকৃষ্ণ বসে আছেন, কপালে চন্দনের ফোঁটা। একটু পর ফটোটা জীবন্ত হল। ফটোর আমি (দ্রষ্টা) মাথা ঘুরিয়ে নিজের দেহের নিম্নভাগ দেখছি – ভাবছি পুরো দেহটা জীবনকৃষ্ণ হ'ল কিনা দেখি। তখন বাইরের আমি বলছি জীবনকৃষ্ণের একটি বাণী – "With all shortcomings and frailties man becomes Brahma."

– অভিরূপ দাস (নন্দন); গড়গড়িয়া, বীরভূম।

ব্যাখ্যাঃ অন্নপূর্ণা তলায় একা – অদ্বৈতের বোধ হল। কামরার মধ্যে যুবতী মেয়েরা – মায়া সংকুচিত – পথ ছেড়ে দিয়েছে। পুকুরের পানা সরিয়ে দিলে তা একস্থানে ঘনীভূত হয়ে থাকে। অন্নপ্রাশন – ব্রহ্মত্ব তথা একত্ব লাভ – ব্রহ্মের (জীবনকৃষ্ণের) সত্তা পাওয়া। মাথা জীবনকৃষ্ণের হয়ে গেছে কিন্তু ধড়টা নয় - - ব্রহ্ম জীবনকৃষ্ণের পরিচয় কিছু অনুভূতি ও মেধা দিয়ে বুঝতে পারছেন কিন্তু এই ব্রহ্মত্ব স্থূল দেহে বর্তাক – এইটি চাইছেন দ্রষ্টা। কিন্তু সাধারণ মানুষের

ক্ষেত্রে তা হয় না। তবু একত্বলাভ হলে নানা ক্রটিবিচ্যুতি সত্ত্বেও সাধারণ মানুষ ব্রহ্মত্ব আস্বাদন করতে পারে।

* স্বপ্নে ভাবছি আমার ছেলে হবে না মেয়ে হবে? কে যেন বলল, তোর স্ত্রীর গর্ভে জীবনকৃষ্ণ জন্মলাভ করেছে। ঘুম ভাঙলে ভাবলাম, প্রতিটি মানুষ স্বরূপত জীবনকৃষ্ণ, সে নারী হোক বা পুরুষ। সুতরাং ছেলে না মেয়ে তা ভাবার দরকার নেই।

– শুভাশিষ দাস (বোলপুর)।

দুঃখহরণ

* অক্টোবরের গোড়ায় স্বপ্নে দেখছি – একটি বাচ্চা ছেলে কাঁদতে কাঁদতে বলল, আমাকে প্রিন্সিপ্যাল হাজার বার কান ধরে উঠবোস করতে বলেছে। আমি পারব না। আমি বললাম, ঠিক আছে, তুমি কতবার পারবে? ও বলল, একশো বার হলে পারব। আমি বললাম, চল তোমাদের প্রিন্সিপ্যালকে বলে দিচ্ছি। এই বলে স্কুলের অফিসে ঢুকলাম। প্রিন্সিপ্যাল একজন বৃদ্ধা মহিলা। ওনার সাথে কীসব কথা বলে বেরিয়ে আসছি। উনিও পিছু পিছু এলেন। বললেন আপনার হাতটা দেখি। একটা রেখা দেখিয়ে বললেন, এই রেখাটা বাধা দিচ্ছে বলে আপনার চাকরী হচ্ছে না। এটা নীচের রেখার সাথে যোগ হয়ে গেলে চাকরী হবে। আমি বললাম, যোগ না হলে কি হবে না? উনি চুপ করে থাকলেন। ... ঘুম ভাঙল। তখন মনে হল, আরে প্রিন্সিপ্যালকে তো ছেলেটির বিষয়ে কিছু বলা হল না। ....

– জয়কৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় (জামবুনি, বোলপুর)।

ব্যাখ্যাঃ মহিলা প্রিন্সিপ্যাল (Prinicipal) – মায়ার জগৎ, যে শুধু রহস্য রেখে দেয় – সব পরিষ্কার করে জানায় না – মনকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করে।

* দেখছি (১৬.০৭.১৫) – রাস্তা দিয়ে চলেছি। রাস্তা গিয়ে পড়েছে একটা মাঠে। সেখানে বহু তরুনী মাতাল হয়ে নাচছে। কাছাকাছি যেতেই রাস্তার প্রান্তে দেখি দুঃখহরণ দাদু দাঁড়িয়ে আছেন। খালি গা, ধুতি পরে।

ওনাকে পা ছুঁয়ে প্রণাম করলাম। খুব আনন্দ হল। তারপর দেখি মেয়েগুলি সব একটা বাসের মধ্যে ঢুকে গেছে। বাসটা ছেড়ে দিল। ... ঘুম ভাঙল।

– স্নেহময় গঙ্গোপাধ্যায়।

ব্যাখ্যাঃ মায়ার জগৎ দুঃখ দেবে কিন্তু ভগবান দুঃখহরণ রূপে আবির্ভূত হলে মায়া সরে যাবে, জগৎ আর দুঃখময় বলে অনুভূত হবে না।

আগামী দিন

* স্বপ্নে দেখছি (১৪.০৫.২০১৫) – শুয়ে আছি। ঘরে একটা ক্যালেণ্ডার টাঙানো রয়েছে ২০১৭ সালের। দেখছি – উপর থেকে অনেক শক্তি আসছে যে শক্তিতে আমার হাত পা উপরে উঠে গেছে। ...

স্বপ্নটা তিন দিন দেখলাম। আর কে যেন ওটা ফেসবুকে পোষ্ট করতে বলল।

কয়েকদিন আগে রাজ এই রকম একটা স্বপ্ন দেখেছিল। ও দেখেছিল – একটা বস্তা থেকে সরষে পড়ে গেল। সেগুলো আপনা হতে পরস্পর বিন্যস্ত হয়ে লেখা ফুটে উঠলো – ২০১৭ JWB.

– অতনু মাইতি (কাষ্টডাঙা, সরশুনা, কলকাতা)।

ব্যাখ্যাঃ J – জীবনকৃষ্ণ, B - Black – কালো – রহস্য, W - White – সাদা – রহস্য উদ্ঘাটিত হবে। ২০১৭ সাল থেকে একত্ব প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে জীবনকৃষ্ণকে তথা অখণ্ড চৈতন্যকে জানা শুরু হবে।

১৯৬৭ সালে একদিন স্বপ্নে শ্রীজীবনকৃষ্ণ দৈববানী শুনলেন, 5 Years, 5 Years, 5 Years – ঘুম ভাঙলে ভাবলেন আরও পাঁচ বছর বাঁচতে হবে নাকি? এই দুর্বল শরীর নিয়ে আরও বাঁচা তো যন্ত্রনার।

তখন ঘরের একজন বলল, আমি স্বপ্নে দেখেছি – একটা ট্রেনে এই ঘরের লোকেরা যাচ্ছি। কে যেন বলল, গন্তব্যস্থলে পৌঁছাতে পাঁচ বছর সময় লাগবে।

এখন মনে হচ্ছে – গন্তব্যস্থল হল একত্ব লাভ (to be one with absolute one) আর তা হতে ৫০ বছর লাগবে। আমাদের ৫০ বছর মানে ব্রহ্মের ৫ বছর।

১৯৫৭ সালে শ্রীজীবনকৃষ্ণ একটি স্বপ্নে দেখেছিলেন – তিনি খোকা মহারাজের মুখে মুখ লাগিয়ে নাকে নাক ঠেকিয়ে বলছেন, ঠাকুর অনেক তো করলেন, এবার যেন তার সাথে মিশে যাই। স্বপ্ন ভাঙার পর ক্যালেণ্ডারে দেখলেন, আর ১০ দিন পর পূর্ণিমা। স্বপ্নের মানে করলেন, ১০ দিন মানে ১০ বছর পর দেহ যাবে। তা মিলেও গেছে। ঐ সূত্র ধরে এখানে মানে করা হল।

এখন ১৯৬৭-এর সঙ্গে ৫০ যোগ করলে হয় ২০১৭। খুব সম্ভব ২০১৭ থেকে একত্বের বিষয়টা সাধারণ মানুষের বোধগম্য হতে শুরু করবে, একত্ব প্রতিষ্ঠা হতে থাকবে।

* স্বপ্নে দেখছি – একটা কোঙা গাছ বা এ্যালোভেরার লম্বা পাতা হাতে ধরে আছি। মনে হচ্ছে এটা আত্মা। খুব হাল্কা – যেন বস্তুগত কিছু নয়। জয় সামনে দাঁড়িয়ে আছে। ওকে বললাম, হ্যাঁ রে আত্মা কি? ও অমনি বলল, যার মধ্যে জগৎ আছে। চমকে উঠলাম। এ তো ধর্ম ও অনুভূতির কথা। মনে হচ্ছে ও নিজের কথা বলছে।

–বরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় (বোলপুর)।

ব্যাখ্যাঃ আত্মার উপমা অ্যালোভেরা বা কোঙা গাছ – যার কাণ্ড দেখা যায় না উপর থেকে। পাতাগুলোই চোখে পড়ে। কিন্তু সব পাতা এক জায়গা থেকে বেরিয়েছে – তাই-ই আত্মা – সকলে যেখানে বিধৃত। একজন এই আত্মাকে দর্শন করে, বাকীরা তাঁর রূপে নিজেদের সত্তাকে দর্শন করে। আত্মা = sum total of all individuals. ইনি আত্মাসাক্ষাৎকারীর রূপে নিজের পরিচয় নিজেই দেন।

পাঠ প্রসঙ্গে

        * **মিছরীর রুটি আড় করেই খাও আর সিধে করেই খাও মিষ্টি লাগবে।**

ব্যাখ্যাঃ ১। মিছরীর রুটি – সহস্রার। সহস্রারে মন গেলে সমাধি – ব্রহ্মানন্দ। তবে সমাধি ভেদে আনন্দের তারতম্য আছে। এটি ১ম স্তরের ব্যষ্টির সাধন যাদের তাদের পক্ষে।

২। সাধারণ মানুষের পক্ষে মিছরীর রুটি —

i) শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত – এটি সিধে করে খাওয়া মানে আক্ষরিক অর্থ (literal meaning) করা। আড় করে খাওয়া – দেহতত্ত্বে ব্যাখ্যা করা। কথামৃত আড় করে খেলেন ও জগৎকে খাওয়ালেন শ্রীজীবনকৃষ্ণ।

ii) আরেক মিছরীর রুটি হল 'ধর্ম ও অনুভূতি' গ্রন্থ। রামকৃষ্ণের অমৃতবাণীর ব্যাখ্যার ছলে শ্রীজীবনকৃষ্ণ নিজের অনুভূতি ও উপলব্ধির কথা বলেছেন। তাই এটি নতুন মিছরীর রুটিও বটে।

সিধে করে খাওয়া – ধর্ম ও অনুভূতি গ্রন্থ থেকে জীবনকৃষ্ণের দেওয়া বিশ্বব্যাপীত্বের ব্যাখ্যার অর্থ (শব্দার্থ) পাঠ ও মনন।

আড় করে খাওয়া – অনুভূতির আলোকে একত্ব বিষয়ক ইঙ্গিতপূর্ণ কথাগুলির মর্মার্থ উদ্ঘাটন – সাধারণ মানুষ একত্ব লাভ করে নিজেদের অনুভূতির আলোয় তা করবে।

* **ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের ব্যাখ্যা** –

সৃষ্টি – আত্মার সৃষ্টি (একটি দেহে জগৎ চৈতন্যের নির্যাসের সংকলন) – পরিণতিতে ব্যক্তিগতভাবে মানুষটি আত্মাস্বরূপ হয়ে যান।

স্থিতি – আত্মার সাধন – পরিণতিতে বহু দেহে সেই আত্মার বিকাশ (আত্মাসাক্ষাৎকারীর রূপ ধরে) হতে থাকে।

প্রলয় – সগুণ আত্মার নির্গুণে লয় – পরিণতিতে বহু মানুষের

আত্মাসাক্ষাৎকারীর সাথে একত্ব লাভ হয় ও তাদের একের বোধ জন্মায় – বহুর লয় হয়।

১৯১৮ সালে শ্রীজীবনকৃষ্ণের আত্মাসাক্ষাৎকার হয় (সৃষ্টি)। জীবনকৃষ্ণের দেহের ভিতর ১৯১৮ থেকে ১৯৫৫ সাল পর্যন্ত আত্মার বিকাশ ও শেষে আত্মাস্বরূপ হয়ে যাওয়া।

স্থিতি – জগতের মানুষের মধ্যে গুরু, ভগবান, ব্রহ্ম, পরমব্রহ্ম, পরম এক ইত্যাদি রূপে তাঁর প্রকাশ। ১৯৪৩ থেকে ২০১৭ সাল পর্যন্ত ৭৪ বছর ধরে চলেছে এই প্রকাশের স্থিতিকাল।

প্রলয় – সম্ভবত ২০১৭ থেকে নির্গুণের ঘনমূর্তি রূপে জীবনকৃষ্ণের প্রকাশে একত্বের প্রতিষ্ঠা ও ব্যক্তি ঈশ্বরের প্রলয় শুরু হবে বলে আভাস পাওয়া যাচ্ছে বিভিন্ন স্বপ্নে।

* **মাটির প্রতিমা পূজা প্রসঙ্গে** —

"শ্রীম ঃ – মাটির প্রতিমাকে ভগবান বলে কী পূজা করা উচিত?

ঠাকুর ঃ – মাটি কেন গো, চিন্ময়ী প্রতিমা।"

শ্রীজীবনকৃষ্ণ বলেছেন – মাটির প্রতিমা হ'ল এই দেহ। অর্থাৎ বাইরের মাটির প্রতিমা ভগবান নয়। শ্রীরামকৃষ্ণও তাই বুঝতেন। তার প্রমাণ?

একদিন কথা হচ্ছিল – মূর্তি কে গড়েছে? একজন বলল, নবীন ভাস্কর। ঠাকুর অমনি বলে উঠলেন, আমি তা জানি না, আমি জানি মা আমার চিন্ময়ী। অর্থাৎ বাইরের নবীন ভাস্করের গড়া প্রতিমাকে উনি মা বলে পূজা করেন না – তিনি ভিতরে যে জ্যোতির্ময়ী কালী দেখেন তাকেই পূজা করেন।

* **শিবকালী তত্ত্ব ঃ**

কালী – দেহ।

শিব – আত্মা – ভগবান।

শিব শুয়ে আছে – দেহস্থ ভগবান সুপ্ত বা নিষ্ক্রিয় হয়ে আছেন। তার শক্তি নিয়ে দেহ ভোগে উন্মত্ত হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কিন্তু যখন শিবের গায়ে পা

ঠেকল – অর্থাৎ দেহ নিয়ে যখন ভগবানের অস্তিত্ব অনুভূত হল, দেহে সাড়া জাগল, তখন দেহ স্থির হয়ে গেল, চঞ্চলতা দূরে গেল। তখন ভগবৎ মাধুর্য আস্বাদন ছাড়া তার আর কিছুই ভাল লাগে না।

কালী লজ্জায় জিভ কাটে – এতদিন সে ভোগের পিছনে ছুটে নিজের প্রকৃত সম্পদ তার প্রাণশক্তিকে বৃথা কাজে বিনষ্ট করেছে জেনে নিজের নির্বুদ্ধিতার কথা ভেবে লজ্জায় জিভ কাটে।

কিন্তু **১ম** স্তরের সাধন যাদের তাদের ক্ষেত্রে– কালী (জৈবী দেহের চিন্ময় রূপ) সর্বজনীন ও সর্বকালীন হয়ে ওঠে। রামকৃষ্ণ ও জীবনকৃষ্ণ কালাতীত হয়েছেন। অসংখ্য মানুষ তাদের চিন্ময় রূপ ভিতরে দেখতে পায়। তারা মহাকালের বুকে পা রাখেন। মরণশীল দেহ নিয়েই অমরত্ব লাভ করেন। নিজেদের এই শক্তি প্রদর্শনে তারা ধরা পড়ে যাওয়ায় যেন লজ্জায় জিভ কাটেন।

* **অবতার বুদ্ধদেব ঃ**

অবতার বুদ্ধ যোগের একটি বিশেষ অবস্থা, বৌদ্ধ ধর্মের প্রবর্তক গৌতম বুদ্ধ নয়। ব্যষ্টির সাধন পূর্ণ হলে সাধক এই অবস্থা (বুদ্ধত্ব) লাভ করেন – তার জীবনে পরিস্ফুট হয় morality – নৈতিকতা – তিনি true moralist হন - - যিনি উপলব্ধি করেন, এক ঈশ্বরই এতগুলি মানুষ হয়েছেন। আমি আর জগতের মানুষ আত্মিকে এক। তখন যে morality-র বোধ জাগে তা দেশ, কাল, সম্প্রদায় দ্বারা প্রভাবিত হয় না। সেই concept of morality ধরেই বলা হয়েছে – moral life thus becomes universal. বুদ্ধ অবতারের পর তাই কল্কি অবতার – বিশ্বব্যাপিত্ব লাভ।

সাধারণভাবে আমরা morality বলতে যা বুঝি, বৌদ্ধ ধর্মের বুদ্ধদেব যার icon, তার সাথে এই morality-র পার্থক্য আছে। জীবনকৃষ্ণ যখন লণ্ডনে ছিলেন, তার সতীর্থরা তাকে বলতেন ম্যরালিস্ট। (moralist)

* **নৈতিকতার (morality) নিরিখে মানুষের স্তরভেদ ঃ**

নির্গুনের শক্তি পেলে মানুষের আত্মিক তেজ বাড়ে – সত্যকে আঁকড়ে ধরে থাকতে পারে। moral হয়।

যারা আত্মিক শক্তি লাভ করে নি তাদের কেউ কেউ moral হতেই পারে। moral হতে গেলে spiritual হতে হবে এমন নয়।

Moral-এর চারটি স্তর (Stage) আছে – 1) Perfect Moral, 2) True Moral 3) Pure Moral. এবং 4) Good moral। এরা যথাক্রমে Perfect, True, Pure ও Good man।

এ যুগে Perfect Man এর উদাহরণ – শ্রীজীবনকৃষ্ণ।

তাঁর সাথে যারা আত্মিক একত্ব লাভ করে তারা সত্যে প্রতিষ্ঠিত হয়। তারা True Man ও True Moral.

যারা শ্রীজীবনকৃষ্ণকে অন্তরে দর্শন করেন ও দেহমনে পবিত্র হয়ে ওঠেন তারা Pure Man ও Pure Moral হতে পারেন। জন্মগত সংস্কার থাকলে Spiritual না হয়েও বহু মানুষ moral হতে পারেন। তারা Good man এবং Good moral.

* **কথামৃত যোগীদের জন্য ঃ**

শ্রীজীবনকৃষ্ণ বুঝেছেন – কথামৃত যোগীদের জন্য, সাধারণ মানুষের জন্য নয়। তিনি কথামৃতের অমৃত প্রাণভরে পান করার পর সর্বসাধারণ যাতে তার আস্বাদন পেতে পারে, সেজন্য নিজেকে সবার মধ্যে দান করে তাদের দেহগুলি যোগযুক্ত করে দিলেন। আর তাই এখন আমরা কথামৃতের অমৃত পান করতে পারছি – তার মর্মার্থ অনুধাবন করতে সমর্থ হচ্ছি। ঠাকুরের কিছু বাণীর যোগাঙ্গ ‘ধর্ম ও অনুভূতি’ গ্রন্থে জানিয়েছেন শ্রীজীবনকৃষ্ণ। তার সাহায্যে আমরা ঠাকুরের অন্যান্য বাণীগুলিরও মর্মার্থ অনুধাবন করতে পারছি।

* **কেশবের ল্যাজ খসেছে :**

ল্যাজ খসলে ব্যাঙাচি ব্যাঙে পরিবর্তিত হয়। ব্যাঙ – মুক্ত পুরুষ – জলেও থাকতে পারে আবার ডাঙায়ও থাকতে পারে। সংসারেও থাকতে পারে – আবার সহস্রারে মন গিয়ে ঈশ্বর চিন্তায় মগ্ন থাকতে পারে।

একজনের (দেবরঞ্জনের) স্বপ্ন – একটা বড় ব্যাঙকে অনেকে মিলে কুড়ুলে করে কেটে খেল – আস্বাদন ঠিক মাছের মত। এই ব্যাঙটি হল মুক্ত পুরুষ – তিনি নিজেকে উৎসর্গ করলেন বলে জগতের মানুষ আত্মিক জগতের (মাছের) অমৃত আস্বাদন পেল।

এই ব্যাঙ লাফ দিয়ে ডাঙায় এল (যেমন রামকৃষ্ণ) — সেই ডাঙা মানে নিজের সহস্রার। সে কিন্তু শক্ত মাটি নয়। এটি ব্যষ্টির সাধন – এতে পূর্ণজ্ঞান বা ধারণা হয় না। "ব্রহ্মজ্ঞানকে আমার কোটি নমস্কার।" পরে আবার বড় লাফ দিয়ে শক্ত জমি পায় – বিশ্বব্যাপিত্ব লাভ হয়, বহু মানুষের সহস্রারে ঠাঁই পায় (যেমন জীবনকৃষ্ণ)। তারপর সে জলে ফিরে আসে আবার ডাঙায় যায় – জলের ব্যাঙাচিরা তাকে পরমাত্মীয় ভাবে ও তার পিঠে চড়ে – একত্ব লাভ হয়। তাদের পিঠে নিয়ে সে আবার ডাঙায় যায়। ব্যাঙাচিগুলোর অবিদ্যার লেজ খসে যায়। তারা ঐ ব্যাঙের সাথে ওতপ্রোত হয়ে জল ও ডাঙায় যাতায়াত করে ও পরম আনন্দ অনুভব করে। এর জন্য নিজেদের লাফ দেওয়ার প্রয়োজন হচ্ছে না। কেশবের লেজ খসেছিল — এই বৃহৎ ব্যাঙের কৃপায়, তার সান্নিধ্যে – তবে শ্রীরামকৃষ্ণের সাথে একত্ব না হওয়ায় ডাঙায় যেতে ও সেখানকার কথা বলতে পারেন নি। রামকৃষ্ণ সম্পর্কে তিনি যা বলেছেন তাও অনুমান।

* **জগৎ যেন একটি ঝাড় লণ্ঠন।**

ঝাড়টি যেন জগৎ। বাতিগুলি জীব। ঝাড়ের আলো না থাকলে চারিদিকে দেখা যায় না। এমনকি ঝাড়ও দেখা যায় না। প্রকৃতপক্ষে ঝাড়ের আলো জগৎচৈতন্য। একটি মানুষের মধ্যে জগৎচৈতন্য প্রকাশ পেলে তাকে কেন্দ্র করে বেশ কিছু মানুষের চৈতন্য জেগে ওঠে – তাতে সমগ্র মনুষ্য জাতির

কল্যাণ হয়। বহু মানুষের মধ্যে চৈতন্য না জাগলে জগৎ চৈতন্যের পরিচয় মেলে না – জগৎও আধ্যাত্মিক কল্যাণের পরশ পায় না।

* **মায়ের উপর জোর চলে বাপের উপর জোর চলে না — শ্রীরামকৃষ্ণ।**

মা – দেহ। বাপ – দেহস্থ চৈতন্য।

দেহকে জোর করে পাঠে আনা যায় – কিন্তু দেহস্থ চৈতন্য পাঠ শুনবে কিনা তার উপর আমাদের কোন হাত নেই। বাপ যদি প্রসন্ন হয়, দেহ থেকে দেহবুদ্ধি যায়, তখন এই দেহে চৈতন্যের দ্বারা চৈতন্যকে জানা সম্ভব হয়।

* **ভাবে থাকা, ভাবমুখে থাকা ও অভাবমুখ চৈতন্য :**

ভাবে থাকা – পঞ্চভাবের কোন একটি ভাব অবলম্বন করে (কল্পনা করে) থাকা – যেমন, মহাপ্রভুর রাধাভাব।

ভাবমুখে থাকা – ভাবমুখ চৈতন্য নিয়ে থাকা। শ্রীরামকৃষ্ণ অন্যের আধ্যাত্মিক অবস্থা জানতে পারতেন। তার কাছে কেউ এলে তাঁকে নিজের ভিতর দেখে কে বৈষ্ণব, কে তন্ত্রের সাধক, এসব জানতে পারতেন এবং তার ভাব বুঝে তার সাথে কথা বলতেন। একে বলে ভাবমুখ চৈতন্য। স্বামীজি বললেন, তুমি যা দেখ সব কল্পনা। তখন ঠাকুর কালী ঘরে গিয়ে মা কে বললেন, মা, আমার দর্শন কী সব মিথ্যা – কল্পনা? মা বললেন, তুই ভাবমুখে থাক। ..... এ কিন্তু, রাধা ভাব, সখী ভাব, দাস ভাবে থাকা নয় – ভাবমুখ চৈতন্য নিয়ে থাকা।

অভাবমুখে থাকা – শ্রীজীবনকৃষ্ণের ছিল অভাবমুখ চৈতন্য। তিনি অন্যের ভাব (প্রকৃতি) দর্শন করতেন না – নিজের দর্শনে ও অন্যের দর্শনে যা সত্য জেনেছেন – তা বলতেন পাত্র নির্বিশেষে সকলের কাছে।

* **ভীষ্ম ও কর্ণ চরিত্র :**

শরশয্যায় শায়িত ভীষ্মের কাছে যুধিষ্ঠির উপদেশ নিতে গেলে তিনি যা বলেছিলেন তার একটি হল – তিনি প্রতিজ্ঞা পালনকেই জীবনের শ্রেষ্ঠ ধর্ম

ভেবেছিলেন। আর তা করতে গিয়ে জেনে বুঝেও সত্য ও ন্যায়ের বিরুদ্ধাচরণ করতে হয়েছে। এ ভুল যেন কখনও যুধিষ্ঠির না করেন।

আমরা জিদ বজায় রাখতে গিয়ে অনেক সময় যা করা উচিত তার ঠিক উল্টো করি। জিদ বজায় নয়, সত্যকে গ্রহণ করা, বরণ করার জন্য সর্বস্ব পণ করা উচিত।

ভীষ্ম জ্ঞানী ছিলেন, অষ্টবসুর এক বসু। বসু মানে যে বাস করায় বা বাস করতে সাহায্য করে। অর্থাৎ অন্তরঙ্গ ভক্ত। কেননা ভক্ত না থাকলে ভগবান (অবতার) থাকতে পারেন না। ঠাকুর বলেছেন – "মা, কেশবকে বাঁচিয়ে রাখ, নইলে কলকাতা গেলে কার সাথে কথা কব!" সাধন শেষ হলে কুঠির ছাদে উঠে সন্ধ্যারতির সময় চিৎকার করে কেঁদে কেঁদে বলতেন, "ওরে তোরা কে কোথায় আছিস, চলে আয়। আমি যে আর থাকতে পারছি না।" এইভাবে ঠাকুর তার অন্তরঙ্গ ভক্তদের আহ্বান করতেন।

শ্রীরাধার ছিল অষ্টসখী – তিনি তাদের সাথে কৃষ্ণমিলনের অভিজ্ঞতা বলে অহরহ কৃষ্ণমিলনের আনন্দ পেতেন ও সখীরাও কৃষ্ণপ্রেমে অভিষিক্ত হত। রানী রাসমণি মারা যাবার সময় ঠাকুর বলেছিলেন, 'ও অষ্টসখীর এক সখী'।

ভীষ্ম এতবড় আধার হওয়া সত্ত্বেও, কৃষ্ণকে ভগবান বলে চিনতে পারা সত্ত্বেও প্রতিজ্ঞা বজায় রাখতে দুর্যোধনের পক্ষ অবলম্বন করলেন – কৃষ্ণের সঙ্গ করা হল না।

কর্ণ চরিত্রেও আমরা দেখতে পাই প্রতিজ্ঞা পালনকেই বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। দানবীরের খ্যাতি পেতে ইন্দ্র তাকে শক্তিহীন করতে চাইছে বুঝতে পেরেও কর্ণ তাকে কবচকুণ্ডল দান করে দিলেন। দুর্যোধন বিপথগামী জেনেও তাকে একদিন রাজার সম্মান দান করায়, অঙ্গরাজ্য দান করায়, কর্ণ কৃতজ্ঞতা বশে চিরকাল তার পক্ষে থাকার শপথ করেছিলেন ও তা শেষ পর্যন্ত রক্ষা করেছিলেন।

কর্ণের প্রতিজ্ঞা ছিল ব্যক্তিস্বার্থে আর ভীষ্মের ছিল পিতার সুখের জন্য ও বংশের মান রক্ষার জন্য। এরা কেউই ব্যক্তিস্বার্থ ও পারিবারিক স্বার্থের

ঊর্ধ্বে উঠতে পারেন নি।

কর্ণ সকল সুতপুত্রদের উন্নতির জন্য, তাদের সম্মান বৃদ্ধির জন্য কিছু ভাবেন নি। অর্জুনের খ্যাতির প্রতি ঈর্ষা ও ব্যক্তিগত অহমিকা তাকে দুর্যোধনের প্রতি অন্ধ আনুগত্যে প্ররোচিত করেছিল।

সুতপুত্ররা ছিল শ্রুতিধর – তারা রাজাদের মহিমা কীর্তন করত। কর্ণ তাদের প্রতিনিধি। দেহতত্ত্বে এর অর্থ – যারা কানে একবার শুনেই ঈশ্বরীয় কথা, শাস্ত্রের কথা মনে রাখতে পারে এবং সুন্দরভাবে তা অন্যের সমক্ষে উপস্থাপন করে ও লোকের প্রশংসা পায় – তারাই সুতপুত্র।

কিন্তু এদের ঈশ্বরতত্ত্ব ধারণা হয় না – তার প্রমাণ মেলে বাস্তবে তাদের ব্যক্তিজীবনে বিপর্যয়ের কালে। তখন শাস্ত্রের কথা মনে পড়ে না। অন্যকে একথা বলা সহজ যে, "সুখেষু বিগতস্পৃহ দুঃখেষু অনুদ্বিগ্নমনা" – ইত্যাদি। কিন্তু ঐ বক্তাই প্রিয়জনের বিয়োগ ব্যথায় দুঃখে ভেঙ্গে পড়েন। তখন ভিতর থেকে জ্ঞানের কথা জোগায় না – শাস্ত্রের বাক্যবান সমূহ তার জীবনে কার্যকর হয় না। জীবন রথের চাকা বসে যায়, গতি হারায়, তিনি আর নির্লিপ্ত থাকতে পারেন না।

*** ছুঁচে সুতো পরানো ঃ**

ঠাকুর বললেন – 'সূতোয় একটুও রোঁয়া থাকলে ছুঁচের ভিতর যায় না।' একটুও অহংকার থাকলে আত্মা সাক্ষাৎকার হয় না। ষষ্ঠভূমি অতিক্রম করে মন সপ্তম ভূমিতে এলে আত্মা সাক্ষাৎকার হয়। ছুঁচের ভিতর সুতো পরানো হয়। পরে ঐ মানুষ তার চিন্ময় রূপের দ্বারা মানুষের সঙ্গে মানুষকে এক সূত্রে গাঁথেন বা একত্ব স্থাপন করেন। এ জিনিস একযুগে একজনের হয় – যার প্রথম স্তরের সাধন।

দ্বিতীয় স্তরের সাধন যাদের অর্থাৎ সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে ভগবৎ কৃপায় ছুঁচের ফুটো বড় হয়ে যায় – অহং থাকা সত্ত্বেও তাদের brain capacity বাড়ে এবং একের সাথে একত্ব লাভ করে এককে, অখণ্ড চৈতন্যকে (সর্বজনীন মানুষের রূপে যা প্রকাশ পায়) ধারনা করতে পারে ও অন্যের সাথে

আত্মিক ঐক্য ও সমানত্ব (unity and equality) অনুভবে সমর্থ হয় – ধর্ম লাভ হয়। আমাদের ক্ষেত্রে ছুঁচে সুতো পরানো মানে জীবনকৃষ্ণকে ভিতরে দেখে তার golden brain লাভ করা, এক ও একত্বের ধারনা লাভে সমর্থ হওয়া।

* **শিলখেকো আম ঃ**

'মানুষ কখনও গুরু হতে পারে না। সচ্চিদানন্দই গুরু। হেলে সাপের পাল্লায় পড়লে সাপটারও যন্ত্রণা, ব্যাঙটারও যন্ত্রনা। শিলখেকো আম ঠাকুরকে দেওয়া যায় না, নিজে খেতেও সন্দেহ হয়' — শ্রীরামকৃষ্ণ।

শিলখেকো আম – যে মানুষগুরুর কাছে দীক্ষা (মন্ত্র) নিয়েছে। তার আত্মা বা ভগবান দর্শন হবে না – defective realisation হয়ে যায়। বড়জোর ইষ্টমূর্তি দর্শন হয়। এতে সংশয় যায় না। তবে সচ্চিদানন্দ গুরু লাভ হলে ভগবান দর্শন হতে পারে ও মানুষ নিঃসংশয় হয়।

ঠাকুরকে দেওয়া যায় না – মানে ঐ ব্যক্তি ঠাকুরের কাজে লাগে না। তার মাধ্যমে ভগবান লোকশিক্ষা দেন না।

* **স্থান মাহাত্ম্য ঃ**

১৯২৬ সালে শ্রীজীবনকৃষ্ণ প্রথম কাশী যান। কাশীতে সব সময় তার আপনা হতে জপ হচ্ছিল। অহল্যা বাঈ ঘাটে বসে বেশ ধ্যান হয়েছিল। ওনার মনে হয়েছিল স্থান মাহাত্ম্য আছে।

বহু পরে তিনি বুঝেছিলেন এই ব্যাখ্যা ঠিক নয়। তাই ঠাকুর অনেককে পঞ্চবটী দেখতে যেতে বলায় জীবনকৃষ্ণ তার সমালোচনা করেছেন। বলেছেন, এতে মন বহির্মুখী হবে। ঠাকুরের বলা উচিত ছিল প্রকৃত পঞ্চবটী কি? ইড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্না, চিত্রা ও বজ্রানী – এই পাঁচটি নাড়ী ঊর্ধ্বগামী হয়েছে যে মূলাধার থেকে তাই পঞ্চবটী।

আবার বলেছেন – "আমার এই বিছানাটা – আমি বলি সহস্রার।"

স্থান মাহাত্ম্য শুধু নয়, স্মৃতিচারণ দ্রব্যের মাহাত্ম্যও কেটে দিয়ে যাচ্ছেন।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায়, একবার মৌদ্‌গল্যায়নের দাঁত নিয়ে বৌদ্ধরা কলকাতায় এনে শোভাযাত্রা করল, সেই সংবাদ শুনে শ্রীজীবনকৃষ্ণ বললেন - - আমাকে যদি কেউ ঠাকুরের দাঁত এনে দিত তাহলে হাওড়ার পুল দিয়ে পেরোবার সময় দাঁতটা টুক করে গঙ্গায় ফেলে দিতুম।

* **চণ্ডী ও গীতা প্রসঙ্গে শ্রীজীবনকৃষ্ণ ঃ**

শ্রীজীবনকৃষ্ণ বলেছেন – একদিন যোগাদ্যানের অনুষ্ঠানে যাবার কথা ছিল কিন্তু জ্বর হয়ে যাওয়ায় আর যাওয়া হয়নি। সেদিন চণ্ডী পুরোটা পড়েছিলেন। ভাল লেগেছিল। অট্টঅট্ট হাসিতে টকটক করে অসুর নিধনের কাহিনীর মধ্যে যোগের কথা আছে বুঝেছিলেন।

অন্য একসময় একদিন গীতা পড়তে চেষ্টা করেন। কিছুটা পড়ে আর পড়তে পারেননি। ভাল লাগেনি।

সত্যিই কি গীতার মধ্যে যোগের কথা কিছু নেই আর চণ্ডী যোগের কথায় ভরা?

তা কিন্তু নয়। ঐ সময় জীবনকৃষ্ণের যা আত্মিক অবস্থা তাতে চণ্ডীটা বুঝতে পেরেছিলেন। রামকৃষ্ণের ঐ কথা, গীতা সবটা পড়ার দরকার নেই শুনে গীতার উপর ওনার আকর্ষণ কমে গিয়েছিল। তাছাড়া গীতায় একরস, উপরমন ইত্যাদি বহু কথা আছে যেসব অবস্থা তার দেহে তখনও পর্যন্ত ফোটেনি। কেউ বলেন গীতায় বহু বিরুদ্ধ তত্ত্বের সমাবেশ আছে। তা হোক, রামকৃষ্ণ কথামৃতেও তো বহু স্ববিরোধিতা আছে। উনি তো সঠিকটা বেছে নিচ্ছেন। পরবর্তীকালে গীতা পড়লেও জীবনকৃষ্ণ বেছে বেছে ঠিক কথাগুলো নিতেন – পুরো গীতাকে discard করতেন না বলেই মনে হয়।

* **অনন্তকে জানার দরকারই বা কী ?**

ঠাকুরের এই কথার ব্যাখ্যায় ঠাকুরেরই কথা উদ্ধৃত করে জীবনকৃষ্ণ লিখলেন, "গঙ্গাস্নান করতে হলে গঙ্গোত্রী থেকে গঙ্গাসাগর পর্যন্ত ভাসতে ভাসতে আসতে হবে তা নয় – যে কোন এক জায়গায় স্নান করলেই হবে।"

এই ব্যাখ্যাও তো ঠাকুরের উপমা – এ তো দেহতত্ত্বের ব্যাখ্যা হল না। বাইরের গঙ্গায় স্নান করলে তো অনন্তকে জানা হয় না।

জ্ঞানগঙ্গায় স্নান করতে হবে। ঈশ্বরকে জানার নাম জ্ঞান। ঠাকুর বলতে চাইছেন, এ যুগে তাঁর মধ্যে ঈশ্বরের সর্বোচ্চ প্রকাশ। সুতরাং পূর্ববর্তী বহু আচার্য বা অবতারকে না ধরে শুধু তাকে ধরেই অনন্ত ঈশ্বরকে জানা সম্ভব এবং তা সহজও হবে। জগতে প্রথম জ্ঞানবৃক্ষের ফল খেয়েছেন শ্রীরামকৃষ্ণ (তানিয়া রহমানের স্বপ্ন) – তিনিই প্রথম অঙ্গুষ্ঠবৎ আত্মা সাক্ষাৎকার করেছেন। তাঁর মধ্যে দিয়ে জ্ঞান-গঙ্গায় স্নান করার সুযোগ ঘটল মানুষের। কিন্তু এ তো গঙ্গার পার্বত্যগতির সাথে তুলনীয়। সব মানুষের পক্ষে সেখানে স্নান করা সম্ভব হল না। মুষ্টিমেয় কয়েক জন সে সুযোগ পেল। পরবর্তীকালে এলেন জীবনকৃষ্ণ - - ষোল আনা আত্মা সাক্ষাৎকার হল তার – তারপর সর্বজনীন হয়ে মানুষের অন্তরে ফুটে উঠে মানুষকে তাঁর চৈতন্যের প্রবাহে স্নানের সুযোগ করে দিচ্ছেন। মানুষ অনন্ত ঈশ্বরকে তাঁর ভিতর দিয়েই জানতে পারছে। যদিও গঙ্গার সম্যক পরিচয় পেতে হলে সম্মিলিতভাবে নিরন্তর অনুশীলনে যুক্ত থাকতে হবে, যে অনুশীলনের ধারা দেখিয়ে গেছেন শ্রীজীবনকৃষ্ণ যার মূলমন্ত্র হল চরৈবেতি। শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীজীবনকৃষ্ণের দেহাবসানের পর বর্তমানে মানুষ পাঠচক্ররূপ ঘাটে এসে এক অখণ্ড চৈতন্যের প্রবাহে স্নানের সুযোগ পাচ্ছে। তবে একটি কথা আছে – ঠাকুর বলেছেন, গঙ্গাস্নানের পর গঙ্গার তীরে থাকা পাপগুলো আবার ঘাড়ে চাপে। দ্বৈতবাদে ব্রহ্মবিদ্যার চর্চায় পাপমুক্ত অবস্থা স্থায়ী হয় না। তাই গঙ্গা যেখানে সাগরে পড়েছে – ব্রহ্মবিদ্যার কথা যেখানে একত্বের সাগরে গিয়ে মিলেছে – সেই একত্বের চর্চায় ও একত্বলাভে স্থায়ী পবিত্রতা লাভ হয় ও অনন্তকে জানা যায়।

* **মায়া কী ?**

মায়া মানে মিথ্যা – নিষ্ঠুর বাস্তব জগৎ-ই মায়া – অনিত্য বলে তাকে মায়া বলা হয়। ঈশ্বর চিরন্তন – তাই সত্য।

এই মায়াও ঈশ্বরের রূপ – রামেরই ভুবন-মোহিনী মায়া। মায়া প্রসন্ন

হলে প্রথমত দেহ, পরে জগৎ অনুকূলে আসে ও মানুষ ভগবৎ চর্চায় মগ্ন থাকতে পারে। অন্যথায় দেহ ও মনকে অশান্ত করে ভোগের জগতে নানা কাজে লিপ্ত করে। ঈশ্বরচর্চায় ব্যাঘাত ঘটে।

Maya declares her existance as real – নয়। শ্রীজীবনকৃষ্ণ লিখছেন – Maya declares her existance in reality – অর্থাৎ বাস্তব জগতের ক্রিয়াকর্মে মায়ার প্রকাশ। এক অখণ্ড অদ্বৈত সত্তা মায়ার দ্বারা বহুতে পরিণত হল, এই মায়ার অর্থ স্বামীজির ভাষায় – "statement of fact". শংকরাচার্য ব্রহ্মসূত্র ভাষ্যে বলেছেন – "নৈসর্গিক অয়ং লোক ব্যবহারঃ" – লোকের ব্যবহারের স্বাভাবিক প্রকাশ হল মায়া।

এই মায়াধীন জীব সুখ দুঃখ দ্বারা অভিভূত, জন্ম মৃত্যুর মধ্যে আন্দোলিত, জরা ব্যাধির দ্বারা পীড়িত।

এক অর্থে মায়া হল এই দেহ। যে দেহে মায়াধীশ ঈশ্বরের প্রকাশ ঘটে তিনি ঊর্ধ্বরেতা হন, দেহ ও আত্মা পৃথক – এই অনুভূতি হয় – অবশেষে বিদেহমুক্ত হয়ে তাঁর আত্মা বা চৈতন্যসত্তা মনুষ্যজাতির মধ্যে ঠাঁই নেয় – তিনি যে সুখ দুঃখ, জন্ম মৃত্যু, জরা ব্যাধির ঊর্ধ্বে এক শাশ্বত সত্তা তার প্রমাণ দেয় মনুষ্যজাতি। এই অন্তরস্থিত মায়ামুক্ত পুরুষের স্মরণ মননে আমরা সংসারে নির্লিপ্ত হয়ে ঈশ্বরীয় আনন্দ লাভের সুযোগ পাই।

* **জীবনকৃষ্ণের একটি দর্শন ঃ**

১৯৫৮ সালের ১লা জানুয়ারী শ্রীজীবনকৃষ্ণ দেখলেন – ওনার বন্ধু অমূল্য বাবুর মেয়ে বিধবা হয়েছে। তাকে দেখিয়ে অমূল্যবাবু বললেন, এবার ওর সুখের দিন গিয়ে দুঃখের দিন এল। এর অর্থ করলেন – ওনার অবস্থার পরিবর্তন আসছে, সুসময় আসছে। কেননা dream goes by contrary, স্বপ্নের অর্থ হয় বিপরীত দিক থেকে। বাস্তবিক এ মাসের শেষ সপ্তাহ থেকে নির্জন বাস শেষ হয়ে ভক্তসঙ্গ শুরু হল এবং তাঁকে মানুষ এবার ভগবান রূপে দেখতে লাগল, আর সচ্চিদানন্দগুরু রূপে নয়।

* **বৈষ্ণব অপরাধ ঃ**

এতদিন ধারনা ছিল, বৈষ্ণব অর্থাৎ ভক্তের নিন্দা করলে, তাদের অপমান, শারীরিক পীড়ন বা সাধনায় ব্যাঘাত ঘটালে বৈষ্ণব অপরাধ হয়। সব অপরাধের ক্ষমা আছে কিন্তু বৈষ্ণব অপরাধের ক্ষমা নেই। এখন আমরা বুঝছি – সত্য জানার পর, সত্য-স্বরূপ উপলব্ধির পর একত্বের চর্চা থেকে বিচ্যুত হয়ে বিকৃতসাধনে লিপ্ত হলে, মিথ্যাচারের সংস্কারে ডুব দিলে বৈষ্ণব অপরাধ হয় – আধার ছোট হয়ে যায়।

পঞ্চানন মণ্ডলের একটি প্রাসঙ্গিক স্বপ্ন – দ্রষ্টার সাথে সহজিয়া সাধন করতে রাজী হল ওর বোন দেবলা। তখন দীপ এসে বলল, তোমার এতে বৈষ্ণব অপরাধ হবে – আধার ছোট হয়ে যাবে।

* **মনেতেই বদ্ধ মনেতেই মুক্ত — শ্রীরামকৃষ্ণ**

'মনেতেই বদ্ধ মনেতেই মুক্ত। জোর করে বিষ নাই বললে বিষ ছেড়ে যায়।' এসব অবাস্তব কথা। কিন্তু ধর্ম জগতে একথা চরম সত্য হয়ে উঠল ঠাকুরের ভগবান দর্শনের পর। আত্মা বা ভগবান এক। তিনি ঠাকুরের দেহ থেকে মুক্ত হয়ে ঠাকুরকে দেখা দিয়েছেন। তাই জগতের সব লোকই মুক্ত। তারা তা জানে না। "তুমি জান বা না জান তুমি রাম।" তাই মনে জোর আনতে বলছেন। তিনি জানেন ঢোঁড়া সাপে কামড়েছে। বিষ নাই। তবু লোকে ভয় পাচ্ছে। ভাবছে – তারা সংসারী বদ্ধজীব, যন্ত্রণা ভোগই তাদের ভবিতব্য, মুক্তিলাভ তথা অমৃতত্ব আস্বাদন তাদের পক্ষে সম্ভব নয়।

শ্রীজীবনকৃষ্ণের ষোল আনা আত্মা সাক্ষাৎকার হল – তিনি সর্বজনীন হলেন ফলে মুক্তি প্রমাণ সাপেক্ষে সর্বজনীন হল – সবার মুক্তির দ্বার খুলে গেল। আর তারা যে মুক্ত তা অনুভব করতে পারল জীবনকৃষ্ণের রূপে মুক্ত আত্মাকে দেখে।

রামকৃষ্ণের যুগে মানুষ এই প্রমাণ পায়নি। তাই ঠাকুর সবার মনে সাহস জোগাতে ঐসব কথা বলছেন।

* **ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণম্ উদচ্যতে**
পূর্ণস্য পূর্ণম্ আদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে॥

ইহা (নির্গুন ব্রহ্ম) পূর্ণ, উহাও (সগুন ব্রহ্ম) পূর্ণ। পূর্ণ থেকে পূর্ণই আসে। পূর্ণ থেকে পূর্ণ এলে পূর্ণই অবশিষ্ট থাকে।

পিতার দেহের নির্গুণ ব্রহ্ম থেকে পুত্রের জন্ম। পুত্রের দেহে পূর্ণভাবে সগুন ব্রহ্মের বিকাশ হলে নির্গুণের দরজা খুলে যায় এবং স্বরূপত সে যে নির্গুন ব্রহ্ম তা জানতে পারে। জগৎ প্রতি মুহূর্তে মানুষের সেই অনন্ত সম্ভাবনা (নির্গুন ব্রহ্মে পরিবর্তিত হওয়া)-কে নষ্ট করতে সচেষ্ট। তাই মানুষ তার স্বরূপ বিস্মৃত হয়ে থাকে।

একজন মানুষ স্বরূপ ফিরে পেলে (ব্রহ্মত্ব লাভ করলে) তিনি জগৎব্যাপ্ত হন, সর্বজনীন ও সর্বকালীন হন। তখন এই সত্য জানা যায় যে সমগ্র মনুষ্যজাতি ব্যাপ্ত হয়ে এক আত্মা বা ব্রহ্ম (নির্গুন) আছে। ব্যক্তি মানবের মৃত্যু হলেও মনুষ্যজাতি থেকে যায়, সুতরাং আত্মার পূর্ণত্ব বজায় থাকে। যেহেতু মনুষ্যজাতি শাশ্বত তাই আত্মাও অমর।

* **দুর্গাপূজা – অন্য চোখে ঃ**

বাঙালীর শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গাপূজা। সাধারণ মানুষ উৎসবের আনন্দে মাতলেও এর প্রতীকার্থ ভেদ করে পূজার মর্মার্থটি জানার চেষ্টা করে না। এখানে নতুন দৃষ্টিভঙ্গিতে দুর্গাপূজার মূল বক্তব্য বোঝার চেষ্টা করা হল।

১। সপ্তমীতে নবপত্রিকার স্নান ও পূজা – সমগ্র প্রকৃতিকে এক দেবী রূপে কল্পনা করে আরাধনা। এই নবপত্রিকা আসলে আদিবাসীদের প্রকৃতিদেবী জাহের এরার নতুন রূপে অভিষেক। ইনি বৃক্ষ, ফল–মূল ও খাদ্য শস্যের দেবী। তাই দুর্গার এক নাম শাকম্ভরী। এখানে ব্যবহৃত গাছগুলির মধ্যে কলা – ব্রহ্মানির, কচু–কালিকার, হলুদ–দুর্গার, জয়ন্তী–কৌমারীর, বিল্ব–শিবার, ডালিম––রক্তদন্তিকার, অশোক–শোক রহিতার, মানকচু–চামুণ্ডার এবং ধান–লক্ষ্মীর প্রতীক।

২। অষ্টমীতে কুমারী পূজা – জাহের এরা দেবী দ্রাবিড়দের ভাবনায়

কুমারী মাতার রূপ পেল। কন্যা কুমারীর পূজা চালু হল। সিন্ধু সভ্যতার এক সীলমোহরে উর্ধ্বপদ হেঁট মুণ্ড নগ্ন কুমারী মায়ের মূর্তির চিত্র পাওয়া গেছে যার জরায়ু থেকে নির্গত হচ্ছে একটি শস্য পল্লব। এতে স্পষ্ট বোঝা যায় যে তাদের পূজিতা কুমারী মাতা শস্যদায়িনী।

দ্রাবিড়রা (এখন আরও অনেকে) মহালয়ার পর প্রতিপদ থেকে নবমী পর্যন্ত নয়টি তিথিতে কুমারী মায়ের নয়টি রূপের পূজা করেন। তাই স্বামীজি ১৯০১ সালে বেলুড়ে প্রথম দুর্গাপূজা অনুষ্ঠান কালে নয় জন কুমারীর পূজা করেছিলেন। আর দুর্গার এই নয় রূপের ভাবনার প্রভাব পড়েছে নব পত্রিকায়। সেখানে তাই নয়টি গাছ নেওয়া হয় যার প্রত্যেকটি এক একটি দেবী রূপের কথা স্মরণ করায়। যদিও নবদুর্গার নয়টি রূপ ও নব পত্রিকায় আধারিত দুর্গার নয়টি রূপ সম্পূর্ণ পৃথক। নবদুর্গা হলেন – ১) শৈলপুত্রী, ২) ব্রহ্মচারিনী, ৩) চন্দ্রঘণ্টা, ৪) কুষ্মাণ্ডা, ৫) স্কন্দমাতা, ৬) কাত্যায়নী, ৭) কালরাত্রি, ৮) মহাগৌরী ও ৯) সিদ্ধিদাত্রী।

কুমারী মাতার পূজা যে বৈদিক বা ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি নয়, এটি বিশুদ্ধ দ্রাবিড়ি কৃষ্টি (প্রাচীন রীতি) তার প্রমাণ হল নবরাত্রি পূজা মেয়েরাই করে, ব্রাহ্মণ পুরোহিতের প্রয়োজন হয় না।

৩। সন্ধি পূজা – অষ্টমীর শেষ ২৪ মি. ও নবমীর প্রথম ২৪ মি. নিয়ে ৪৮ মি. সময়কে সন্ধিকাল বলা হয়। এই সময় হয় সন্ধি পূজা। ২৪ মিনিটে হয় ১ দণ্ড (সময়ের একক)। সন্ধিকাল হল কুমারী মাতার পূজার শেষ পর্বকাল ও তাঁকে পরমা প্রকৃতি তথা অখণ্ড চৈতন্য রূপে উপলব্ধির মধ্যবর্তী যোগসাধনার পর্বকাল। এইপর্বে কুমারী মাতা হয়ে ওঠেন দেবতা শিবের ঘরনী।

আদিবাসীদের প্রকৃতিদেবী জাহের এরা ও জীবসকলকে বশ মানানোর পুরুষ দেবতা মারাংবুরু যথাক্রমে কুমারী মাতা ও পশুপতির রূপ লাভ করেন দ্রাবিড়দের চিন্তায়। পরবর্তীকালে তান্ত্রিক ও যোগীদের মধ্যে প্রকৃতি ও পুরুষের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ উপলব্ধি হয়। তাদের কাছে পশুপতি হন ভিতরের পশুত্ব দমনকারী মহাযোগী শিব এবং কুমারী মাতা হন তার ঘরনী – দেবী কৌশিকী বা চণ্ডী। চণ্ডী বা চামুণ্ডার উদ্ভব এই বাংলায়। গ্রামে গ্রামে চণ্ডী মণ্ডপের উপস্থিতি ও

গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন এর সাক্ষ্য বহন করে। কৃষ্ণবর্ণা চণ্ডী ও গাঁজা ভাং খাওয়া ভূত প্রেতাদি অনুচরসহ শ্মশানবাসী যোগীরাজ শিব অনার্য দেবতা রূপে গণ্য হয়। তাই পুরানে আছে দক্ষের যজ্ঞে তিনি আমন্ত্রণ পান নি।

সন্ধি পূজায় চণ্ডীরূপেই দুর্গার পূজা হয়। চণ্ডীর বিশেষত্ব হল মহিষাসুরের দুই সেনাপতি শুম্ভ ও নিশুম্ভের অনুচর চণ্ড ও মুণ্ড পিছন দিক থেকে দেবী চণ্ডীকে আক্রমণ করলে তিনি তার ললাট হতে বিচ্ছুরিত জ্যোতি থেকে চামুণ্ডা দেবীকে সৃষ্টি করেন ও এই দেবী তাদের মুণ্ডচ্ছেদ করেন।

তন্ত্রে আজ্ঞাচক্রে (ভ্রুমধ্যে, ললাটে) ইষ্টমূর্তি দর্শনে জীবত্ব প্রশমিত হওয়ার উপর জোর দেওয়া হয়। দেবী চণ্ডী যেন পিছন দিকেও দেখতে পান। এটি যোগীদের কথা – তারা বলেন, যোগ সাধনায় বহির্মুখী মন অন্তর্মুখী হয়। এই সময় যোগী এক দর্শনে নিজের পিঠ দেখতে পান। বোঝা যায় তার মন অন্তর্মুখী হয়েছে। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন, “মা আমার মুখ বাঁকিয়ে দিয়েছে।”

যোগ সাধনার গুরুত্বপূর্ণ শাস্ত্র সাংখ্য দর্শনে প্রকৃতি ও পুরুষ – এই দুইয়েরই অস্তিত্ব স্বীকার করা হয়েছে। আরও বলা হয়েছে পুরুষের যোগে প্রকৃতি ক্রিয়াশীল। অর্থাৎ পুরুষ ও প্রকৃতি তথা আত্মা ও দেহ ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত, এখন নারী দেবতা ও পুরুষ দেবতার সন্ধি স্থাপিত হল।

৪। নবমীর দুর্গা পূজা – অখণ্ড চৈতন্য রূপে দুর্গার পূজা। এই পর্বে দুর্গা ভাবনায় বৈদিক কৃষ্টির প্রভাব প্রকট হল। চণ্ডী হলেন গৌরী – দুর্গা। অতঃপর প্রকৃতি ও পুরুষ হলেন এক লগ্না। তাই দুর্গাকে পৈতে পরিয়ে বোঝানো হল ইনি নারীও বটে পুরুষও বটে। ইনি পরম এক – সত্যমূর্তি। বেদ বলছে - - “একং সৎ”, “স একঃ”। আত্মিক জগতে তিনি একাই আছেন – তিনি সকলের আত্মিক শক্তির সমষ্টি – sum total of all individuals. তাই দুর্গাপূজায় শিবের উপস্থিতি নেই। এদিকে বৈদিক ভাবনায় অনার্য দেবতা শিবের রূপান্তর ঘটল, আর্যীকরণ ঘটে তিনি হলেন – শান্তম্ শিবম্ অদ্বৈতম্।

এই আর্য দেবতা শিব ঐক্য স্থাপন করেন। তিনি পরম এক – অর্ধনারীশ্বর। এই পর্বে জানা গেল প্রকৃতি ও পুরুষ অভেদ – আদ্যাশক্তি ও ব্রহ্ম অভেদ। লক্ষী, সরস্বতী, কার্তিক, গণেশ হলেন দুর্গা তথা আত্মার ক্রম

বিকাশের (unfoldment-এর) এক একটি ধাপ।

বাংলায় যে দুর্গাপূজা চলছে তা আসলে চণ্ডী পূজা। বৈদিক কৃষ্টি প্রথম ফুটল শ্রীরামকৃষ্ণের দেহে। তিনি বেদমতে অঙ্গুষ্ঠবৎ আত্মা বা ব্রহ্ম তথা অখণ্ড চৈতন্যকে দেহে ধারণ করলেন। হল ঠিক ঠিক নবমী পূজা। ভাগ্নে হৃদয়বাবু পরপর তিন বছর নিজের গ্রামে দুর্গা পুজো করলেন। ঠাকুর মথুর বাবুকে বলে তাকে সাহায্য করলেন। কিন্তু চতুর্থ বছর বললেন, আর পুজো করতে হবে না। মথুর বাবুকে সাহায্য করতে বলতে পারব না। হৃদয়বাবু বললেন, তাহলে কী করব? ঠাকুর একটি বেল পাতায় তিন বার 'চণ্ডী' নামটি লিখে দিলেন। বললেন, মায়ের এই নাম করবি তাহলেই পুজো হয়ে যাবে। লক্ষ্যনীয়, ঠাকুর দুর্গা না লিখে লিখলেন 'চণ্ডী' নাম। ঠাকুরের জীবনেই চণ্ডীপূজার পর প্রথম হল প্রকৃত দুর্গা পুজো। ষোল আনা আত্মা বা ভগবান দর্শন করলে দুর্গাকে লাভ হয় - দুঃখ দূরে যায়। আনন্দময় পুরুষ হয়ে যায় সাধক। ঠাকুরের আনন্দময় সত্তার সাক্ষ্য দিয়েছেন অনেকে।

i) অশ্বিনী দত্ত বললেন, বরিশালে অচলানন্দ অবধূত শাস্ত্রজ্ঞ হতে পারেন কিন্তু আপনার কাছে ভারী মজা - এত আনন্দ সেখানে গেলে হয় না।

ii) শোকাতুরা এক ব্রাহ্মনী - ঠাকুর তার ঘরে গেলে আনন্দে অস্থির হয়ে বলছেন, ওরে তোরা আমায় আশীর্বাদ কর না হলে আমার এত আনন্দ হচ্ছে যে আমি মরে যাব। আমার মেয়ের রাজা জামাই যখন লোকলস্কর নিয়ে আসত তখনও তো এত আনন্দ হয় নাই।

iii) শ্রীম - কী সুন্দর মানুষ। কী সুন্দর কথা। এখানে সব আনন্দ দিয়ে গড়া।

অধর সেন, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ইত্যাদি আরও অনেকেই এরূপ কথা বলেছেন।

৫। বিজয়া দশমী - অখণ্ড চৈতন্যের উপলব্ধি ঠিক ঠিক হলে সাধক "তদাকারকারিত" হন - ব্রহ্মের সত্তা লাভে অনন্ত হয়ে ওঠেন - ব্যক্তিসীমা ছাড়িয়ে সর্বজনীন মানব হয়ে ওঠেন। বেদের কথায় "স্কেন রূপেন অভিনিষ্পদ্যতে" হয় - অর্থাৎ তার চিন্ময় রূপ জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে বহু মানুষের অন্তরে ফুটে

ওঠে ও আত্মিক অভিন্নতা উপলব্ধি হয় - ভেদবুদ্ধির আসুরিক শক্তি বিনাশ প্রাপ্ত হয় - দশেরা তথা রাম কর্তৃক রাবণ বধ হয়। দশানন অর্থাৎ বহুরূপতার মায়া থাকে না - উপলব্ধি হয় রাম-ই আছে - একজনই আছে আত্মিক জগতে। সত্য প্রকাশ পায় - পাণ্ডবদের অজ্ঞাতবাস পর্ব শেষে স্বরূপ প্রকাশ পায় এই দিনে। এক কথায় ভেদ-বুদ্ধির বিরুদ্ধে একত্ব শক্তির তথা বিজয়া শক্তির মহিমা স্মরণ পর্বই হল বিজয়া দশমী। সর্বজনীন মানব শ্রীজীবনকৃষ্ণের দেহে চণ্ডীপূজা (ইষ্টমূর্তি দর্শন) ও নবমীর দুর্গা পূজা (আত্মা সাক্ষাৎকার) শেষে বিজয়া দশমীর তাৎপর্য ফুটে উঠল - তাঁর রূপ ফুটে উঠছে জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে বহু মানুষের অন্তরে। চণ্ডী পূজা, নবমী পূজা ও বিজয়া দশমী বাঙালীর দেহেই সত্য রূপ পেল।

৬। ষষ্ঠীতে অকাল বোধন - সর্বজনীন এক মানবকে অন্তরে দর্শন করলে সাধারণ মানুষের জীবনেও আত্মিক চেতনার উদ্‌বোধন শুরু হয়। আত্মা বা ভগবান দর্শনের সঠিক সময় ২৪ বছর ৮ মাস। কিন্তু এই মানবকে অন্তরে পেয়ে নির্দিষ্ট সময়ের আগে বা পরেও অর্থাৎ অকালেও আত্মিক চেতনার উদ্‌বোধন ঘটে। এই কথা বোঝাতে একটি গানে বলা হয়েছে -

"বিল্ববৃক্ষমূলে পাতিয়া আসন
গণেশের কল্যাণে গৌরীর আগমণ।"

ষষ্ঠভূমিতে গণেশ অর্থাৎ জনগণের ঈশ সর্বজনীন মানবকে সিদ্ধিদাতা অর্থাৎ সচ্চিদানন্দগুরু রূপে লাভ হলে শুরু হয় ঈশ্বরীয় চেতনার উদ্‌বোধন, জ্ঞানচক্ষুর উন্মীলন (বিল্বপত্র ত্রিনয়নের প্রতীক)। কৃপাপ্রাপ্ত মানুষটির দেহটি তখন বিল্ববৃক্ষ। সচ্চিদানন্দগুরু লাভ হলে মূলাধারে কুণ্ডলিনী জাগ্রত হয়ে ওঠে ও কালক্রমে গৌরী বা দুর্গার তথা আত্মার বিচিত্র বিকাশ উপলব্ধি হয়।

ঐশী গ্রন্থ

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত শ্রীম'র অসাধারণ এক দিনলিপি। ঠাকুরের অমৃতবাণীর অপূর্ব সংকলন। এতে ঠিক ঠিক উদ্ধৃত হয়েছে তাঁর কথা। ধর্ম জগতে এমন বই প্রথম। 'ধর্ম ও অনুভূতি' এবং 'Religion & Realisation' গ্রন্থ দুটিতে মহামানব শ্রীজীবনকৃষ্ণ নিজের অনুভূতির আলোকে ঠাকুরের কথার যোগাঙ্গ নিজের হাতে লিখলেন। এটি জগতবাসীর পরম সৌভাগ্য।

কিন্তু ছাপার ভুল ছাড়াও বহু জায়গায় বাড়তি কথা সংযোজিত হয়েছে যারা ছাপার দায়িত্বে ছিলেন তাদের দ্বারা যা অনেক সময় অপ্রাসঙ্গিক হয়ে গেছে। ফলে এর স্বাভাবিক তেজ কিছুটা হলেও চাপা পড়েছে। তাই বেশ কিছু স্বপ্ন নির্দেশ পেয়ে 'ধর্ম ও অনুভূতির' ৩য় খণ্ড প্রথম প্রকাশের ৫০ বছর পর পাণ্ডুলিপি দেখে অখণ্ড সংস্করণ ছাপানো হল ২০১৩ সালে।

যত মানুষ ইংরাজী ভাষা শিখছে ও তাতে সাবলীল হচ্ছে তত ইংরাজী বইটিরও গুরুত্ব বাড়ছে। তাছাড়া ইংরাজী বইটি বাংলা 'ধর্ম ও অনুভূতি'র হুবহু অনুবাদ নয়। এতে অনেক নতুন ব্যাখ্যা যুক্ত হয়েছে ও অনেক ব্যাখ্যা সহজ ও স্পষ্টভাবে বিবৃত হয়েছে। তাই ইংরাজী বইটিও প্রথম প্রকাশের (১৯৬৫) ৫০ বছর পর এ বছর (২০১৫) পাণ্ডুলিপি দেখে সংশোধন করে ছাপানো হল।

সংশোধিত এই বই দুটি পড়ার প্রয়োজনীয়তা নিয়ে অনেকের স্বপ্ন হয়েছে। সম্প্রতি দেখা কয়েকটি স্বপ্ন এখানে উল্লেখ করা হল।

শোভন ধীবর (অবিনাশপুর, বীরভূম) ঃ

দেখছি (০৪.০৭.১৫) – রামবাবু মারা গেছেন। আমি খুব কাঁদছি। ডেড বডি দেখতে গেলাম, দেখতে পেলাম না। বাড়িতে এসে দেখছি, জয় ও অন্যান্য পাঠের লোকেরা রয়েছে। জয় যেন রামবাবুর ছেলে। একজন বয়স্ক লোক রামবাবুর একটা দলিল জয়কে দেখাচ্ছে। দলিলে ডোমপাড়ার কিছু জায়গায় যেন একটু গোলমাল আছে। জয় আমাকে বলল, তোমার এখানে

বসার দরকার নেই। আমি অভিমান ভরে উঠে গেলাম। ... এরপর কিছু ঘটনা ঘটল। পরে দেখি স্নেহময় স্যার ও বাবা বাইকে করে সিউড়ী থেকে এলেন। একটা কালো ব্যাগ হাতে। ওতে নাকি সেই দলিলটা রয়েছে যাতে একটু গোলমাল ছিল। স্যার ওটা আমাকে রাখতে দিলেন। সিউড়ি কোর্টে ওটা ঠিক করে এনেছেন। আমি ব্যাগটা নিয়ে ঘরের ভিতর রাখা মাত্র ওর ভিতর থেকে আগুনের শিখা বেরিয়ে এল। তাড়াতাড়ি চেপে ধরলাম – আগুন নিভে গেল। এবার বাইরে এলাম। একটু পর ভিতরে গিয়ে দেখি যে ঐ ব্যাগটা থেকে লাল আভা বেরোচ্ছে। তার ভিতরের সব কাগজে আগুন ধরে গেছে। সেগুলো বের করে দেখি শুধু ধারগুলো পুড়ে গেছে। কিন্তু সেই দলিলটা পাওয়া যাচ্ছে না। আমার সাথে স্যারও দলিলটা খুঁজতে লাগলেন।

ব্যাখ্যাঃ রামবাবু – পরম এক – শ্রীজীবনকৃষ্ণ। মৃত্যু – নূতন লীলার জন্য ইচ্ছামৃত্যু। দলিল – শ্রীজীবনকৃষ্ণ কথিত ব্রহ্মবিদ্যার authentic বই – 'ধর্ম ও অনুভূতি' এবং 'Religion & Realisation'. দলিলে ডোম-পাড়ার কিছু জায়গায় গোলমাল – পাণ্ডুলিপির বাইরে কিছু কথা (অপ্রাসঙ্গিক) যোগ হওয়ায় বইয়ের সর্বজন গ্রহীতায় বাধা সৃষ্টি হচ্ছে। আগুন বেরোচ্ছে – 'ধর্ম ও অনুভূতি' ও 'Religion & Realisation' গ্রন্থের তেজ কত তা দেখাচ্ছে। দলিলটি খোঁজা চলছে – সঠিক লেখাটি উদ্ধারের চেষ্টা চলছে।

অতনু মাইতি (কাষ্ঠডাঙ্গা, সরশুনা, কলকাতা) ঃ

স্নেহময়দা যেদিন নতুন 'রিলিজিয়ন অ্যাণ্ড রিয়েলাইজেশন' বইটা আনলেন, ঠিক তার আগের রাত্রে স্বপ্নে দেখছি – কে যেন বলল, 'নতুন ইংরাজী বইটা (R & R) বেরিয়েছে। ওটা খুব ভাল বই। তুই ওটা পড়।'

অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় (শিমুরালী, নদীয়া) ঃ

ইংরাজী বইটা (R & R) হাতে আসার আগেই স্বপ্নে দেখছি – চারজন বাচ্চা ছেলে এসে বলল, নতুন বেদ বেরিয়েছে। আমাদের বেদ দাও। ওদের মধ্যে একজন আবার চশমা পরে আছে। ওরা সবাই ধুতি পরে আছে। আমি

ওদের সদ্য প্রকাশিত Religion & Realisation বইটা দিলাম। নিজেও বইটা প্রথম দেখলাম যেন। প্রচ্ছদে সাদা ও কমলা রঙের প্রাধান্য। ... বাস্তবে তখনও আমি বইটা দেখিনি।

ব্যাখ্যাঃ বেদ - বইটি প্রকৃতই বেদ - মূর্তিমান সনাতন ধর্ম। চারজন ছেলে প্রচলিত চারটি বেদ - তারা সম্পূর্ণতা পেতে চাইছে। তাই বইয়ের কাছে তারা শিশু। একজন চশমা পরে আছে - ওটি অথর্ব বেদ। ওতে অনার্য কৃষ্টি (শ্রাদ্ধ, মারণ, উচাটন, বশীকরণ ইত্যাদি) ঢুকে যাওয়ায় সত্য দর্শনের ক্ষমতা কমে গেছে।

আলোকিরণ ভট্টাচার্য্য (সখের বাজার, কলকাতা) ঃ

১) দেখছি (১২.০৯.১৫) - জলে ডাব ফেলে সেদ্ধ করতে দিয়েছি। পরে তেল দিয়ে ছুঁকব ঠিক করেছি কিন্তু ভুল করে ওতেই তেল ঢেলে দিয়েছি। তখন তাড়াতাড়ি একটা ছাঁকনী দিয়ে ছেঁকে ঐ জল থেকে তেলটা আলাদা করে নিলাম। পরে ভাবলাম এমন অদ্ভুত ছাঁকনী আজকাল পাওয়া যাচ্ছে! ..... ঘুম ভাঙল।

ব্যাখ্যাঃ 'ধর্ম ও অনুভূতি' প্রকাশের পর (১৯৬১) শ্রীজীবনকৃষ্ণ দৈববানী শুনলেন - calcutta bell cribbling. ব্যাখ্যায় বলেছিলেন, এই বই পাঠ ও শ্রবণে কলকাতার মানুষের দেহ শুদ্ধ হবে - বিষয় জল থেকে শুদ্ধ চৈতন্য পৃথক হয়ে দেখা দেবে। নতুন সংশোধিত 'ধর্ম ও অনুভূতি' এবং Religion & Realisation-ই স্বপ্নদৃষ্ট অভিনব ছাঁকনী। এই বই পাঠ ও শ্রবণে শুরু হবে calcutta bell cribbling-এর দ্বিতীয় পর্যায়।

২) দেখছি (০২.১০.১৫) - স্নেহময়ের সাথে গল্প করতে করতে হাঁটছি। হঠাৎ দেখি এক জায়গায় অনেক শ্রমিক খোঁড়াখুঁড়ি করছে হীরে পাবে বলে। আর দেখতেও 'হীরক রাজার দেশের' খনি শ্রমিকদের মত। আমি স্নেহময়কে বললাম, ঐ যে ইংরাজী বইটা (R & R) এখন বেরিয়েছে সেটা যারা পড়বে তাদের ভিতর খোঁড়াখুঁড়ি শুরু হয়ে যাবে। ঐ বই পড়ে তারা হীরে (Diamond) খুঁজে পাবে ভিতরে।

রণিত পাল (আড়িয়াদহ, দক্ষিণেশ্বর) ঃ

ঘরের মধ্যে বড় একটা হীরে বুকে জড়িয়ে ধরে আছি, খুব আনন্দ হচ্ছে। হীরেটার আকৃতি ফুলদানির মত। সামনে এক মহিলা দাঁড়িয়ে আছে। মনে হচ্ছে হীরেটা আমার এবং ওনার, দুই জনেরই। উনি বললেন, হীরেটা সামনে টেবিলে নামিয়ে রাখুন না। তখন দেখি ঘরের মধ্যে নয়, আমরা আছি এরোপ্লেনের ভিতর। এরোপ্লেনটা মাটি ছেড়ে আকাশে উড়তে শুরু করল। ..... ঘুম ভাঙল।

পরদিনই শুনলাম ডায়মণ্ডের লেখা Religion and Realisation বইটার নতুন সংস্করণ বেরিয়েছে। মনে হল আমার স্বপ্নে ঐ বইটার কথাই বলেছে।

ব্যাখ্যাঃ ডায়মণ্ডের লেখা বইটাই ডায়মণ্ড — হীরে। কেননা ওতে লেখকের সত্তা ওতোপ্রোত হয়ে আছে। ওটা ফুলদানি, কেননা দর্শন-অনুভূতি রূপ ফুল সহযোগে বইয়ের কথাগুলি ধারণা হবে। মাটি ছেড়ে আকাশে উড়ছি - ঐ বই পড়লে আত্মিকে উত্তরণ শুরু হবে।

বরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় (বোলপুর, বীরভূম) ঃ

দেখছি (০৯.১০.১৫) - এক জায়গায় নোবেল প্রাইজ পাওয়ার মত গুরুত্বপূর্ণ একটা বড় হীরে কেউ পেয়েছে, সেটা দেখানো হচ্ছে। হীরেটা দেখতে বিরাট লাইন পড়েছে বাচ্চাদের। হঠাৎ একজন ঐ হীরের একটা রেপ্লিকা আনল - আকৃতি বইয়ের মত। সেটা দেখলাম, ততক্ষনে লাইন শেষ। ছুটে গিয়ে আসল হীরেটা দেখতে গেলাম। সেটা তখন আলমারীতে ঢুকিয়ে দিল। দেখতে চাইলাম। বলল, তোমার লাইনে দাঁড়ানোর ধৈর্য্য নাই - বসো - পরে দেখাবো। লোকটি ছোটদের নানা প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছিল। ওখানে একটা ইংরাজী বই নামানো ছিল - সেটার প্রচ্ছদ অপূর্ব সুন্দর - হাত বুলিয়ে দেখলাম। মনে হচ্ছে হীরে দিয়ে তৈরী এই বই। ঘুম ভাঙল। বুঝলাম, Religion and Realisation বইটির কথা বলছে।

ব্যাখ্যাঃ আগামী প্রজন্ম ভালভাবে বুঝতে পারবে ও সঠিক মূল্যায়ন করতে

পারবে যে Religion and Realisation বইটি এক মহৎ সৃষ্টি।

বর্ণালী ঘোষ (চারুপল্লী, বীরভূম) ঃ

দেখছি (২৬/১০/১৫) – কোথায় যেন গেছি। বরুন মামা, তরুন মামা, দাদা ও আমি। আমি 'ধর্ম ও অনুভূতি' পড়ছি। বরুন মামা বলল, ইংরাজী Religion and Realisation টা পড়। বললাম, আমি ইংরাজী বই পড়তে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করি না। মামা বলল, আরে ঐ ইংরাজী বইটাতে আমি কিছু গাণিতিক ফর্মূলা (Mathematical Formula) ঢুকিয়ে দিয়েছি। তুই বইটা পড়ে সেগুলো খুঁজে বের কর। খুব অবাক হলাম। ... ঘুম ভাঙল। আমার বিষয় অঙ্ক হতে পারে তাই বলে ধর্মের বইয়ে অঙ্কের সূত্র কি করে পাব?

ব্যাখ্যাঃ অঙ্ক–চিহ্ন–প্রতীক। প্রতীকার্থ ধরে ঐ বইতে কিছু সূত্র মিলবে যা আত্মিক রহস্য উন্মোচনে সাহায্য করবে॥ এখানে বরুণ মানে ব্রহ্ম – শ্রীজীবনকৃষ্ণ।

পুতুল দেবনাথ (সখের বাজার, কলকাতা) ঃ

দেখছি (১১/১১/১৫) – একটা বাচ্চা ছেলে কাঁদছে আর বলছে অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে। ওকে স্নেহময় এসে কোলে তুলে নিল। তখন নজরে পড়ল ছেলেটার পাছায় একটা কলম (ডট পেন) গেঁথে রয়েছে। অমনি দেখি ছেলেটির মা ছুটে এসে পেনটি বের করল। ছেলেটির কান্না থামল। .....

ব্যাখ্যাঃ ভাগবত ও ভগবান – এক। ছেলেটি ভগবান জীবনকৃষ্ণ রচিত ভাগবত – 'ধর্ম ও অনুভূতি' এবং 'Religion & Realisation'. এই ভাগবতে অন্য লোকে কলম চালিয়েছে তাই তাঁর কষ্ট হয়েছে। সেই যন্ত্রণা এতদিনে দূর হল। মা অর্থাৎ নির্গুনব্রহ্ম ভক্তের জগতের মাধ্যমে পাণ্ডুলিপি দেখে 'ধর্ম ও অনুভূতি' এবং 'Religion & Realisation' সংশোধন করালেন।

স্মৃতিকথা

শ্রীজীবনকৃষ্ণের পূতসঙ্গধন্য কিছু মানুষের কিছু স্মৃতিচারণ ঃ

অবলাকান্ত দত্ত

শ্রীজীবনকৃষ্ণের কাছে গিয়ে অতি সাধারণ মানুষেরও যে কি অবস্থা লাভ হয়েছিল বিভিন্ন দিনের ঘটনা থেকে আমরা সেটা বুঝতে পেরেছিলাম। ১৯৬০ সালের নভেম্বর মাসের একদিনের ঘটনা খুব মনে পড়ছে। ঘরে খগেনবাবু ও জীবনকৃষ্ণের মধ্যে আত্মিক বিষয়ে নানা কথা আদানপ্রদানের মধ্যে হঠাৎ খগেনবাবু বলে উঠলেন – দেখুন আমার শিরদাঁড়ায় কেমন যেন একটা সুড়সুড়ি বোধ করছি। এই কথা শোনামাত্র জীবনকৃষ্ণ সমাধিস্থ হলেন। খানিক পরে প্রকৃতিস্থ হয়ে মুচকি হেসে অনুরোধের সুরে খগেনবাবুকে বললেন – আপনি সোজা হয়ে চোখ বুজে একটু বসবেন? নির্দেশ পেয়েই খগেনবাবু ধ্যানস্থ হলেন। জীবনকৃষ্ণের চোখও মুদ্রিত হল ২/৪ মিনিটের জন্য। চোখ খুলে রগরাতে তাঁর চোখ মুখ হয়ে উঠল রক্তিমাভ। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তিনি তাকিয়ে রইলেন খগেনবাবুর দিকে। ৮/১০ মিনিট পর তিনি ঈশারায় আমাকে খগেনবাবুর মুখপানে চেয়ে দেখতে বললেন, ইঙ্গিত করলেন তাঁর ঘাড়ের শিরার দিকে লক্ষ্য করতে। পর্যবেক্ষণ শক্তি কোথায় আমার! তাকিয়ে রইলাম অবাক দৃষ্টিতে। অঙ্গুলি সঙ্কেতে কি বললেন কিছুই বুঝলাম না। এবার অতি সন্তর্পণে শ্রীজীবনকৃষ্ণ নিজেই একটি আঙুল খগেনবাবুর নাকের সামনে রেখে দেখলেন শ্বাস বইছে কি না এবং আমাকেও অনুরূপ করার নির্দেশ দিলেন। আঙুলে নিঃশ্বাসের ছোঁয়া না পেয়ে ভাবছি তবে কি খগেনবাবুর সমাধি হয়েছে? আমার বিহ্বলতা লক্ষ্য করে শ্রীজীবনকৃষ্ণ আনন্দে মুচকি হেসে অনুচ্চ কণ্ঠে বললেন, "এ যে সমাধি রে।" প্রায় ২০ মিনিট পর খগেনবাবু চোখ খুললেন। মৃদু হাসলেন জীবনকৃষ্ণ। খগেনবাবুর মুখের রং পরিবর্তিত, উজ্জলতার আভা সারা মুখমণ্ডলে। চোখে মুখে একটা শান্ত সমাহিত ভাব। তিনি বললেন – দেখুন আমার মনে দুটো বিপরীত ভাব এসেছিল – Resistance and Expedition (প্রতিরোধের

চেষ্টা এবং নতুন কিছু হোক-এই ইচ্ছা)। সে যাই বলুন মশাই, আপনার সমাধি হয়েছিল — বললেন শ্রীজীবনকৃষ্ণ। আমি অবলাকেও দেখিয়েছি, আমরা যে আপনার নাকের কাছে হাত দিয়েছিলাম তাও টের পান নি। জানেন, প্রথম হয়েছিল আপনার কুম্ভক পরে সমাধি। এমনি হয়। খুব ভাল। একে বলে সবিকল্প সমাধি। আপনার কোন ভাবনা নেই। ভাবতেই অবাক লাগে যে এইভাবে তিনি আমাদের মত কত সাধারণ মানুষকে যোগের উচ্চস্তরের আস্বাদন পাইয়ে দিয়েছেন।

সুধীন্দ্রনাথ সিংহ

আমি তখন সবে শ্রীজীবনকৃষ্ণের কাছে যাওয়া শুরু করেছি। সেই সময়ের একদিনের কথা মনে পড়ছে। দিনটা ছিল বিশেষ এক ছুটির দিন। বেলা ৩টার পর ওর কাছে গিয়ে উপস্থিত হলাম, একলা। দেখেই আনন্দে বলে উঠলেন, 'খাটে এসে বস।' সেদিন মহাপ্রভুর কথা, মহাভাবের কথা বলতে বলতে গেয়ে উঠলেন – 'সই কে বলে পিরীতি ভাল, অলপ বয়সে পিরীতি করিয়া কাঁদিয়া জনম গেল।' 'শিশুকাল হতে আমার কানু অনুগত তনু গো'। পদটি দু তিন বার গাইবার পর ওর সমস্ত দেহ লাল হয়ে উঠল, মুখে চোখে অদ্ভুত আলোক বিচ্ছুরিত হতে লাগল। গলার স্বর থেমে গেলে আনন্দময় হয়ে বসে রইলেন। নড়ে উঠলেন – আবার স্থির হয়ে গেলেন, পরে বললেন 'ভাই মহাভাব ভাবের চাইতে ঊনিশ গুণ বেশি জোর ধরে। শ্রীমতীর মহাভাব – মহাপ্রভুর, ঠাকুরের হত।'

আনন্দমোহন ঘোষ

একবার এক কীর্তনীয়া তাঁর দলবল নিয়ে জীবনকৃষ্ণের ঘরে এসেছিলেন। তিনি ও তাঁর দলবল গান শুরু করলে শ্রীজীবনকৃষ্ণ ভাবে মত্ত হয়ে গাইতে লাগলেন ও নাচতে লাগলেন। ঘরশুদ্ধ সকলে গানের সঙ্গে নাচতে লাগলেন।

জীবনে এ এক অনাস্বাদিতপূর্ব আনন্দ। এখনও সেই চিত্র মানস নয়নে দেখতে পাচ্ছি। গান শেষ হলে সকলে মেঝেতে বসলেন। গায়কের সঙ্গে শ্রীজীবনকৃষ্ণ আলাপ করছেন। কপালে সিঁন্দুরের লম্বা তিলক দেখে গায়ককে বলছেন – 'বাবা তোমার দীক্ষা হয়েছে ?' গায়ক গর্বিত স্বরে বললেন – 'আজ্ঞে হ্যাঁ, আমার গুরুদেব শ্রী শ্রী অমুক পরমহংস' – কথা শেষ হবার আগেই শ্রীজীবনকৃষ্ণ বলে উঠলেন – 'পরমহংস! তোমার গুরুদেবকে জিজ্ঞাসা কোরো তো, পায়খানা করার সময় কী হয়? তবে বুঝবো পরমহংস। পরমহংস যেন মুড়ি মিছরি।' গায়ক বললেন – 'তাঁর অহংকার নেই।' শ্রীজীবনকৃষ্ণ বিরক্ত স্বরে বললেন, 'অহঙ্কার গেছে কিনা তার প্রমাণ প্রত্যেক মানুষটার নিজের কাছেই আছে। সেখানে ফাঁকি চলে না। আল্লা সুকৌশলী। অহঙ্কার গেলে একবিন্দু রেতঃপাত হয় না। কাম থাকে না। কেউ মুখ খুললে বা হাঁ করলে আমি সব বুঝতে পারি। Let a man utter a single word and I shall catch him. এখন বুঝলে অহঙ্কার নাশের প্রমাণ!'

বিনয় কুমার মুখোপাধ্যায়

শ্রীজীবনকৃষ্ণের ইংরাজী ভাষার গভীরতা কেমন ছিল একদিনের আলোচনায় সেটা বেশ বুঝতে পেরেছিলাম। কথা প্রসঙ্গে একদিন বললেন, আমি একসময় যৌগিক ব্যাখ্যার ইংরাজী ট্রানশ্লেসন করে এখানকার একজনকে দিয়ে সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজের প্রিন্সিপ্যালের কাছে পাঠিয়েছিলাম। সে খাস ইংরেজ আর যাকে দিয়ে পাঠিয়েছিলাম সে ওখানকার student. আমার ওটা লিখে মনে হয়েছিল – এটা কি ঠিকঠিক ইংরাজী হল, না আমার ইংরাজী হল? তা ওই সাহেবটি সেটা পড়ে ছেলেটাকে কিছু না বলে আমাকে একটা চিঠিতে জানিয়েছিল — No, your English is correct and it is easy to understand. But the realisations are with one's mind's eye - আসলে ওর তো কোন অনুভূতি নেই।

নিতাই পাত্র

শ্রীজীবনকৃষ্ণের ব্যতিক্রমী জীবনের পরিচয় তার কথাবার্তায় মাঝে মাঝে ফুটে উঠত। কথা প্রসঙ্গে একদিন বললেন, দেখুন মেনোর বিয়ে হল ১৯২৭ এ। তখন তো আমি এসব জানি না। দৈব আমাকে রক্ষা করেছিল। আমি পাকা দেখতেও যাইনি। জ্ঞানমাকে (মাসিমা) বললুম, তোমার ছেলের বিয়ে দাও না, আমি দিনকতক বাইরে গিয়ে থাকব খন। বাড়ী থেকে একটু দূরে একটা বাসা ভাড়া করলাম। সেখানে মাসখানেক ছিলাম। দুবেলা দুটি খেয়ে যেতুম। বৌভাতের দিন আমার জন্য খাবার পাঠিয়ে দিয়েছিল। বিয়ের পর আমি বাইরের ঘরে থাকতুম। ভিতরে দুটি খেয়ে আসতুম। তারপর এই ১৯৫৬ সালে মেনোর মেয়েটার বিয়ে হল। এখন তো অনেকটা conscious. বিয়ের সময় কটা বাচ্চা নিয়ে একেবারে মেনোর দেশের বাড়ীতে উঠলাম। আর খরচও হল একেবারে ২০০ টি টাকা। ভাবখানা এই যেন বিয়ের হাওয়া গায়ে না লাগে।

বেশী রাত্রে খাওয়ার প্রসঙ্গে একদিন বলেছিলেন – বেশী রাত্রে খাওয়াকে বলে রাক্ষস ভোজন। নিশাচর — নিশাচরের আর এক মানে আছে। রিপুগুলো রাত্রেই প্রবল হয়। পশুরা যেমন রাত্রে সজাগ হয়, আহার অন্বেষণ করে, দেহস্থ রিপুগুলো তেমনি রাত্রেই প্রবল হয়। সেই জন্য বেশী রাত্রে খেতে নেই।

অনাথনাথ মণ্ডল

একদিন আমি জীবনকৃষ্ণকে বলেছিলাম, ঠাকুর যদি অন্য কোন কথা না বলে শুধু নিজের অনুভূতির কথা বলতেন তো ভাল হত। উনি ঐ কথা শুনে বললেন – 'ঠিক বলেছিস। চুপ করে থাকলেই হত। Silence is gold, speech is silver. একে আবার একজন critic বিদ্রূপ করে বলেছে – not necessarily speech is silver. ঐ জন্য বুদ্ধকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করলে মাথা নিচু করে থাকতেন। যদি কেউ প্রশ্ন করত – আপনি কি জানেন

না? তিনি উত্তর দিতেন – জানি না কে বলেছে? আবার যদি কেউ প্রশ্ন করত, আপনি কি জানেন? তিনি উত্তর করতেন – জানি কে বলেছে ?'

তথ্য সহযোগে কোন বিষয়ের সরস পরিবেশনায় জীবনকৃষ্ণের জুড়ি মেলা ভার।

পাঠ পরিক্রমা – ১

(17th Feb. 2018, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মদিনে সখের বাজারে স্বরূপা দত্তের নতুন Flat-এর উদ্বোধন উপলক্ষ্যে যে পাঠ হয়েছিল তারই অংশ বিশেষ এখানে উল্লেখ করা হল।)

আমাদের প্রার্থনা থাকবে যে এই গৃহ যেন ভগবৎ চর্চার একটি কেন্দ্র হয়ে ওঠে। এই গৃহ যেমন আমরা সুসজ্জিত রাখব, সাথে সাথে স্মরণ করব যে আমাদের প্রকৃত ঘর অর্থাৎ আমাদের এই 'দেহঘর' যেন সদাসর্বদা যোগযুক্ত থাকে। আমরা যেন এই দেহঘরের ভিতরের যোগৈশ্বর্য্য প্রত্যক্ষ করতে পারি। এই দেহঘরের কোথায় কোন যোগৈশ্বর্য্য আছে, আমরা সে সম্বন্ধে অবগত নই, আমরা জানি না। প্রথম যিনি নিজেকে আবিষ্কার করলেন, জানলেন যে আমি দেহ নই আমি আত্মা – তিনি ঠাকুর রামকৃষ্ণ। তিনি বুঝলেন, এই দেহটা খোল মাত্র। ঘর মাত্র। এই ঘরের মধ্যে আত্মা রয়েছে। বাইরে যেমন দেহ রক্ষার জন্য একটি ঘরের দরকার হয়, তেমনি আত্মার বিকাশের জন্য প্রয়োজন এই দেহ ঘর। দেহ ছাড়া আত্মার প্রকাশ হয় না। মন অন্তর্মুখী হলে, এই দেহঘরের ভিতরেই নিজের স্বরূপ জানা যায়। তখন বাইরের দুঃখ কষ্ট অনায়াসে ভুলতে পারি। একটা অপার্থিব ঈশ্বরীয় আনন্দে আমাদের দেহ মন ভরে যায়, আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য পূরণ হয়। ঠাকুর বার বার বলছেন, মনুষ্য জীবনের উদ্দেশ্য ভগবান দর্শন, ভগবান লাভ। আত্মা-ভগবান-ব্রহ্ম তিনই এক। এই আত্মা বা ভগবানকে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দর্শন করেছিলেন নিজের মধ্যে। তখন তিনি নিজেকে আবিষ্কার করলেন, বুঝলেন তিনি যেন প্রকৃত অর্থে জন্মলাভ করলেন এতদিনে। জীবনকৃষ্ণও বলছেন– আত্মা সাক্ষাৎকার যখন হল তখন তিনি জন্মালেন, নিজেকে জানতে পারলেন। তার আগে জন্ম হয়নি। কেন জন্মান নি? কারণ তার আগে মায়ের গর্ভে ছিলেন। দেহে ওতপ্রোত হয়ে ছিলেন। দেহটিকেই আমি ভাবছিলেন। এবার দেহ থেকে আত্মা সন্তান জন্ম লাভ করল। আত্মা সাক্ষাৎকার করে ঠাকুর রামকৃষ্ণের মত মানুষের জন্ম হল। অন্যদের তো

জন্মই হয়নি। ঠাকুরের সেই যে দর্শন– নৃমুণ্ড স্তূপের উপর তিনি বসে আছেন। চারিদিকে নরমুণ্ডের কংকাল। তিনি একা জাগ্রত চৈতন্য। বাকিরা সব মৃত। একজন মানুষ, যার জন্ম হয়, যার মধ্যে চৈতন্য জাগ্রত হয়ে ওঠে, তাঁর চেতনার আলোক প্রাপ্ত হয়ে বাকিদের জন্ম হয়। এই জন্য ঋষিরা প্রার্থনা করেছিলেন – "অসতো মা সদ্গময়, তমসো মা জ্যোতির্গময়, মৃত্যোর্মা অমৃতংগময়।" তাদের প্রার্থনা ছিল অসৎ থেকে সতে নিয়ে চলো – মানে আমি অসৎ আছি, আমি যেন সৎ হই, তা নয় – এখানে অসৎ মানে হচ্ছে অনিত্য। আমরা অনিত্য বস্তুকে আঁকড়ে ধরে আছি। নিত্যবস্তুর দিকে আমার এই মনটিকে নিয়ে চলো। সেই নিত্যবস্তু যে সৎ, যে চিরকাল আছে, সেই ঈশ্বর কোথায় ? আমারই ভিতরে। আমার মন বহির্মুখী হয়ে আছে, ভোগমুখী হয়ে আছে, সেই মন যেন তোমার কৃপায় অন্তর্মুখী হয়। দেহের মধ্যে আসে। এই দেহের ভিতরে অন্তর্যামী নারায়ণ রয়েছেন, তাঁকে যেন জানতে পারি, নিজের স্বরূপ যেন জানতে পারি। মন অন্তর্মুখী হলে মনের ঊর্ধ্বমুখী যাত্রা শুরু হবে। তখনকার প্রার্থনা হবে 'তমসো মা জ্যোতির্গময়।' তমসা মানে অন্ধকার। অন্ধকার থেকে আলোতে নিয়ে চল। সে আলো এই বাইরের আলো নয়। এই আলো তো হাতের মুঠোয়। সূর্য নাই তখনও সুইচ টিপলেই দিনের আলোর মত আলো জ্বলছে। কিন্তু আমাদের মনের অন্ধকার তো ঘুচছে না। বাইরের হিংসা, দ্বেষ, পরস্পরের হানাহানি, মারামারি, কাটাকাটি লেগেই রয়েছে। যদি জ্ঞানের আলো জ্বলে তবেই এই মনের অন্ধকার দূর হবে। ঠাকুর বলছেন – ঈশ্বরকে জানার নামই জ্ঞান। তাহলে সেই যে ঈশ্বর যিনি 'পরমজ্যোতি স্বরূপ' তাকে যখন দেখব, তখন সেই জ্ঞানের আলো পাব। ঠাকুরের ও জীবনকৃষ্ণের ক্ষেত্রে সচ্চিদানন্দগুরু আবির্ভূত হলেন এবং দেহীর মনকে নিয়ে গেলেন সহস্রারে। সেখানে নিয়ে গিয়ে জ্যোতির সমুদ্রে অঙ্গুষ্ঠবৎ আত্মা দেখিয়ে বললেন — এই ভগবান, এই ভগবান দর্শন। এই ভগবান দর্শন হলে তবে মানুষটার জ্ঞান লাভ হয় যে ঈশ্বর অনেক নয়, ঈশ্বর এক। কালী, শিব, দুর্গা, ঈশ্বর নয়, ঈশ্বর পরমজ্যোতি স্বরূপ। আর জ্ঞান হল যে সেই ঈশ্বর আমার ভিতরে। পরে জানা যায় ঈশ্বর আর আমি এক। আমার আলাদা কোন সত্তা নেই। পরের প্রার্থনা

— মৃত্যোর্মা অমৃতম্ গময়। মৃত্যু থেকে আমায় অমৃতলোকে নিয়ে চল। মৃত্যু মানে তো শেষ। আমরা যে লোকে রয়েছি, এটা মৃত্যুলোক। কেননা আমরা তো আমাদের অশেষ অর্থাৎ চিরন্তন সত্তাকেই জানতে পারিনি। এক অখণ্ডচৈতন্যই রয়েছে, তিনি ছিলেন, আছেন, থাকবেন - তাকে তো জানা হচ্ছে না। আমরা তো মৃত্যুলোকেই রয়েছি। আমরা প্রকৃত অর্থে জীবিত হয়ে উঠিনি।He only lives who lives in all, তাহলে মৃত্যুলোক থেকে অমৃতলোকে যেতে হবে — এ কথার মানে কী ? নিজের ভিতরে আত্মা দেখলাম, জ্ঞানলাভ হল। ঈশ্বরের রসাস্বাদন করলাম। তাহলেই হবে না। এইবার অমৃত হতে হবে। আর জগত যেন তা জানতে পারে, জগতের মানুষকে এই অমৃত খাওয়াতে হবে, জানাতে হবে, তাহলে আমার অমৃতলোকে থাকা হবে। অমৃতলোক তো আর জগতের বাইরে কোথাও নয়। জগতের মধ্যেই আছে, মনুষ্যলোকেই আছে। তাহলে মনুষ্যজাতির মধ্যে আমাকে শাশ্বত হয়ে, সর্বজনীন সর্বকালীন হয়ে থাকতে হবে। তবে অমৃতলোকে যাওয়া হল। অর্থাৎ সাধক যে অমৃত পান করেছেন, সেইটার পরিচয় যেন জগৎ পায়। তিনি নিজে শুধু আস্বাদন করলেন, সেই আস্বাদনের কোন মূল্য নেই। জীবনকৃষ্ণের কথায় সেটা হল - "Subjective Truth". Subjective Truth হচ্ছে, যে সত্য আমি নিজে উপলব্ধি করলাম। কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত না সেটা "Objective Truth" হচ্ছে, জগতের মানুষ সেই সত্যের পরিচয় বা প্রমাণ পাচ্ছে, ততক্ষণ সেই সত্যটা মূল্য পাচ্ছে না। সেটা যথার্থ সত্য বলে প্রমাণিত হচ্ছে না। ততক্ষণ সেটা Hypothesis। যার জন্য রামকৃষ্ণের সঙ্গ করার পরও বিবেকানন্দ বলছেন All religions are but Hypothesis – অনুমান মাত্র। রামকৃষ্ণ যে ভগবান দর্শন করেছেন, সেটা তো অনুমান নয়, সত্য, চরম সত্য, but it is Subjective Truth, অর্থাৎ ব্যক্তিগত ভাবে সত্য। রামকৃষ্ণ যে ভগবান দর্শন করেছিলেন এটা রামকৃষ্ণের কাছে চূড়ান্ত সত্য। কিন্তু objective truth অর্থাৎ জগতের মানুষের মধ্যে সেই সত্যের প্রমাণ ফুটল না। উনি ছটফট করছেন, ভাবছেন এরা যেন প্রমাণ পায়। তাহলে তার এই দেখা পাওয়াটা সত্য হবে, মূল্য পাবে। এইজন্য জীবনকৃষ্ণ একটা কথা ব্যবহার করতেন । 'এ জিনিস যদি জগতে না ফোটে,

জগতের মানুষ যদি না বোঝে তাহলে জানব এতদিন যা কিছু হয়েছে সব Hoax অর্থাৎ আমি মিথ্যাকে সত্য বলে ভেবেছি।' বস্তুতঃ Subjective Truth-এর কোন দাম নেই যতক্ষণ না তা প্রমাণ করা যাচ্ছে, প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে জগতের মানুষের মধ্যে। সেইটাকে বলছেন Hoax. এমন হতে হবে যে আমার মাথায় যা চিন্তা ফুটবে তার দ্বারা জগত নিয়ন্ত্রিত হবে, এই জায়গায় পৌঁছাতে হবে। কেউ বলল, স্বপ্নে আপনাকে ভগবান রূপে দেখলাম, ব্রহ্মরূপে দেখলাম, তারপর যথারীতি ভুলে যাবে, আবার সত্যনারায়ণ পূজা করবে। তাহলে কি সত্য সে জানল? সর্বজনীন, সর্বকালীন একজন মানুষই সত্য। এই সত্য জগতের মানুষকে লাভ করতে হবে, প্রমাণ পেতে হবে, তাদের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হতে হবে — এর উপর জোর দিলেন। মৃত্যোর্মা অমৃতংগময়। মৃত্যুলোক থেকে আমাকে অমৃতলোকে নিয়ে চল। অমৃতলোক এই জগতেই। এই মনুষ্যজাতি চিরন্তন। মানুষ জন্মাচ্ছে, বড় হচ্ছে, মরে যাচ্ছে, আবার নতুন মানুষের সৃষ্টি হচ্ছে। তাহলে মনুষ্য জাতির এই যে নিরবচ্ছিন্ন ধারা - এ কিন্তু চিরন্তন। এইখানে তিনি যে সত্য লাভ করলেন, তার চিন্ময় রূপে তাঁর অমৃতত্বের পরিচয় দান করতে হবে, প্রতিষ্ঠা করতে হবে। কেননা যিনি জাগ্রত অখণ্ড চৈতন্যের মূর্ত রূপ তাঁকে অন্তরে দর্শন করে তাঁর সাথে এক হলে সাধারন মানুষেরও চৈতন্য জাগ্রত হবে। তারাও বেঁচে উঠবে , অমৃতায়িত হবে। ঋষিরা প্রার্থনা করছেন, মৃত্যুলোক থেকে সেই অমৃতলোকে যেন উত্তীর্ন হতে পারি। এই প্রার্থনা দেখি রামকৃষ্ণের জীবনেও। তার জন্মদিনের অনুষ্ঠানে কি করছেন তিনি তাই আমরা দেখব। তাঁর মধ্যেও সেই চাহিদা যে আমি যা অমৃত পান করেছি, এই অমৃত যেন সকলে পায়। তাঁর মধ্যে যে অন্তর্মুখীন মনের যাত্রা হয়েছিল, তিনি কি পেয়েছিলেন সেইগুলো নিয়েই আজকে আমরা আলোচনা করব।

পাঠঃ কথামৃতঃ ৫ম ভাগ, ষোড়শ খণ্ড, প্রথম পরিচ্ছদ।

"ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে উত্তর পূর্ব লম্বা বারান্দায় গোপীগোষ্ঠ ও সুবল মিলন কীর্তন শুনিতেছেন। নরোত্তম কীর্তন করিতেছেন। আজ রবিবার, ২২শে ফেব্রুয়ারী, ১৮৮৫ খ্রিষ্টাব্দ, ১২ ফাল্গুন, ১২৯১, শুক্লাষ্টমী। ভক্তেরা তাঁহার জন্ম মহোৎসব করিতেছেন।"

সুবল মিলন মানে সুবল কিভাবে শ্রীকৃষ্ণের সাথে শ্রীরাধিকার মিলন ঘটিয়ে দিয়েছিলেন। কৃষ্ণসখা সুবল ছিলেন অনেকটা শ্রীরাধিকার মত দেখতে। শ্রীরাধিকা শ্রীকৃষ্ণের কাছে যাবার জন্য উদ্গ্রীব হয়ে আছেন। কি করে তিনি তার প্রেমাস্পদকে কাছে পাবেন ভাবছেন। তখন শ্রীকৃষ্ণের পরামর্শে একটা বাছুর কোলে নিয়ে শ্রীরাধিকার ঘরে ঢুকলেন সুবল। আর অমনি সুবলের পোষাক পরে ও বাছুরটা কোলে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন রাধারাণী শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে দেখা করতে। কেউ ব্যাপারটা বুঝতে পারল না। 'সুবল মিলন' কীর্তনে এই কাহিনীটি বলা হয়। সুবল তো পুরুষ! তোমাকে যে নারী হতে হবে এমনটা নয় কিন্তু রাধাভাবটি পেতে হবে। কৃষ্ণের প্রতি রাধার যে টান ভগবানের প্রতি সেই টান জাগতে হবে। সুবলের রাধাভাব ছিল। তাই বলা হ'ল রাধার মতনই দেখতে। সুবলের কোলে বাছুর মানে ভক্তি, তীব্র ভক্তি – রাধাভাব যার মধ্যে আছে, তারই রাধা অর্থাৎ কুলকুণ্ডলিনী শক্তি মিলিত হচ্ছে কৃষ্ণের সাথে। ঠাকুর সেইজন্য একসময় স্বামীজিকে বলছেন, 'রাধাভাব' সাধন করতে হবে। স্বামীজির মাথায় তো একথাটা কিছুতেই ঢুকছে না। স্বামীজি একজন পুরুষ মানুষ, মেয়েরা কিভাবে তার প্রেমাস্পদকে আকাঙ্ক্ষা করে, তার জন্য কতখানি ত্যাগ করতে পারে, সেটা তিনি কি করে বুঝবেন? তিনি ভাবছেন, রাধার ভাব তো আমি কিছুতেই অনুভব করতে পারব না। তার ভিতরে সেই রাধাভাব জাগছে না, আসছে না। একদিন স্বামীজি ধ্যানে দেখছেন যে ঠাকুর স্বামীজিকে বললেন, 'আয়'। বলে – পঞ্চবটীর দিকে যাচ্ছেন। কিছুদূর যাবার পর ঠাকুর আবার যেই পিছন ফিরে বলছেন, 'ওরে আয়' তখন দেখছেন ঠাকুরের মুখটি যেন একটি নারীর মুখ। স্বামীজির তখন মনে হচ্ছে – এই তো শ্রীরাধা। ধ্যান ভাঙ্গার পর উনি বুঝে গেলেন রাধাভাব মানে কি ! ভগবানকে পাবার জন্য ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের যে আর্তি, যে ব্যাকুলতা তাই-ই রাধাভাব। 'সুবল মিলন' কীর্তন হচ্ছে আর তা শুনে ঠাকুর মনে মনে সেই প্রেমলীলা আস্বাদন করছেন। তার মধ্যে সেই প্রেম জাগছে।

কথামৃতঃ "কীর্তন শুনিতে শুনিতে ঠাকুর ভাবাবিষ্ট হইলেন। "

বাইরে কথাগুলি শুনছেন আর ভিতরে তাঁর সেই ভাব জাগছে। তিনি

তো সুবল। তাঁর দেহেতেই শ্রীরাধিকা কৃষ্ণ অভিসারে চলেছেন - আদ্যাশক্তি ব্রহ্মে পরিবর্তিত হচ্ছেন। মধুর রস আস্বাদন করে তিনি ধীরে ধীরে সমাধিস্থ হয়ে যাচ্ছেন।

কথামৃতঃ "গিরিশের বিশ্বাস যে, ঈশ্বর শ্রীরামকৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন।

গিরিশ (শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি) – আপনার সব কার্য শ্রীকৃষ্ণের মত। শ্রীকৃষ্ণ যেমন যশোদার কাছে ঢং করতেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ – হ্যাঁ, শ্রীকৃষ্ণ যে অবতার। নরলীলায় ঐরূপ হয়। এদিকে গোবর্ধন গিরি ধারণ করেছিলেন, আর নন্দের কাছে দেখাচ্ছেন, পিঁড়ি বয়ে নিয়ে যেতে কষ্ট হচ্ছে।

গিরিশ – বুঝেছি, আপনাকে এখন বুঝছি।"

না, কিছুই বোঝা হল না। গিরিশের মনে হচ্ছে উনি সবই পারেন, কিন্তু বাইরে আমাদের মতন সাধারণ মানুষের জীবনযাপন করছেন। প্রকৃতপক্ষে তিনি সবই করতে পারেন না। এখানে গিরিগোবর্ধন ধারণ করতে পারেন কথাটির অন্য মানে – ঠাকুর ঐ গিরিগোবর্ধন পাহাড়টাকে বলছেন পাপের পাহাড়। ঠাকুরকে ভিতরে দেখলে, ঠাকুরের সঙ্গ করলে, পাপের পাহাড় তুলোর পাহাড় হয়ে যায়। কারণ তখন তো আর পাপ থাকছে না। তখন মানুষটা বাইবেলের ভাষায় Virgin অর্থাৎ কুমারী হয়ে যায়। পবিত্র হয়ে যায়। যখনই আপনি ভগবানের স্মরণ মনন করছেন, দেহ মন তখনই পবিত্র হয়ে যাচ্ছে। ভগবানকে দেখাও যা তার অবতারকে দেখাও তা। অবতারকে তো ভিতরে দেখছেন। আর পাপপুণ্যের অতীত হয়ে যাচ্ছেন। সেখানে 'পাপ পাহাড়' কোথায়? স্বয়ং অবতার "শুদ্ধম অপাপবিদ্ধম"। পাপ তাকে স্পর্শ করতে পারে না। তিনি ভক্তদের এই গিরি গোবর্ধন রূপী পাপের পাহাড়কে শূণ্যে তুলে ধরেন, পিঁড়ি তার তুলনায় তো ভারী। কিন্তু গিরি গোবর্ধনটা তার কাছে কিছুই নয়। যিনি ভগবান দর্শন করে ভগবান হয়ে যান তিনি পাপ পুণ্যের উর্দ্ধে উঠে যান। তাঁকে যিনি অন্তরে দর্শন করেন তিনি virgin অর্থাৎ কুমারী হয়ে যান। ইংরাজিতে বলে a born again virgin- অর্থাৎ নতুন করে দেহসুখের আসক্তি মুক্ত পবিত্র অবস্থা লাভ। দেখবেন আপনাদেরও অনেকের স্বপ্ন হয় – এই বয়সে

এসে দেখবেন আপনি একটি কুমারী মেয়ে। ছোট্ট এক মেয়ে, ফ্রক পরে আছেন। ঈশ্বরের সঙ্গসুখ সর্বদা অনুভব করছেন। একজনের স্বপ্ন – সে দেখছে, একটি অন্ধকারাচ্ছন্ন ঘর। তার মধ্যে আট দশ বছর বয়সী কিছু মেয়ে ফ্রক পরা, হাত তুলে তুলে নাচছে। আর বলছে – আমরা মানিক পেয়েছি, আমরা মানিক পেয়েছি। এই মেয়েগুলির মধ্যে একজন হচ্ছে মণি। বাকিদের মুখ পরিষ্কার নয়। যারা মানিক পায়, ভগবানকে পায় তারা তাঁর গুণ পায়, মণি হয়ে যায়।

বাইবেলে আমরা দশ জন কুমারী মেয়ের গল্প পেয়েছি। সেখানে বলছে, দশজন কুমারী মেয়ে অপেক্ষা করছে – কখন বর আসবে। কুমারীদের বলা হয়েছে, তারা যেন ঘুমিয়ে না পড়ে। ঘুমিয়ে পড়লে বরের সাথে দেখা ও মিলন হবে না। কখন বর আসবে তার ঠিক নেই। তোমরা আলো জ্বেলে জেগে বসে থাক। বর এলে বরণ করতে হবে তো। পাঁচজন মেয়ে আলো জ্বেলে বসে থাকলো বর আসার অপেক্ষায়। এদিকে বর তো আসছে না। ঘুম এসে চোখ লেগে গেছে। এদিকে আর পাঁচজন ভাবছে দেরী হচ্ছে বর আসতে, তেল যদি ফুরিয়ে যায় তো এক কাজ করি আরো কিছু তেল যোগাড় করি। এই পাঁচজন এবার তেল যোগাড় করতে বেরিয়ে গেল। ফিরে এসে তারাও ঘুমিয়ে পড়ল। গভীর রাত্রে চারিদিক অন্ধকার হঠাৎ চিৎকার শোনা গেল – 'বর এসেছে। Please come and meet with Him. তোমরা এসো।' সকলে ধড়মড় করে উঠে বসেছে। পাঁচ জনের তেল তখন তো শেষ। এবার ঐ আলোটা নিয়ে বাইরে যেতে হবে! বর এসেছে, বরের কাছে তো আলো নিয়ে যেতে হবে। বর তো অপেক্ষা করছে। সেই পাঁচজন অন্য পাঁচজন মেয়েকে বলছে যে, ও ভাই তোরা একটু তেল দে না। তাদের প্রদীপে তেল না দিলে তো আর জ্বলবে না। বাকিরা তেল দিতে অস্বীকার করল। বলল, আমরা তেল দেব না। কারণ আমরা আগে থেকে তেল জোগাড় করে রেখেছি। যদি তেল দিতে যাই তাহলে আমাদের তেল তো শেষ হয়ে যাবে, আমাদের তাহলে বরের সাথে মিলনটা আর হবে না। তোমরা তেল সংগ্রহ করে আন। তারা তখন তেল সংগ্রহ করতে বেরিয়ে পড়ল। আর যারা আগেই তেল জোগাড় করে রেখেছিল, তারা প্রদীপে

তেল ঢাললো, সলতে উসকে দিল, প্রদীপ জ্বলে উঠল। তারপর সেই প্রদীপ নিয়ে বরের দিকে এগিয়ে গেল। Wedding Hall এর দিকে এগোল। যেখানে বিয়ে হবে। এবার পাঁচজন মেয়েই ঐ হলে ঢুকে গেল, সেখানে বরের সাথে মিলন হ'ল। বাকী পাঁচজন কিন্তু তেল আনতে গেছে। অনেক পরে তেল নিয়ে যখন ফিরে এসেছে, দরজায় কড়া নাড়ছে, knock করছে। দরজা তো বন্ধ। দরজা খুলল। কিন্তু সকাল হয়ে যাওয়ায় ওদের আর বরের সাথে মিলনটা হল না।

এখানে উল্লেখযোগ্য ব্যাপারটা হল – সময় থাকতে থাকতে তেল জোগাড় করে রাখতে হবে। যেমন আপনারা নিজেদের স্বপ্ন দর্শন বলেন, শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীজীবনকৃষ্ণের দর্শন অনুভূতি ও তাদের উপলব্ধির কথা শোনেন, মনন করেন, ও সেই সব কথা নোট করেন, তা আসলে তেল জোগাড় করা। তবেই বরের সঙ্গে মিলন সম্ভব হবে। দীর্ঘদিন ধরে তেল জোগাড় করতে হবে। তবে জ্ঞানের আলোয় তিনি স্পষ্ট ধরা দেবেন। আপনি হয়ত ভাবছেন একবার জীবনকৃষ্ণকে দেখেছি আমার মিলন হয়ে গেল। কখনই না। তখন মিলন হয় নি। আপনি জানেন না তখনও একটা পর্দার আড়াল থেকে জীবনকৃষ্ণ কথা বলছেন। পুরোপুরি তাঁকে দেখা হয়নি। তাঁর স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া হয়নি। তিনিই আমি আর আমিই তিনি এইটা না জানা হলে তো মিলন হল না। এই মিলনের জন্য অপেক্ষা করতে হবে। যেদিন তিনি তাঁর সাথে এক করে নেবেন সেদিনই হবে 'তুমিই আমি, আমিই তুমি'। সেদিনই হবে সত্যিকারের মিলন। তা না হলে দূর থেকে প্রদীপের আলোয় বর দেখা হল। ওতে পূর্ণ তৃপ্তি হবে না। ওটা মিলন নয়।

কথামৃতঃ "ঠাকুর ছোট খাটটিতে বসিয়া আছেন। বেলা ১১টা হইবে। রাম প্রভৃতি ভক্তেরা ঠাকুরকে নববস্ত্র পরাইবেন। ঠাকুর বলিতেছেন – "না, না"। একজন ইংরাজী পড়া লোককে দেখাইয়া বলিতেছেন, "উনি কি বলবেন!" ভক্তেরা অনেক জিদ করাতে ঠাকুর বলিলেন – "তোমরা বলছ, পরি।"

ভক্তেরা ঐ ঘরেতেই ঠাকুরের অন্নাদি আহারের আয়োজন করিতেছেন। ঠাকুর নরেন্দ্রকে একটু গান গাহিতে বলিতেছেন। নরেন্দ্র গাহিতেছেন –

নিবিড় আঁধারে মা তোর চমকে ও রূপরাশি।
তাই যোগী ধ্যান ধরে হয়ে গিরিগুহাবাসী॥
অনন্ত আঁধার কোলে, মহানির্বান হিল্লোলে।
চিরশান্তি পরিমল অবিরল যায় আসি॥
মহাকাল রূপ ধরি, আঁধার বসন পরি।
সমাধি মন্দিরে ও মা, কে তুমি গো একা বসি॥
অভয় পদ কমলে প্রেমের বিজলী জলে।
চিন্ময় মুখ মণ্ডলে শোভে অট্ট অট্ট হাসি॥”

এই যে এখানে মায়ের কথা বলা হচ্ছে এই ‘মা’টি কে যিনি আঁধার বসন পড়ে আছেন, যিনি একাই বসে আছেন? তিনিই আছেন আর কেউ নেই, তিনি “অদ্বিতীয়া”। দ্বিতীয় আর কেউ নেই, হয় না। তাই তিনি একা বসে আছেন। আর আঁধার বসন পরে, মহাকাল রূপ ধরে। মহাকাল অর্থাৎ অনন্তকাল যেন তোমার মধ্যে ঘনীভূত হয়ে আছে। ইংরাজীতে বলা হয় "Time Personified" । তোমাকে পেলে আমার অনন্তকালকে জানা হবে। ধর্ম জগতের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ কি হতে চলেছে সব জানতে পারব। তাহলে তিনকাল ব্যপ্ত হয়ে যে আধ্যাত্মিক জগত তা তোমার মধ্যে। তোমাকে পেলেই সব পাওয়া হবে, সব জানা হবে। অতীতে রামকৃষ্ণের মধ্যে চৈতন্যের কি খেলা হয়েছিল, কি লীলা হয়েছিল তাও জানতে পারব। জীবনকৃষ্ণের মধ্যে আত্মিক চৈতন্যের বিকাশ কি হয়ে চলেছে তা জানতে পারব, আবার ভবিষ্যতে কি হবে তাও জানতে পারব। তাহলে “তুমি” কে? সেই মহাকাল রূপ ধারণ করেছ। তুমি Time Personified. তুমি একাই আছ। You only exsist. আর কেউ নেই। বহু নেই, তুমি একাই আছ। আঁধার বসনা — রহস্যময়ী তুমি সেই নিরাকার নির্গুণ ব্রহ্ম। এখানে কালী হচ্ছে সেই নির্গুণ ব্রহ্মের কথা। আর তোমাকে পেলে – ‘অভয় পদ কমলে প্রেমের বিজলী জ্বলে।’ যখন অভয়পদ লাভ করছি তোমার চরণ কমলে আমার মনটি লগ্ন হওয়াতে, আমি অভী হচ্ছি। ভয়শূন্য হচ্ছি, উপলব্ধি করছি — তুমিই আছ, আমি নেই। তাহলে তো আমার মৃত্যু হয়ে গেল – ‘চরণ ধরিব মরণ সাধিব, পিরীতির ধারা ভনে।’ প্রকৃত

পিরীতি তাহলে কি? তোমার ঐ চরণকমলে মনটি যাবে, তারপরে আমার মরণ হয়ে যাবে। একাকার হয়ে যাবে। অভয়পদ লাভ হবে আর তখনই হবে সত্যিকারের প্রেম। প্রেমের বিজলী তখনই জ্বলবে।

কথামৃতঃ “নরেন্দ্র যাই গাইলেন, সমাধিমন্দিরে ও মা কে তুমি গো একা বসি, অমনি ঠাকুর বাহ্যশূন্য, সমাধিস্থ। অনেকক্ষণ পরে সমাধি ভঙ্গের পর ভক্তেরা ঠাকুরকে আহারের জন্য আসনে বসাইলেন। এখনও ভাবের আবেশ রহিয়াছে।”

‘সমাধি মন্দিরে কে তুমি গো একা বসি’ – কথাগুলি শুনে সঙ্গে সঙ্গে সমাধিস্থ হয়ে, সেই পরম এককে তিনি অনুভব করলেন, ও তার সাথে একাকার হয়ে গেলেন।

কথামৃতঃ এখনও ভাবের আবেশ রহিয়াছে। ভাত খাইতেছেন কিন্তু দুই হাতে।

দুই হাতে কেউ ভাত খায়? আমরা অনেক সময় বলে থাকি – এই রকম হলে চার হাতে খাবি অর্থাৎ প্রাণভরে খাবি। বাইরের খাবারের দিকে তো তাঁর মন নেই! তিনি ভিতরে যে চৈতন্যের রসাস্বাদন করছেন, প্রাণ ভরে খেতে চান। বাইরের খাবারের দিকে মন থাকলে তো পরিপাটী করে খেতেন। তার মন এখন অমৃতে। তিনি অমৃত আস্বাদন করছেন।

কথামৃতঃ “নিত্যগোপালকে ভাবাবিষ্ট দেখিয়া ঠাকুর তাহাকে দু এক গ্রাস খাওয়াইয়া দিলেন।”

তাহলে নিজে যা পেয়েছেন, যে অমৃত প্রাণভরে পান করেছেন, এবার চাইছেন সেই অমৃতের স্বাদ বাকিরা পাক, পান করুক। এটি তাঁর অন্তরের চাহিদা – তা নাহলে Subjective truth হয়ে যাবে। ব্যক্তিগত সত্য হয়ে গেল। সেটা প্রকৃত সত্য তথা Universal truth (সর্বজনীন সত্য) পাওয়া হল না, তার মূল্য নাই।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ (জন্মোৎসবে ভক্তসম্ভাষণে)

ঠাকুর বলছেন, আমি নরেন্দ্রকে আত্মার স্বরূপ জ্ঞান করি; আর আমি ওর অনুগত।

তখন গিরিশ ঘোষ বলছেন – আপনি কারই বা অনুগত নন।

অর্থাৎ আপনি তো সকলেরই অনুগত। কথাটা তো পুরোপুরি ঠিক।

শুধু কি নরেনের অনুগত? এখানে অনেকেরই বুঝতে ভুল হয়ে যায়। এখানে যেমন বলছেন নরেন্দ্রকে আমি আত্মার স্বরূপ জ্ঞান করি, আবার অন্য এক জায়গায় বলছেন, রাখাল, পূর্ণ এদেরকে নিয়ে আমার কেমন ভাব জান? যেমন ঐ রামলালাকে নিয়ে হত। ঠাকুরের রামলালা হচ্ছে ছোট্ট রামচন্দ্র। সেই রামচন্দ্র বা রামলালাকে উনি নাওয়াতেন, খাওয়াতেন, আদর করতেন, বকতেন, ঠিক সেইরকম ভাবে রাখাল, পূর্ণ এদের জন্য উনি ছটফট করতেন। অত বড় ছেলে রাখাল তাকে কোলে নিয়ে উনি আদর করছেন যেন রাখাল একটি বাচ্চা ছেলে আর উনি মা যশোদা হয়েছেন। ঠিক ঐভাবে আদর করতেন। আবার পূর্ণকেও তাই। শুধু যে নরেনকে বলছেন – 'হে নারায়ণ তুমি আমার জন্য দেহ ধারণ করেছ' তাতো নয়, এদেরকেও বলছেন। পূর্ণকে বলছেন, রাখালকে বলছেন, নারানকে বলছেন। কোন একসময় বলছেন কীর্তন শুনতে শুনতে নারানের জন্য আমার মন ছটফট করতে লাগলো। ওখান থেকে উঠে গেলাম। আর একদিন পূর্ণর জন্যে জপ করিয়ে নিলে। আপনা থেকেই হচ্ছে। বলছেন, যখন আমার ভাবে জগন্নাথ দর্শন হল, তারপর পড়ে গিয়ে হাত ভাঙ্গল, তখন মা দেখিয়ে দিলেন, এখন 'নরলীলা'। এইসব ছোকরা ভক্তদের মধ্যে আমি 'মা'কে দেখতে পাই। তাহলে শুধু নরেন নয়, তাঁর কাছে যে ছেলেগুলি আসছে, প্রত্যেককে তিনি সেইভাবে গ্রহণ করেছেন। ঈশ্বরের এক একটি রূপ হিসাবে। এই হল নরলীলা। নরলীলায় বিশেষ কোন নরের কথা নয়, সব মানুষের মধ্য দিয়েই সেই একচৈতন্য খেলা করছে — এটা তিনি অনুভব করছেন। কিন্তু সাধারণ মানুষের এইখানে ভুল হয়ে যায়। এমনকি যারা ঠাকুরের সঙ্গ করেছেন, তারাও ভাবতেন ঠাকুর নরেনকে বেশি ভালবাসেন। তারা ধরতে পারেনি। কারো কারো মুখ দিয়ে বেরোচ্ছে – আমরা কি সব বানের জলে ভেসে এসেছি? শুধু নরেনের কথা বলছেন। বাস্তবে তা কিন্তু নয়। এক এক সময় হয়ত একটু বেশি প্রশংসা করে ফেলতেন। কিন্ত বাকিদের তিনি কম আদর করছেন না। রামকৃষ্ণের সঙ্গকারীদের মধ্যেও এই ভুল ধারণা হয়েছিল। স্বামীজির শিষ্য ছিল শরৎ চক্রবর্তী – উনি তাকে বাঙাল বাঙাল করতেন। একদিন খাওয়াদাওয়ার পরে স্বামীজি তাকে বলছেন, একটু ম্যাসাজ করে দে তো ! স্বামীজির শিষ্য সে,

খানিকটা দলাই মালাই করে দিলেন। স্বামীজি বিরক্ত হয়ে বলছেন – ধুৎ, তুই ম্যাসাজ করতে জানিস না। তুই রাখালকে পাঠিয়ে দে। শরৎবাবু তো অবাক। রাখাল মহারাজ তো গুরুভাই, তাকে কি করে বলবেন যে স্বামীজি আপনাকে ডাকছেন ম্যাসাজ করে দেবার জন্য? যাইহোক, ও তো তখন রাখাল মহারাজকে গিয়ে বলল, স্বামীজি আপনাকে ডাকছেন। স্বামীজির কাছে রাখাল মহারাজ আসার পর উনি বললেন, এই রাখাল, বাঙাল ব্যাটা ভাল করে পারল না। তুই একটু ম্যাসাজ করে দে তো। এরপর রাখাল মহারাজ দুঘণ্টা ধরে ম্যাসাজ করে দিলেন। স্বামীজি তৃপ্ত হলেন। শরৎবাবু পরে রাখাল মহারাজের কাছে গিয়ে বললেন, আচ্ছা এটা কি রকম ব্যাপার হল? আপনারা তো গুরুভাই ! আপনাকে দিয়ে উনি ম্যাসাজ করালেন? তখন রাখাল মহারাজ বললেন, তুমি জান না? উনি যে সাক্ষাৎ শিব। এই যে বাকিদের ধারণা হয়েছিল নরেন সাক্ষাৎ শিব, কিন্তু ওরা নিজেরাও যে শিব সেটা ভাবতে পারল না। ঠাকুর বলছেন – তোমরা এতগুলি বসে আছ, আমি দেখছি এক রামই এতগুলি হয়ে আছে। সকলেই যে রাম, বাকিদের কিন্তু সে ধারণা হল না।

কথামৃতঃ "শ্রীরামকৃষ্ণ (নরেন্দ্রাদির প্রতি) – সত্য বলছি, আমি বেদান্ত আদি শাস্ত্র পড়ি নাই বলে একটুও দুঃখ হয় না। আমি জানি বেদান্তের সার ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা।"

ঠাকুর এখানে বলছেন আমি অতশত পড়ি নাই বাপু, তবে বুঝে গেছি বেদান্তের সার – ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা। বেঁচে থাকতে গেলে, ব্রহ্মকে উপলব্ধি করার জন্য তো খাওয়ার প্রয়োজন। জগৎ যদি মিথ্যা হয় তাহলে তো খাবার কোন প্রয়োজন নেই। মাথা গোঁজার জন্য ঘর-বাড়ির প্রয়োজন। গাছতলায় তো দিন কাটাতে পারা যায় না। তাহলে "ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা" – এ কথাটার গুরুত্ব বুঝতে হবে। ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা – এই চারটি শব্দেরই মানে জানি কিন্তু 'ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা' এই কথাটার মানে জানি না। ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা কথাটার মানে কি? কোন জগতের কথা বলা হচ্ছে যেটা মিথ্যা? পারস্পরিক সম্পর্কের যে জগৎ অর্থাৎ আমার চেতনা বিক্ষেপ করে আপনাকে জ্যেঠিমা বলছি, কাউকে দিদি বলছি, কাউকে আবার ভাগ্নী, বন্ধু, দাদা বলছি — এভাবে

একটা সম্বন্ধ স্থাপন করছি। আমার relationship-এর এই যে জগৎ, আমার চেতনা বিক্ষেপ করে আমি যে জগতটাকে দেখছি, আমার একটা নিজস্ব জগৎ তৈরি করেছি এই জগতটা মিথ্যা। কাউকে কাকা বলছি, কাউকে মামা বলছি। কেউ কারো নই। কেউ আমার ছেলে নয়, কেউ আমার নাতি না, খুব কঠিন কথা। আমার চেতনা বিক্ষেপ করে ভাবছি যে আমার ছেলে, আমার মেয়ে, আমার নাতি, আমার ভাই, এই যে জগতটা, এই জগতটা হল মিথ্যা। কেননা আছে শুধু এক ব্রহ্মই। তিনিই এতগুলি হয়েছেন। কারোর সঙ্গে কারোর অন্য কোন সম্পর্ক নেই। সেই ব্রহ্মই আমার ছেলে হয়েছেন। এই ব্রহ্মই আমার বাবা হয়েছেন, সেই এক ব্রহ্মই দাদা হয়েছেন। আমার relationship এর সঙ্গে জড়িত সবাই কিন্তু মূলতঃ ব্রহ্ম। সেই একই সত্য আর তিনিই বহুরূপে প্রকাশ হয়েছেন, একটা জগৎ সৃষ্টি হয়েছে। বাইরে আপনাকে জ্যেঠিমাই বলব কিন্তু জানতে হবে যে ভিতরে জীবনকৃষ্ণই এইরূপে আমার সামনে উপস্থিত। সেই ব্রহ্মই বিভিন্নরূপে বিরাজ করছেন। এই সত্যটা আমাকে জানতে হবে। এইটাই বেদান্তের সারকথা। আপনার ছেলে হয়ত আপনার সঙ্গে ভাল ব্যবহার করল না, দুঃখ পাবার কিছু নেই। তিনিই সব হয়েছেন। তিনি প্রসন্ন হলে সেও প্রসন্ন হবে। তাঁর প্রসন্নতার উপরে সবটা নির্ভর করছে। আর এই সত্য জানলে আপনি সহজভাবে সব কিছু মেনে নিতে পারবেন। ব্রহ্ম সত্য জগত মিথ্যা এটা কঠিন কথা, কিন্তু এই উপলব্ধিটা হয়ে গেলে সে মানুষটা আর দুঃখ পাবে না। সে-ই বলতে পারবে – 'আনন্দধারা বহিছে ভুবনে।' দুঃখটাও আনন্দে পরিণত হবে। কারণ দুঃখটা কে দিচ্ছে ? ব্রহ্মই। আর ব্রহ্মের স্বরূপ কি? আনন্দ। হারুর মায়ের একমাত্র ছেলে হারু মারা গেছে – হারুর মা কাঁদছে। জীবনকৃষ্ণ বলছেন, হারুর মা জানে না। আনন্দের একটা স্রোত ওকে কাঁদাচ্ছে। ও কেঁদে হালকা হলে সেই আনন্দের স্পর্শ পাবে। ঠাকুর বলেছেন — ভক্ত যেন এক টুকরো লোহা। লোহার গায়ের মাটি অর্থাৎ মালিন্য কান্নার জলে ধুয়ে গেলে সে ঈশ্বররূপ চুম্বক পাথরের আকর্ষণ অনুভব করবে। এই সত্যটা জানতে পারলে দুঃখটা আনন্দে পরিণত হবে। সঙ্গকারীরা কেউ কেউ বলছেন – কেমন করে হবে? এ আপনি কঠিন কথা বলছেন। জীবনকৃষ্ণ বলছেন – কথামৃত পড় –

শোকাতুরা ব্রাহ্মণী কি বলছে? ওগো ঠাকুর তুমি এসেছ আমার ঘরে, আমার যা আনন্দ হচ্ছে কী বলব, আমার মেয়ে জামাই যখন লোক লস্কর নিয়ে আমার কাছে আসত, তখন তো আমার এত আনন্দ হয় নি ! আমার সেই মেয়ে মারা গেল, চরম দুঃখের দিন – কিন্তু তুমি এসেছ আমার ঘরে, আমার আনন্দ যে আর ধরে না। আমার এত আনন্দ হচ্ছে যে মনে হচ্ছে আমি আনন্দে মরে যাব। তোমরা আমায় আশীর্বাদ কর। সে ব্রাহ্মণী ধরতে পারল যে, যা তাকে কাঁদাচ্ছিল তা আসলে একটা আনন্দের ধারা। তার কাছে মায়ার আবরণটা সরে গেল বলে সে সত্য জানতে পারল, আনন্দটা উপলব্ধি করতে পারল। তা না হলে আনন্দের জগতে বসে বসে সে কাঁদত। তাহলে একটা বিশেষ বোধ, শুদ্ধ বুদ্ধি তার মধ্যে কাজ করছে। এখন প্রশ্ন হতে পারে এই বোধটা কোথা থেকে আসছে? ব্রহ্মই তাকে এই বোধটা দিচ্ছে। এই ব্রহ্মের স্বরূপ হল আনন্দ। যতক্ষণ আপনি মায়ার মধ্যে আছেন, আবরণের মধ্যে আছেন ততক্ষণ আপনি কাঁদতে পারেন। সত্য জানতে পারলে কিন্তু কান্না আসবে না। তখন শুধুই আনন্দ। 'বহে নিরন্তর অনন্ত আনন্দ ধারা'। যদিও কথাটা খুব কঠিন। বেদান্তের সার হল, ব্রহ্ম সত্য জগত মিথ্যা। ঠাকুর বলছেন, এইটা আমি বুঝে গেছি, আমি এত বই পড়ি নাই বটে। বেদান্ত পড়ে এটা জানা যাবে না। এটা উপলব্ধির বিষয়। ঠাকুর সেটা উপলব্ধি করেছেন। যারা বেদান্ত পড়ে মুখে লেকচার (lecture) দেবে, সংস্কৃতের বিভিন্ন শ্লোক আউড়াবে – তাদের অবস্থা কর্ণের মত। জীবনযুদ্ধে আসল সময়ে এসে তাদের রথের চাকা বসে যাবে। এগোতে পারবে না, সে কান্নায় ভেঙ্গে পড়বে। সামনে অর্জুন ও কৃষ্ণ কিন্তু সে ভেঙ্গে পড়ছে। কেন? সে যে কানে শোনা কথাগুলো মুখস্থ করেছে মাত্র। এটা উপলব্ধির বস্তু – উপলব্ধি করতে হবে। ঠাকুর সেকথাই বলতে চাইছেন।

বাইবেলে একটি গল্প আছে। এক রাজা তিনটে পুতুল আনিয়ে সভায় বলল, এই তিনজনের মধ্যে পার্থক্য দেখাও। তিনটে পুতুলই কিন্তু একই রকম দেখতে। বাইরে থেকে দেখে কোনরকম পার্থক্য খুঁজে পাওয়া যাবে না। কেউ পার্থক্য করতে পারছে না। তখন সবার মধ্য থেকে একটি বাচ্চা ছেলে উঠে দাঁড়াল এবং বলল, আমি পারব এদের মধ্যে পার্থক্য করতে। সবাই খুব

অবাক। কি করে পার্থক্যটা খুঁজে বের করবে ? বাচ্চা ছেলেটি তখন বলল, আমাকে একটা সরু তার দিন। রাজা জিজ্ঞাসা করল, তার নিয়ে তুমি কি করবে ? ছেলেটি বলল, দিন না! ছেলেটি তারটা নিয়ে একটা পুতুলের কানে ঢুকিয়ে দিল। কানে ঢোকানোর পর তারটা এক কান দিয়ে ঢুকে অন্য কান দিয়ে বেরিয়ে গেল। তখন সে বললো, রাজা এটা এক ধরণের পুতুল। এবার দ্বিতীয় পুতুলটার কানে তারটা ঢোকানোর পর তারের অপর প্রান্তটা পুতুলটার মুখ দিয়ে বেরোলো। তখন ছেলেটি রাজাকে বললো, রাজা এটি অন্য এক ধরণের পুতুল। তাহলে প্রথম পুতুলটি থেকে দ্বিতীয় পুতুলটির পার্থক্য একটা বেরোলো। প্রকৃতিগত ভাবে এরা আলাদা। ঠাকুর বলছেন – পুলিগুলি দেখতে একরকম কিন্তু ভিতরে পুর আলাদা। আর তৃতীয় পুতুলটার কান দিয়ে যখন তারটা ঢোকালো সেটা সোজা পেটের ভিতরে চলে গেল।...

মানুষের মধ্যেও এইরকম ভেদ বা পার্থক্য আছে। কেউ কথাগুলো এক কান দিয়ে শোনে তো আর এক কান দিয়ে বেরিয়ে যায়। এখান থেকে গিয়ে বলবে, খুব ভাল পাঠ হয়েছে। তাকে যদি জিজ্ঞাসা করো, কি আলোচনা হল, একটা কথা বলতো? সঙ্গে সঙ্গে বলবে, অতশত মনে নাই, তবে পাঠটা খুব ভাল হয়েছে। পাঠের বিষয় এক বিন্দুও বলতে পারবে না। আবার কিছু কিছু মানুষ আছে, এখান থেকে পাঠ শুনে গেল। জিজ্ঞাসা করলে যা শুনেছে মুখে ফর ফর করে সব বলে দেবে। বলবে পাঠ হচ্ছিল, বেদান্তের সার কথা – ব্রহ্ম সত্য, জগত মিথ্যা। কিন্তু কোন জগৎ মিথ্যা তা কি উপলব্ধি হয়েছে ? ব্রহ্মময় সত্যজগৎ দর্শন করে সে কি নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ উপভোগ করছে ? সে যা কানে শুনে এসেছে মুখে বলে দিল। কানে তার ঢুকে মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল। আর দু একজন থাকবে যারা বলবে 'কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল সই আকুল করিল মন প্রাণ।' তারা বলবে – আহা! আবার কবে পাঠ হবে, শুনব। কারণ তাদের পাঠের কথাগুলো হৃদয়ঙ্গম হয়েছে। তারা বলবে, ভগবান তুমি দুঃখ দাও, আমি কাঁদব না। তারা জেনেছে ব্রহ্ম সত্য, জগত মিথ্যা। তারা তো মিথ্যার জন্য কাঁদবে না। তারা জানে ব্রহ্মের স্বরূপ আনন্দ। সেই-ই নানাভাবে দুঃখ দিচ্ছে। তারা কাঁদবে না। তারা বলবে, তোমার স্বরূপ তো আনন্দ। তুমি

কেন কাঁদাচ্ছ? ঐ আঘাতে আমি ভুলব না। শুধু তোমার চিন্তা করে আমি আনন্দে কাঁদব।

কথামৃতঃ

'শ্রীরামকৃষ্ণ – আমি লালপেড়ে কাপড় পরে জয়গোপাল সেনের বাগানে গিছলাম। কেশব সেন সেখানে ছিল। কেশব লালপেড়ে কাপড় দেখে বললে, আজ বড় যে রং, লালপেড়ের বাহার। আমি বললুম, কেশবের মন ভুলাতে হবে, তাই বাহার দিয়ে এসেছি।'

আমরা দেখছি ঠাকুর লালপেড়ে কাপড় পরে রয়েছেন। গেরুয়া নয়। কারণ উনি যদি গেরুয়া পরতেন, তাহলে সাধারণ মানুষের কাছ থেকে দূরে সরে যেতেন। ওরে বাপরে মহারাজজী, সাধারণ মানুষের সাথে মিলতে, এক হতে পারতেন না। একটা দূরত্ব থেকেই যেত। কিন্তু ঠাকুর লালপেড়ে কাপড় পরেছেন। বলছেন, কেশবের মন ভোলাতে হবে। অর্থাৎ সাধারণ মানুষ যেন ভাবতে পারে যে ঠাকুর তাদের নিজেদের লোক। তাই তাঁর এই সাধারণ পোষাক। তিনি চান মানুষের মন ভোলাতে। মানুষের মন ভুলিয়ে রেখেছে মায়ার জগত। তাই ঠাকুর এবার ব্যস্ত হয়েছেন জগতের মানুষের মন ভোলাতে।

এরপরে আমরা দেখছি, নরেন্দ্র গান করবে তানপুরাটা সে বাঁধতে শুরু করেছে। অনেকক্ষণ ধরে তানপুরা বাঁধা হচ্ছে। টুং টাং আওয়াজ হচ্ছে, সকলে অধৈর্য্য হয়ে পড়ছে। বিনোদ বলছে – বাঁধা আজ হবে, গান আরেক দিন হবে। একটা সাংঘাতিক কথা উনি বলে দিলেন। আজকে তানপুরা বাঁধা হবে, গান আর একদিন হবে। অর্থাৎ ভবিষ্যতে হবে। ঠাকুর আয়োজন করছেন। তানপুরা বাঁধার কাজটি রামকৃষ্ণের জীবনে হল। কিন্তু এরপরে যে গান, সকলের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের কথার প্রকাশ, কুণ্ডলিনী সুরে জাগবে সর্ব সাধারণের মধ্যে, এইটি আর একদিন অর্থাৎ ভবিষ্যতে হবে। জীবনকৃষ্ণ লীলায় এসে হবে। এই সত্যটা কিন্তু দৈবচালিত হয়ে বিনোদের মুখ থেকে বেরিয়ে গেল – গান আর একদিন হবে।

এবার তাহলে পরের দিনে চলে যাই – যেদিন জীবনকৃষ্ণ এলেন। তার মুখ থেকে গান এবার আমরা শুনি।

জীবনকৃষ্ণ প্রথম কাজ কি করলেন? রামকৃষ্ণকে চিনতে পারেনি জগৎ। উনি জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে বহু মানুষের অন্তরে ফুটে উঠে মহাযোগী শ্রীরামকৃষ্ণকে চিনিয়ে দিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ কেশবের অর্থাৎ ভক্তদের মন ভোলাতে চান। জীবনকৃষ্ণ এসে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলছেন, তোমরা দেখ রামকৃষ্ণ কেমন মানুষ! রাম, শ্যাম, যদু, মধু আর রামকৃষ্ণ এক নয়। অনেকগুলি মহাপুরুষের মধ্যে রামকৃষ্ণও একজন মহাপুরুষ, তা নয়। উনি ব্যতিক্রম, উনি যুগাবতার। একযুগে একজন বিশেষ মানুষ আসেন, উনি সেই মানুষ। একে আমাদের চিনতে হবে। উনি ধরিয়ে দিচ্ছেন। তাঁর প্রথম কাজ সেটা ধরিয়ে দেওয়া। দ্বিতীয় কাজ মানুষের অন্তরে চিন্ময় রূপে ফুটে উঠে তাঁর সাথে এক করে নেওয়া। তখন আমরা ভিতরে বহুত্বে একত্বের মহা জাতীয় সঙ্গীত (International Anthem) শুনতে পাব।

ধর্ম ও অনুভূতিঃ ব্যাখ্যা নং **১৫** – শ্রীরামকৃষ্ণকে চেনাতে গিয়ে জীবনকৃষ্ণ ধর্ম অনুভূতির প্রথম ভাগে বলছেন – তাঁহার গায়ে মোলেস্কিনের র‍্যাপার, পায়ে চটি জুতা। পূজনীয় মাষ্টার মশাইয়ের এই প্রথম ঠাকুরের ব্যবহারিক জীবনের বর্ণনা। ঠাকুর অত বড় নামজাদা সাধু, সন্ন্যাসী, পরমহংস। না আছে তার জটা, না আছে ঝকঝকে তকতকে গেরুয়া, না আছে খড়ম, না আছে দণ্ড, না আছে কমণ্ডলু, না আছে কোন বাহ্যচিহ্ন। এ আবার কি রকম পরমহংস! ধরিয়ে দিচ্ছেন। ঠাকুর হলেন যুগাবতার। যে যুগে যা আবশ্যক যুগাবতার সেই যুগে সেই রকম জীবনযাপন করে সকলকে শিক্ষা দেন। আপনি আচরি ধর্ম শিখায় অপরে। আমরা বৌদ্ধযুগে দেখেছি 'শ্রীবুদ্ধকে', পীতাভ কাপড়ে তাঁর সমস্ত দেহ আবৃত। শ্রমণগণেরও সেই একই রকম বেশ। জগতের সাধারণ মানুষ ভক্তিভরে তাদের প্রণাম করল। কিন্তু দূরে দাঁড়িয়ে রইল, তাদের পাশে গিয়ে বসল না। কারণ সাধারণ মানুষের ঝকঝকে কাপড় নেই। আর ঐ বিদ্যা ও প্রতিভাও নেই। বুদ্ধদেবের জীবন তারা যাপন করতে পারছে না।

পরবর্তীকালে এলেন শঙ্করাচার্য্য। তারও পাণ্ডিত্য বিরাট, সঙ্গে যারা রয়েছেন তাদের সঙ্গে বিচার করছেন। তারাও সকলে পণ্ডিত লোক। সাধারণ মানুষ তো আর পণ্ডিত নয়। সাধারণ মানুষের কতটুকু জ্ঞান! তারা মুখ্য

অগ্নিকে করে দিল মুখাগ্নি। তারা কত বড় পণ্ডিত ! মুখ্য অগ্নি চিতাতে কে দেবে কথাটা অপভ্রংশ হয়ে দাঁড়িয়েছে মুখাগ্নি দেবে কে? এই তো সাধারণ মানুষের জ্ঞান। মুখাগ্নির কথা শাস্ত্রে কোথাও নেই। ওখানে বলা হচ্ছে, ওঁ দেবাশ্চ মুখাঃ সর্বে হুতাশনং গৃহীত্বা এনং দহন্তু – অর্থাৎ হে সর্ব দেবতার মুখ স্বরূপ অগ্নি তুমি এই মৃতদেহ গ্রহণ করে দহন কর। মুখাগ্নির মূল মন্ত্রটার অর্থ কিন্তু এই। আমরা এটাকে মুখাগ্নি করে দিলাম। এই তো পাণ্ডিত্য আমাদের। যদি বলি শংকরাচার্য্যকে আদর্শ করব, হবে? এছাড়া স্বামীজি বলেছেন, শঙ্করাচার্য একজন পণ্ডিত মাত্র, সত্যদ্রষ্টা নন। তাহলে শংকরাচার্য্য সাধারণ মানুষের আদর্শ হতে পারে না। এরপরে আমরা পেলাম রামানুজকে। শ্রী শংকরের নূতন সংস্করণ, উপরন্তু কঠোর আচার। মনুষ্যজাতির সেই প্রাণভরা ভক্তি – আর দূরে সরে যাওয়া। মানুষ তার সাধারণ জীবনযাত্রার কোন চিহ্ন দেখতে পেল না সেখানে। সে হতাশ হয়ে ফিরে গেল।

স্থান—গম্ভীরা—শ্রীক্ষেত্র। বসে আছেন – আমার সোনার গৌরাঙ্গ হে। সেই বরবপু – কিন্তু কটিদেশে কৌপীন – তাও আবার শ্মশানের ছেঁড়া ন্যাকড়া মাত্র। শ্মশানের ছেঁড়া ন্যাকড়া গেরুয়ায় ছুপিয়ে সেটা নেংটি করে পরে আছেন। কি শীত, কি গ্রীষ্ম কোন ভ্রুক্ষেপ নেই। ঐ একটুখানি কৌপীন তার পরণে। সর্বদাই কৃষ্ণ কৃষ্ণ করছেন। এমনকি ঘুমের ঘোরেও কৃষ্ণ কৃষ্ণ করে চলেছেন। ঠোঁট নড়ছে। কিন্তু সাধারণের পক্ষে এও কি সম্ভব? আপনি তো দেড় ঘণ্টা পাঠ শুনছেন। সারাদিন পারবেন পাঠ শুনতে? কারোর পক্ষেই সম্ভব নয়। আর মহাপ্রভু সর্বক্ষণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ করছেন। যখন ঘুমাচ্ছেন, যে পাহারা দিচ্ছে সে (গোবিন্দ) দেখছে যে মহাপ্রভুর ঠোঁট দুটি নড়ছে। নিদ্রার মধ্যেও মুখে কৃষ্ণ নাম জপ করছেন। একি সাধারণ মানুষের পক্ষে সম্ভব? মহাপ্রভুর মা তাঁকে কাঁথা পাঠিয়ে দিয়েছেন। তিনি কাঁথাটি যত্ন করে রেখে দিয়েছেন নিজের কাছে। ফেরত দেননি আবার ব্যবহারও করেন না। ফেরত পাঠালে পাছে মা কষ্ট পান। ছোট্ট একটি বালিশও মা পাঠিয়েছেন। কিন্তু উনি নিজের হাতটাকেই বালিশ করেন। একি কোন মানুষের পক্ষে সম্ভব? শীতে আমাদের লেপ কাঁথা কত কি দরকার হয়। আর উনি একটা কাঁথাও নেননি। শীতে কষ্ট হবে মনে করেই তো

মা কাঁথাটা পাঠিয়েছেন? একি কেউ পারে? গায়ে কিছুই নেই। শুধু ঐ কৌপীন পড়ে আছেন। আবার যখন খাচ্ছেন – কলা পাতায় ভাত, বাসনায় তরকারী খাচ্ছেন। কোন ধাতু দ্রব্য ব্যবহার করবেন না। অপরদিকে ঠাকুরের গায়ে র‍্যাপার, পায়ে চটি জুতা। অথচ ঠাকুর আমার পরমহংস! দৈবী মাষ্টারমশাই জগতকে আশ্বস্ত করলেন। শীতে আমিও গায়ে গরম কাপড় দিই, পায়ে চটি জুতা পরি। ঠাকুরের জীবন — এতো আমারই জীবন। তবে ঠাকুর মাকে পেয়েছেন – আমি কি করে পাই!

তাই ঠাকুরের শ্রীমুখের বাণী – "চাঁদামামা সকলকার মামা"। ঈশ্বর সকলকার। ঠাকুর ভগবানকে পেয়েছেন – আমিও পাব।

চাঁদা মামা সকলকার মামা। কি অদ্ভুত কথা। ঈশ্বর সকলকার। মানুষকে তিনি আশ্বস্ত করছেন। এতদিন আমরা জানতাম যে সন্ন্যাসীরাই একমাত্র ভগবানকে পেয়েছে, আমাদের ধর্ম হল ঐ সন্ন্যাসীদের খাওয়ানো। তাদেরকে খাওয়ালেই আমাদের ধর্ম হবে। ঠাকুরই প্রথম বললেন, নাগো – তোমাদেরও ধর্ম হবে। কি করে বুঝব ঠাকুরের কথা? আমরা দেখছি উনি রাখালকে খাইয়ে দিচ্ছেন। যেন বলতে চাইছেন, তোমরাও খাও। ঈশ্বর সকলকার। আমি যা পেয়েছি এতে তোমাদেরও অধিকার আছে, তোমরাও খাও। জীবনকৃষ্ণের যুগে এসে যখন গান শুরু হল আমরা দেখলাম – উনি সকলের মধ্যে চিন্ময় রূপে ফুটে উঠে, তাদেরকে সেই ব্রহ্মানন্দ সেই ঈশ্বরীয় আনন্দ দান করতে লাগলেন। চৈতন্যের রস আস্বাদন করাতে লাগলেন। এই হল খাইয়ে দেওয়া। রামকৃষ্ণ বাইরে খাওয়াচ্ছেন নিত্যগোপাল, রাখাল ইত্যাদিকে। এই যে কথাগুলো বলছেন – অমৃতের কথা, ঈশ্বরতত্ত্ব, সব কিন্তু বাইরে। এক কান দিয়ে শুনে আর এক কান দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। কেউ আবার লিখে রাখল, এইটুকুই। ভিতরে বোঝা হল না। তারটা পেট অবধি গেল না। এই যুগে তাই নতুন ব্যবস্থা। উনি ভিতরে দেখা দিয়ে সেই আনন্দ আস্বাদন করাচ্ছেন। কিন্তু জীবনকৃষ্ণকে দেখার পরেও কি পেটে গেল? পেট অবধি গেলে পুষ্টি লাভ হবে। বলছি – দারুণ খেতে। আইসক্রিমের মত একটু চেটে নেওয়া হয়েছে। পেট অবধি যেতে হবে তো খাবারটা। হৃদয়ঙ্গম করাটা হচ্ছে না। ধারণায় আসছে না। কেন? ছোটবেলায়

করা অঙ্কের মত। একটা তৈলাক্ত বাঁশে বাঁদরটা উঠছে আবার পড়ে যাচ্ছে, সেই রকম।

আমরা যখন স্বপ্ন দেখছি – অন্যরকম একটা ভাব। তারপর বেশ কিছুদিন স্বপ্ন না দেখলে, চর্চায় না থাকলে সংসার অন্যদিকে মনটাকে নিয়ে চলে গেলে আবার আর পাঁচটা সাধারণ মানুষের মত আমারও রাগ, জেদ, হিংসা হচ্ছে। দেখে নেব, জানে না আমি কে? – আমাদের মধ্যেও সেই জৈবীভাব চলে আসছে। ঐ তৈলাক্ত বাঁশে উঠতে গিয়ে আবার তাহলে ঝট্ করে নেমে গেলাম। যতটা উঠছি কখনও কখনও তার থেকে বেশি নেমে যাচ্ছি। তাহলে পেটে কখন যাবে? কখন আমাদের আর বিচ্যুতি ঘটবে না ? এ প্রসঙ্গে ঠাকুর এক জায়গায় বলছেন – নরেন্দ্রকে আত্মার স্বরূপ দেখি। এটা মুখে বললে হবে না। এক করে নিতে হবে। এক সময় বলছেন – তুই আর আমি কি আলাদা রে? তুই আর আমি এক। রামকৃষ্ণ বাইরে বলছেন আর জীবনকৃষ্ণে এসে দেখছি তিনি ভিতরে ফুটে উঠে সেকথা বলছেন। তাতেও হচ্ছে না। 'তুই আর আমি এক' – স্বপ্নে দেখা দিয়ে বললেও কেন এক হচ্ছি না? কারণ তখনই একত্ব লাভ হবে, যখন আপনার দেহস্থ নির্গুণের শক্তি জাগ্রত হয়ে দেহজ্ঞান ঘুচে গিয়ে আপনারও এই বোধটা আসবে যে – 'আমি দেহ নই, আমি আত্মা তথা অখণ্ড চৈতন্যের সাথে এক' – এই দেহটা আমার ঘর। স্বপ্নে কাকে দেখছি ? 'আত্মাপুরুষ'কে দেখছি। এই স্বপ্নদৃষ্ট জীবনকৃষ্ণ আমারই সত্তা। তাঁর সঙ্গে একত্বলাভ হলে আর বিচ্যুতি হবে না।

আমার একত্বলাভ হলে অপরে তার প্রমাণ দেবে। এটা বুঝতে সম্প্রতি শোনা একটা স্বপ্নের কথা এখানে বলা যেতে পারে। ইলামবাজারের চৈতী রায় স্বপ্ন দেখছে, তার ভাসুর (উনি পাঠে আসেন) আত্মা হয়ে গেছেন। তার দেহ নেই। দাদা তো নেই, তাই বৌদি পড়াশুনো করছে, দাদার চাকরীটা পেতে হবে। সংসারটা তো চালাতে হবে। দাদার দেহ নেই। মনে ভাবছে বৌদি যে চাকরী করবে, অনেক অসুবিধা আছে। দাদা তো খুব দাপুটে লোক ছিল, বাকি Staff-রা দাদার বিরুদ্ধে ছিল। তারা বৌদিকে জ্বালাতন করবে। তখন অদৃশ্য থেকে দাদা বলছে – না না। আমি তখন দেহ নিয়ে দেখা দেব ওদের, তাতে ওরা ভয়

পেয়ে যাবে, চিন্তা নেই। এই রকম কথা চলছে। হঠাৎ দ্রষ্টা দেখছে দাদা অর্থাৎ ওর ভাসুর ঘরে ঢুকছে দেহধারী হয়ে। ও তো অবাক। ও তখন বলছে – তোমাকে নিয়ে আমরা ভাবছিলাম। তুমি দেহধারণ করে এসেছো, খুব ভাল হয়েছে। কিন্তু দেখছে গেঞ্জিটা উল্টো করে পরা। গেঞ্জির সামনে বোতাম ছিল। এখন দেখছে বোতাম দুটি পিছন দিকে লাগানো। আর সব হুবহু একই। স্বপ্ন শেষ। নিশ্চিন্ত হল, মনে আনন্দ, আর কোন সমস্যা নেই। তবে ওর খুব অবাক লাগছে যে গেঞ্জিটা কেন উল্টো করে পরা। এখানে কি বলা হচ্ছে? আপনার যদি একত্বলাভ হয়, "আত্মা পুরুষ" জীবনকৃষ্ণের সাথে, যিনি আত্মা সাক্ষাৎকার করেছেন, তাঁর সাথে একত্বলাভ হলে, অপরে প্রমাণ দেবে যে আপনার একত্বলাভ হয়েছে, আপনি "আত্মা" হয়ে গেছেন। অর্থাৎ দেহজ্ঞান আপনার নেই। কিন্তু আমাদের দেহজ্ঞান আবার ফিরে আসে। যখন আমরা চর্চা করছি, স্বপ্ন দেখছি, দেহজ্ঞান চলে যেতে পারে, যদি একত্বলাভ হয়। দেহজ্ঞান আবার আসবে, আবার যাবে। যেমন অশ্বত্থ গাছের ডাল আজ কেটে দাও কাল আবার ফেঁকড়ী গজাবে। কিন্তু গেঞ্জি উল্টো করে পড়া মানে, কথামৃতে reference আছে যে "মা মুখ বাঁকিয়ে দিয়েছে।" অর্থাৎ মন অন্তর্মুখী হবে। আপনাকে দেখে আমার অন্তরের অন্তরতম মানুষটির কথা, জীবনকৃষ্ণের কথা, ভগবানের কথা মনে পড়বে। এবং আপনার সঙ্গে ঈশ্বরমুখী আলোচনা হবে। যোগমুখী আলোচনা হবে, ভোগমুখী আলোচনা নয়। আর এই পরিবর্তনের প্রমাণ অন্য লোকে দেবে। এটা হতে হবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন, কেশব না থাকলে কলকাতায় গেলে আমি কার সঙ্গে কথা কব? তাহলে কলকাতায় কি কেশব ছাড়া আর কোন লোক নেই ? আছে, কিন্তু কেশব একমাত্র লোক যার সাথে অনুভূতিমূলক ধর্মের কথা চলবে, সে বুঝবে, ভিতরের জিনিষটা সে নিতে পারছে। এইরকম ভক্ত ছাড়া ঐ বিষয়ী লোকদের সঙ্গে আবোল তাবোল কথা ভাল লাগবে না। তারা ঠাকুরের কথার গুরুত্ব বুঝবে না। এ কান দিয়ে ঢুকিয়ে ঐ কান দিয়ে বার করে দেবে। জিনিষটা নিতে পারবে না, গুরুত্ব দিতে পারবে না। তাহলে এসব কথা যে বুঝবে সেই রকম ভক্ত আমি চাই। তার সঙ্গে কথা বলে শান্তি পাব। এই লক্ষণ দেখি

রামকৃষ্ণের জীবনে। এই লক্ষণ আপনাদের জীবনেও ফুটবে যদি একত্বলাভ হয়। সেই যুগে আমরা পৌঁছে গেছি। আমরা এই লক্ষণগুলি দেখব। পাঠও শুনলেন আবার পাঠ থেকে বেরিয়ে পরনিন্দা পরচর্চা করবেন এই যদি চলে, তাহলে কিন্তু বুঝতে হবে, লাভের ঘরে শূন্য, একত্বলাভ হয় নি। আমরা যারা পাঠে আসি, আমাদের পরনিন্দা পরচর্চা নিয়ে থাকলে হবে না। পৃথিবীতে সব লোকই এই নিয়ে আছে। আমরাও কি তা-ই করব? এই সুধা দুগ্ধ পাবার পরেও? রবীন্দ্রনাথের গানে আছে – 'তোমার কথা হেথা কেহ তো বলে না করে শুধু মিছে কোলাহল। সুধা সাগরের তীরেতে বসিয়া পান করে শুধু হলাহল।' আমরা সুধা সাগরের তীরে বসে আছি কিন্তু শুধু বিষ পান করছি। মিছে করে শুধু কোলাহল – ভাবটা এই যেন খুব ঠাকুরের কথা বললাম। খুব কীর্তন করলাম। কি কীর্তন হল? কোলাহল হল। যোগের কথাই নয়। বাইরের গল্প শুনিয়ে দিলে, রাধাকৃষ্ণের প্রেমকাহিনী শুনিয়ে দিলে – এ বাইরের কথা। যোগে বলো রাধাটা কে? এই কুলকুণ্ডলিনী শক্তি, আদ্যাশক্তি ব্রহ্মে পরিণত হয় কিভাবে? কিভাবে হয় তার অভিসার যাত্রা – তার বর্ণনা দাও। হৃদি বৃন্দাবনের কথা বল। তা না বলে শুধু বাইরের কথা। ফলে প্রত্যেক বছর বৃন্দাবনে ভিড় বাড়ছে। কীর্তনীয়া বাইরের বৃন্দাবন নিয়ে পড়ে আছে। কোলাহল হচ্ছে, ঠিক ঠিক ঠাকুরের কথা হচ্ছে না। ঈশ্বরীয় কথা বলা হচ্ছে না। এই ঠিক ঠিক ঈশ্বরীয় কথা বলেছেন রামকৃষ্ণদেব। তাহলে ধর্ম কথা বলতে গেলে রামকৃষ্ণের কথা আলোচনা করতে হবে। ধর্ম কথা বলতে গেলে জীবনকৃষ্ণের কথা আলোচনা করতে হবে। আর লক্ষ্য হচ্ছে সেই আত্মিক একত্ব, যে একত্ব প্রতিষ্ঠা হলে এই লক্ষণ বা প্রমাণগুলো ফুটবে। আপনার অন্তর্মুখী মনের পরিচয় আমরা পাব। যতক্ষণ আপনি দ্বৈতবাদে আছেন, শ্রীরামকৃষ্ণের কথার মধ্য দিয়ে আপনাকে চৈতন্যের রসাস্বাদন করতে হবে। তারপরে জীবনকৃষ্ণকে ভিতরে দেখতে দেখতে যখন বুঝবেন যে সেই ভগবান আপনারই ভিতরে, এবার কিন্তু আপনার যাত্রা আরো এগোলো। আপনি অদ্বৈতের পথে এগিয়ে এলেন। দ্বৈতবাদ থেকে সরে এলেন। তা নাহলে লোকে বলবে আমরা কালীপূজা করি, ওরা রামকৃষ্ণের পূজা করে। জীবনকৃষ্ণের পূজা করছে। আমরা কৃষ্ণ কৃষ্ণ করি, ওরা জীবনকৃষ্ণ

জীবনকৃষ্ণ করছে। তফাৎটা এই। ওরা যে কৃষ্ণ কৃষ্ণ করছে সেই কৃষ্ণ তো বৃন্দাবনে আছে। ওইখান থেকে remote control দিয়ে আমাদেরকে control করছে। কিন্তু আমরা যে জীবনকৃষ্ণের কথা বলছি, সেই জীবনকৃষ্ণ হাওড়া কদমতলায় নেই। সেই জীবনকৃষ্ণ আছেন প্রত্যেকটি মানুষের হৃদি মন্দিরে, হৃদি বৃন্দাবনে। অর্থাৎ আমি যে জীবনকৃষ্ণের কথা বলছি সেই জীবনকৃষ্ণ আমার স্বরূপ আমার ভিতরের ভগবানের কথা বলছি। আর তিনি সকলেরই স্বরূপ। এইখানেই মূল পার্থক্য (basic difference)। আমরা বাইরের কাউকে পুজো করছি না। আমারই প্রাণচৈতন্য জীবনকৃষ্ণের রূপ ধারণ করে দেখা দিচ্ছেন, শিক্ষা দিচ্ছেন। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় – "প্রাণেতে আমাতে করিব খেলা, নিশীথ বেলা।" রাত্রিবেলায় যখন স্বপ্নে দেখছেন জীবনকৃষ্ণকে তখন প্রাণের সাথে খেলা চলছে, আমার প্রাণের স্বরূপ জীবনকৃষ্ণ রূপ ধারণ করে আমাকে শিক্ষা দিচ্ছে। আমিই আমার গুরু। শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন – তুমিই তোমার গুরু। যখন আমরা জীবনকৃষ্ণের মাহাত্ম্য আলোচনা করছি তখন এটা বাইরের কাউকে পুজো করা নয়। আমার ভিতরের চৈতন্য ঐ রূপ ধারণ করে আমাকে শিক্ষা দিচ্ছেন। এ হচ্ছে অদ্বৈতবাদের সূচনা। যতক্ষণ বাইরে ততক্ষণ দ্বৈতবাদ। এই বাইরে থেকে ভিতরে মন আসার জন্য রামকৃষ্ণকথামৃত পড়তে হবে। তার দেহতত্ত্বের ব্যাখ্যা জানতে হবে। এবার অন্তর্জগতে দ্বৈতবাদে আপন চৈতন্যের রসাস্বাদনের পরে জীবনকৃষ্ণের দর্শন অনুভূতি এবং অদ্বৈতবাদে তাঁর বিশ্লেষন ধরে ধরে এগোতে হবে। এগোতে এগোতে আমাদের লক্ষ্য হবে তাঁর সাথে একত্বলাভ। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন, মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্য – ভগবান দর্শন, ভগবান লাভ। তারপরের stage এ বুঝতে হবে এ ভগবান বাইরে নয়, ভিতরে। তারপরে বুঝতে হবে তিনি আর আমি এক। ঠাকুর বলছেন, তুই আর আমি কি আলাদা রে? তুই আর আমি এক। পরে বুঝতে হবে সব মানুষই অত্মিকে এক। বহুত্বে একত্ব উপলব্ধি করতে হবে। এই একাকার বোধের জগতে তিনি আমাদের নিয়ে যাচ্ছেন। এ কথাটা শুনতে যতটা সহজ বাস্তবে ততটা সহজ নয়। এখানে আমাদের সব সময় মনন এবং আত্মবিশ্লেষণ করতে হবে। আমার কী হয়েছে? আর কতদূর আমি এগোতে পারছি। আপনার যদি

একত্রের চেতনা লাভ হয় – It must be objective truth. Subjective হলে হবে না। আমার নিজের মনে হল, ভাল লাগলো বললে হবে না। অপরে তার প্রমাণ দেবে। আপনার ক্ষেত্রেও অপরে তার প্রমাণ দেবে তবে হবে। তখন আপনার ঘরে থাকা হল অর্থাৎ তখন আপনার অন্তর্মুখী হয়ে থাকাটা হবে। তা নাহলে ঘর করেছেন কিন্তু ঘরে থাকছেন না। বাইরে বাইরেই ঘুরে বেড়াচ্ছেন আপনি। ঘর একটা হল কিন্তু বাইরেই থাকা হল। আমার দেহ ঘরে গৃহপ্রবেশ হল না। গৃহপ্রবেশ যথাযথ তখনই হবে যখন আপনার অন্তরস্থ নির্গুণ ব্রহ্মের সাথে একত্বলাভ হবে। তখন আপনার মন পুরোপুরি অন্তর্মুখী। স্থায়ীভাবে অন্তর্মুখী হবে। তখন অন্তর্জগতের ঐশ্বর্য দেখতে পাবেন – ঘরটা কত সুন্দর করে সাজানো হয়েছে আপনি নিজেই উপলব্ধি করবেন। নিজের ঘর দেখে নিজেই আনন্দে আপ্লুত হবেন। 'যা চাবি তা খুঁজে পাবি খোঁজো নিজ অন্তঃপুরে।' ঘরের মধ্যে সব পাওয়া যাবে। সমস্ত রকম প্রাণের ঐশ্বর্য্য। আর একত্ব হলে চাঁদামামার কোলে বসা হবে। একত্ব না হলে চাঁদামামার কোলে বসা হচ্ছে না। এমনকি যে জীবনকৃষ্ণের ঘরে গেছে তাঁকে স্বপ্নে দেখেছে সেও জীবনকৃষ্ণের কাছ থেকে দূরে আছে। একত্ব হয়নি, তার স্বরূপ হৃদয়ঙ্গম হয়নি। এই হৃদয়ঙ্গম যে হয়নি তার প্রমাণ সে তখন গুরুগিরি করবে। কানে মন্ত্র সে দেবে না তবে নানারকম নিয়ম চালু করবে। আর হৃদয়ঙ্গম হলে সে গুরুগিরি করতে পারবে না। সে তখন সকলের অনুগত হয়ে যাবে। ঠাকুর বলছেন না? আমি সকলের অনুগত। ঠাকুরের যে ঈশ্বরের সাথে একত্বলাভ হয়েছে ! ঈশ্বরলাভ হলে তিনি সকলের অনুগত হয়ে যান। সে কারোর গুরু হতে পারবে না। তাই ঠাকুর বলছেন, আমার মেদি ভাব। তার মধ্যে কিছুতেই ego জাগে না। গুরুভাব জাগবে না। সে গুরুগিরি করবে না। সে জানে এক অখণ্ড চৈতন্যই আছে। আর তা আপন ছন্দে আপনি বিকশিত হচ্ছে।

তবে নিরন্তর অনুশীলন চালিয়ে যেতে হবে। এই প্রসঙ্গে রেণু মুখার্জীর সাম্প্রতিক দেখা একটি স্বপ্ন শোনা যাক্।

"আমি পাঠে যা কানে শুনেছি, লিখেছি – শিবরাত্রির চার প্রহর সম্পর্কে। গত বছর February মাসে। হঠাৎ মনে হল আমি যে এত লিখেছি – কৈ

অনুশীলন তো করি না। লেখাগুলো মনে হচ্ছে আমার কাছে বিপদের মতন। এই লেখাগুলো নিয়ে আমি কি করব? রাত্রিতে এইসব চিন্তা করে শুয়েছি – দেখাচ্ছেন– একজন পুরুষ মানুষ ঢুকল। তার দাঁড়ি গোঁফ রয়েছে, হাতে ত্রিশূল। দেখছি সে স্নেহময়, আমার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। এবার বলছে - - কি করবেন? এই লেখাগুলো কি ফেলে দেবেন? কথা বলতে বলতে স্নেহময় ত্রিশূলটা আমার পাশে রাখল। আমি তখন ওকে বলছি, দেখো এগুলি যেন আমার বিপদ ডেকে আনছে। তখন ও কান্না ভেজা গলায় বলছে জ্যেঠিমা – এগুলো আপনার বিপদ নয় – এগুলোই আপনার সম্পদ। এগুলো আঁকড়ে ধরে থাকুন।” এই হল স্বপ্ন।

দেখাচ্ছে পাঠ এক কান দিয়ে শুনে আর এক কান দিয়ে বের করে দিলে হবে না, পাঠের বিষয়গুলি বার বার স্মরণ ও মনন করতে হবে, জাবর কাটতে হবে, তবে তা ঠিক ঠিক হৃদয়ঙ্গম হবে।

পাঠ পরিক্রমা – ২

গত ২৪শে মার্চ ২০১৯, কলকাতার সখের বাজারে ঁগীতা ঘোষের বাড়ীতে যে পাঠ হয়েছিল তার অংশ বিশেষ এখানে তুলে ধরা হল।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত ২য় ভাগ, দশম খণ্ড, চতুর্থ পরিচ্ছেদ থেকে পাঠঃ- “শ্রীরামকৃষ্ণ (কেশবের প্রতি) — ব্রহ্মজ্ঞানীরা অতো মহিমা বর্ণনা করে কেন ? ‘হে ঈশ্বর তুমি চন্দ্র করিয়াছ, সূর্য্য করিয়াছ, নক্ষত্র করিয়াছ’ ! এসব কথা এত কি দরকার ? অনেকে বাগান দেখেই তারিফ করে। বাবুকে দেখতে চায় ক’জন ? বাগান বড় না বাবু বড় ?”

ব্রাহ্মরা এত বেশি বাইরের কথা বলে কেন ? কারন তাদের মন বহির্মুখী। বাইরের ঐশ্বর্য্য দেখে অবাক হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু ভগবানকে জানার আন্তরিক ইচ্ছা নেই। ঈশ্বর মহান কেননা তিনি এত সুন্দর চাঁদ করেছেন, নক্ষত্র করেছেন, সূর্য্য করেছেন, সাগর করেছেন, কত বিউটিফুল ফুল করেছেন। এসব বাইরের কথা, কিন্তু আমি তাকে জানতে চাই, তিনি কে, তিনি কেমন ? তাকে জানতে গেলে মন অন্তর্মুখী হতে হবে। কারণ সেই বাবুর বাস আমাদের অন্তরে, মানুষের দেহের ভিতরে। সেই দিকে মনটা দিতে হবে। তখন বাইরের জিনিষের দিকে আর নজর পড়বে না। বোঝা যাবে বাগানের চেয়ে বাবু বড়।

কথামৃত ঃ— “শম্ভু বলেছিল, — আর এখন এই আশীর্বাদ করো, যাতে এই ঐশ্বর্য্য তাঁর পাদপদ্মে দিয়ে মরতে পারি। আমি বললুম, এ তোমার পক্ষেই ঐশ্বর্য্য, তাঁকে তুমি কি দিবে ? তাঁর পক্ষে এগুলো কাঠ মাটি।”

কি আশ্চর্য্য ! আমরা যাকে ঐশ্বর্য্য মনে করছি, যেমন ভগবানকে একটা মন্দির গড়িয়ে দিলাম, কিংবা মা কালীর জন্য একটা সোনার পায়ের মল গড়িয়ে দিলাম, আবার সোনার খড়্গ কেউ গড়িয়ে দিচ্ছে, একটা কানের দুল গড়িয়ে দিচ্ছে, কেউ আবার গলার হার গড়িয়ে দিচ্ছে। কত রকম করে। যেন মায়ের কিছু নেই, কিছুদিন পর শোনা যাচ্ছে তা আবার চুরি হয়েও যাচ্ছে। তাই ঠাকুর বলছেন, ভগবানের কাছে এগুলো ঐশ্বর্য্য নয়। তাহলে ভগবানের কাছে

ঐশ্বর্য্য কোনটা ? টাকা পয়সা গয়না গাটি যদি ঐশ্বর্য্য না হয়, তাহলে ভগবানের কাছে ঐশ্বর্য্য কোনটা ? ভগবানের কাছে ঐশ্বর্য্য হল আত্মিক ঐশ্বর্য্য। যেমন ব্যষ্টির সাধনে ঠাকুরের সমাধি হচ্ছে, কুণ্ডলিনীর জাগরণ হচ্ছে, অর্দ্ধবাহ্য অবস্থা হচ্ছে — এই যে নানা রকম যোগের লক্ষণ প্রকাশ পাচ্ছে এইগুলো হচ্ছে ঐশ্বর্য্য। এছাড়া আছে নানাবিধ ঈশ্বরীয় দর্শন অনুভূতি। ভগবানের দেওয়া ঐশ্বর্য্যই ভগবানকে দিতে হবে। ধরা যাক্ আপনার একটা সুন্দর দর্শন হয়েছে, তার মধ্যে অপূর্ব একটা শিক্ষা আছে। সেই দর্শনের কথাটা চেপে যাবেন না, আপনি বলুন জগতের মানুষকে। তাই শ্রীমতী বলছে, শ্যাম কঙ্কন হাতে দিয়ে সই গরব করে চলে যাব। এটা গর্ব করার বস্তু। এটা ঈশ্বরকে দেব অর্থাৎ জগতের মানুষের কাছে দর্শনটা নিবেদন করব। দর্শন অনুভূতির মধ্যে যে বার্তাটা আছে তা আমরা আলোচনা করব। তবে সেটা ঈশ্বরকে দেওয়া হোলো, কেননা ঈশ্বর এক আবার বহু। বহু রূপে এক ঈশ্বরই তো আছেন। তাকে আপনি বলছেন। তাঁর দেওয়া ঐশ্বর্য্যই তাকে দেওয়া যায়। এটা হোলো ব্যষ্টির সাধনে। বিশ্বব্যাপিত্বে জীবনকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য হোলো — অন্য মানুষ দেখছে তাঁর আত্মিক অবস্থা। সেই ধরণের দর্শন অনুভূতি যখন আমরা শুনছি, সেইগুলো যখন আলোচনা করছি তখন কিন্তু তাঁর ঐশ্বর্য্য তাঁকেই দান করা হচ্ছে।

এবার সমষ্টিতে ঐশ্বর্য্যটা কি ? ব্যষ্টি বা বিশ্বব্যপিত্ব কোনোটাই আমাদের নয়, আমাদের হল সমষ্টির সাধন। সমষ্টির সাধনে ঐশ্বর্য্য হোলো একত্বের অনুভূতি। যখন আপনি একত্বের কোনো অনুভূতি বলছেন, সেখান থেকে শিক্ষা নিয়ে কথা বলছেন, তখন মনে হবে এটা আমারও অন্তরের কথা, খুব মিলে যাবে, একটাই সুর, একটাই ছন্দ ধ্বনিত হবে। আপনার অনুভূতি শুনে, আপনার কথা শুনে মনে হবে ওটা আমারও কথা। এই অনুভূতি আমাদেরকে একত্ব বোধ দান করে বোঝায় যে আমরা আত্মিকে এক। তখন আমরা পরস্পর পরস্পরকে খুব আপনার জন হিসাবে উপলব্ধি করতে পারি। একত্বের সাধনের তথা সমষ্টির সাধনের ঐশ্বর্য্য হচ্ছে একত্বের বোধ, একত্বের অনুভূতি।

কথামৃত ঃ— "যার যেমন ভাব সে ঈশ্বরকে তেমনই দ্যাখে। তমোগুণী ভক্ত, সে দেখে মা পাঁঠা খায়, আর বলিদান দেয়। রজোগুণী ভক্ত নানা ব্যাঞ্জন ভাত

করে দেয়। সত্ত্বগুণী ভক্তের পুজোর আড়ম্বর নাই। পুজো লোকে জানতে পারে না। ফুল নাই, তো বিল্বপত্র, গঙ্গা জল দিয়ে পুজো করে। দুটি মুড়কি দিয়ে কি বাতাসা দিয়ে শীতল দেয়। কখনও বা ঠাকুরকে একটু পায়েস রেঁধে দেয়।"

"আর আছে, ত্রিগুণাতীত ভক্ত। তাঁর বালকের স্বভাব। ঈশ্বরের নাম করাই তার পূজা। শুদ্ধ তাঁর নাম।"

মা পাঁঠা খায় না। আসলে ভক্তের নিজের পাঁঠা খাবার ইচ্ছা। আর ত্রিগুণাতীত ভক্ত কী হয় ? তিন গুণের অতীত হয়ে গেলে সে কী আর ভক্ত থাকবে ? এখানে ত্রিগুণাতীত ভক্ত বলতে ঠাকুর নিজেকে বোঝাচ্ছেন। কারণ বেদান্ত সাধনের শেষে তাঁর জড় সমাধি হোলো, ত্রিগুণাতীত হলেন। ব্রহ্মজ্ঞান হোলো। এর পরে নিগমে নেমে তার পাকা ভক্তি লাভ হচ্ছে অবতার তত্ত্বে। সেই জন্য বলছেন ত্রিগুণাতীত ভক্ত। বস্তুতঃ ত্রিগুণাতীত অবস্থায় ভক্তি থাকে না। তখন জ্ঞানে উত্তরণ হয়। যেহেতু জড় সমাধির পরে তিনি পাকা ভক্তি নিয়ে ছিলেন তাই তিনি নিজেকে ত্রিগুণাতীত ভক্ত বলছেন।

কথামৃত ঃ— "তুমি মনে করছ সব ফুরিয়ে গেল। কিন্তু যতক্ষণ রোগের কিছু বাকী থাকে, ততক্ষণ তিনি ছাড়বেন না। হাসপাতালে যদি তুমি নাম লেখাও, আর চলে আসবার জো নাই। যতক্ষণ রোগের একটু কসুর থাকে ততক্ষণ ডাক্তার সাহেব চলে আসতে দেবে না। তুমি নাম লেখালে কেন ! (সকলের হাস্য)।"

যখন সাধন চলছে তখন একরকম অবস্থা। আর সাধন শেষ হয়ে যাবার পরে যখন দেহেতে বর্তাচ্ছে, দেহেতে effect দিচ্ছে তখন একরকম। যেমন, কেশবের কাছে যাবার পরে ঠাকুরের একটা দর্শন হোলো — ঠাকুর দেখছেন, মা এসেছেন বেনারসী পরে। বলছেন, মা এসেছো ? বোসো বোসো। হাঙ্গাম কোরো না। কেননা উনি বুঝছেন, মা বেনারসী পরে এসেছেন মানে কেশবের সাথে মিলন হবে। কেশব জগতচৈতন্যে বিলীন হবে। কেশবের মৃত্যুর সময় হয়ে গেছে। মাকে বলছেন — মা হাঙ্গাম কোরো না। মানে কি ? অর্থাৎ মা আমায় বিভ্রান্ত কোরো না তোমার মায়ায়। জগৎচৈতন্যরূপী মায়েরই তো এক রূপ মহামায়া। এই মায়ার বশে যেন বিভ্রান্ত না হই আমি, যেন কেঁদে

আকুল না হই। শোকে কাতর না হই। তাহলে আমার যে জীবন সকলের কাছে আদর্শ, সেই আদর্শের মান ক্ষুণ্ণ হবে। যথার্থ আদর্শ হয়ে উঠবে না। এই যে শোক, এই যে করুণ রস সেটাকে অন্য দৃষ্টিভঙ্গীতে দেখতে হবে। এখানেও ঈশ্বরের লীলারস প্রকাশ পাচ্ছে। আনন্দ রস প্রকাশ পাচ্ছে সেটা অনুভব করতে হবে। সেটা তিনি দেখিয়ে দিয়ে গেছেন যে কিভাবে করবে। রবীন্দ্রনাথ বলছেন — "জয় তব বিচিত্র আনন্দ হে কবি" - জগতে তোমার বিচিত্র আনন্দ রস প্রকাশ পাচ্ছে। "জয় তব করুণা। জয় তব ভীষণ, কলুষ নাশন রুদ্রতা" - কলুষ নাশন তোমার যে রুদ্ররূপ তার জয় হোক। কারণ সেখানেও তোমারই আনন্দ রসের বিচিত্র প্রকাশ। কবিতার শেষে বলছেন — "জয় প্রেম মধুময় মিলন তব জয়, জয় অসহ বিচ্ছেদ বেদনা।" মধুময় মিলনের জয় হোক। আবার অসহ বিচ্ছেদ বেদনারও জয় হোক। কারণ দুটোই তোমার আনন্দ রসের প্রকাশ। কেশব যে অখণ্ড চৈতন্যে বিলীন হবেন, কেশবের দেহ চলে যাবে তিনি তা বুঝতে পারছেন। তাতে উনি নিজে তো বিরহ ব্যথা অনুভব করছেন। কিন্তু সবই মায়ের মহিমার প্রকাশ জ্ঞানে মিলন ও বিচ্ছেদ দুটোকেই তিনি সমান চোখে দেখছেন।মৃত্যু মানে জগৎ জননীর মধ্যে বিলীন হয়ে যাওয়া — এর বেশি কিছু তো নয়। সুতরাং এতে শোকে অভিভূত হওয়ার কিছু নেই। আমি নিজে যদি শোকে অভিভূত হই, জগতের কাছে তাহলে কি বার্তা যাবে ? তাই বলছেন "হাঙ্গামা করো না।" আমি যেন শোকে কাতর না হয়ে যাই। বিভ্রান্ত না হই। এটা যে জগজ্জননীর লীলা খেলা সেটা তিনি বেশ বুঝতে পারছেন। মায়ের কাছে তার প্রার্থনা, হাসি মুখে যেন এই বেদনা সহ্য করতে পারেন। তাহলে প্রথমবার কেন তিনি কেশবের আরোগ্যের জন্য ডাবচিনি মানত করেছিলেন ? বলছেন, 'মা, কলকাতায় গেলে কার সাথে কথা কব ?' কেশবের অসুখ হয়েছে, কেশব যেন ভালো হয়ে যায়, বেঁচে যায়। কারণ তখন ঠাকুরের দেহেতে বর্তায় নি তত্বজ্ঞান অর্থাৎ সবই মায়ের খেলা–এই জ্ঞান। ঈশ্বরই সব করছেন, আমি অকর্ত্তা ঈশ্বরই কর্ত্তা, এই বোধ দেহেতে বর্তায়নি। সেই জন্য ব্যাকুল হচ্ছেন। বলছেন, আমি ডাবচিনি মানত করছি কেশবের জন্য। কেশব যেন বেঁচে যায়। কিন্তু এবার তিনি ব্যাকুল হচ্ছেন না। ডাবচিনি

মানত করছেন না। এবারে এই বিচ্ছেদ বেদনাটা সহজ ভাবে মেনে নিতে পারছেন।

কথামৃত ঃ— "শিশির পাবে বলে মালী বসরাই গোলাপের গাছ শিকড় শুদ্ধ তুলে দেয়। শিশির পেলে গাছ ভাল করে গজাবে। তাই বুঝি তোমার শিকড় শুদ্ধ তুলে দিচ্ছে। (ঠাকুরের ও কেশবের হাস্য)। ফিরে ফিরতি বুঝি একটা বড় কাণ্ড হবে।"

অদ্ভুত কথা বলছেন ঠাকুর। বলছেন, শিশির পাবে বলে মালী বসরাই গোলাপের গাছ শিকড় শুদ্ধ তুলে দেয়। বসরাই গোলাপ খুব বড় বড় হয়। বসরা হচ্ছে ইরাকের একটা জায়গা। সেই বসরাই গোলাপের গাছ শিকড় শুদ্ধ তুলে দেয় যাতে শিশির পেলে আরো বড় গোলাপ ফুল ফোটে। ঠাকুর কি বলছেন এখানে ? ঠাকুর কি গোলাপ গাছের কিভাবে পরিচর্যা করতে হয় তাই শেখাচ্ছেন ? একদম না, ঠাকুর তো অধ্যাত্ম শিক্ষা দিচ্ছেন। এখানে কেশবের যে দেহ চলে যাবে সেই বিষয়েই কথা হচ্ছে। মালী শিকড় শুদ্ধ তুলে দিচ্ছেন যাতে শিশির পায়। এখানে গাছ কোনটা ? গাছটা হচ্ছে চৈতন্যবৃক্ষ, spiritual tree। জগতে একটাই spiritual tree আছে। সেই গাছের শিকড় প্রোথিত আছে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের দেহে। সেখান থেকেই তো রস যাচ্ছে। যেখানে আত্মিক স্ফুরণ হচ্ছে তার উৎস হলেন ঠাকুর। তাহলে তিনি শিকড়। শিকড় রস টানে আর সেই রসটা কাণ্ডে পাতায় সব জায়গাতে ছড়িয়ে দেয়। এইবার শিকড় শুদ্ধ তুলে দিচ্ছেন। কেশব ভাবছে তার যে এই অসুখ, এই সব কাণ্ড হচ্ছে এর পরে তার শক্তির বড় ধরণের বিকাশ হবে। কেশব শুনে খুব আনন্দ পাচ্ছে। আসল কথা ঠাকুর বলছেন তোমার দেহ চলে যাবে। এতে ধাক্কা লাগছে আমার বুকে। আমাকে ভগবান দুঃখ আঘাত দিচ্ছেন কারণ এই যে কেশব সেন ফুল হয়ে ফুটেছে, এর পরে আরো বড় ফুল ফুটবে নরেন, আরো বড় ফুল ফুটবে শ্রীম ইত্যাদি — বসরাই গোলাপ। তার জন্য ভগবান আমাকে দুঃখ দিচ্ছেন। আমাদের প্রত্যেকের জীবনে এরকম দুঃখ আসে। সব সময় সেটা নেগেটিভ (negative) নয়। এখানে পজিটিভ, বড় গোলাপ হবে বলে। দেহের ভিতরে একটা ক্রিয়া হয়। আত্মিক চেতনার একটা বিকাশ ভিতরে হয়, transfor-

mation হয়, আরো জোর ধরে। তাই বলছেন, শিকড় খুঁড়ে দিচ্ছেন — তুমি জানো না কেশব, আমার ভিতরে কত ব্যথা বাজছে। কেন না সেই বনমালী অর্থাৎ ভগবান আমার ভিতরে খুঁড়ছেন। আমার ভিতরে জগৎচৈতন্যের একটা রূপান্তর হচ্ছে। এর পরিণতিতে পরবর্তীকালে আরো বড় বসরাই গোলাপ ফুটবে জগতে। কেশব যত বড় ফুল তার থেকে বড় ফুল হবে নরেন, শ্রীম, রাখাল, বাবুরাম, বলরাম, গিরিশ ইত্যাদি। শিশির পড়বে মানে নির্গুণের শক্তি আরো তেজ দান করবে। কি অপূর্ব উপমাটা। তার পরেই বলছেন, ফিরে ফিরতি বুঝি একটা বড় কাণ্ড হবে। এই কথাটার দুরকম মানে আছে। ফিরে ফিরতি মানে তোমাকে ও অন্যান্য ভক্তদের নিয়ে মায়ের যে লীলা হচ্ছে, তোমাকে সরিয়ে নেবার পরে আরও বড় আকারে সেই চৈতন্যের লীলা হবে। আর দ্বিতীয় মানেটি হচ্ছে যে আমার দেহ চলে যাবার পরে — নতুন করে আরো বড় রকমের আয়োজন হবে আত্মিক বিকাশের। তাই বলছেন, — "জানি কিনা আবার আসতে হবে।" ভবিষ্যতের কথা বলছেন — তাঁর দেহেতে ব্যষ্টি চৈতন্যের বিকাশ হচ্ছে, অন্য কোন মানুষকে কেন্দ্র করে ভবিষ্যতে বৃহৎ ব্যষ্টির প্রকাশ হবে — বড় কাণ্ড হবে। বিশ্বব্যাপিত্বের প্রকাশ হবে। অর্থাৎ একটি মানুষের দেহেতে চৈতন্যের যে বিকাশ হবে, তা জগতব্যাপী হবে। বড় কাণ্ড হবে। সব কথা ইঙ্গিতে বলে যাচ্ছেন, এই ইঙ্গিত গুলোই ধরতে হবে। সাধারণভাবে লোকে মনে করবে উনি বলতে চাইছেন পরজন্মে কেশব আরও নামকরা লোক হবে। তা কিন্তু নয়।

কথামৃত ঃ— "ঈশ্বর দুইবার হাসেন। একবার হাসেন যখন দুই ভাই জমি বখরা করে, আর দড়ি মেপে বলে, এদিকটা আমার, ওদিকটা তোমার। ঈশ্বর এই ভেবে হাসেন যে আমার জগৎ, তার খানিকটা মাটি নিয়ে করছে এদিকটা আমার ওদিকটা তোমার।"

কোনোটাই তোমার নয়। সবটাই তো ঈশ্বরের। ঈশ্বর বস্তু আর সব অবস্তু। তাহলে বাইরে থেকে যাকে বস্তু বলে মনে হচ্ছে ঘর বাড়ী জায়গা ইত্যাদি - এগুলোকে বস্তু বলে মনে হচ্ছে, এই বস্তুটা সৃষ্টি হয়েছে কোথা থেকে? ঈশ্বর থেকে। যেটাকে বস্তু বলে মনে হচ্ছে সেটা বস্তু নয়। ঈশ্বর বস্তু। বস্তু থেকে

সৃষ্ট হয় বাস্তু। ঘর বাড়ী জায়গা বস্তুর জন্য বস্তু থেকে সৃষ্ট বাস্তু। বস্তুটাকে জানতে হবে। তাহলে এই জায়গাটা তোমার আর এই জায়গাটা আমার বলে চার আঙ্গুলের জন্য চরম ঝগড়া, মাথা ফাটাফাটি হবে না। সেই জন্য আবার কোর্ট কেস হয়, কোর্ট থেকে লোক এসে বলে এইখানে পাঁচিল হোক। এই পাঁচিল যখন দেওয়া হোলো তখন শান্তি। যতক্ষণ না পাঁচিল দেওয়া হচ্ছে, দুজন প্রতিবেশীর মধ্যে ঝগড়া লেগেই থাকবে। আত্মিকে এই পাঁচিলটা কি ? টারমিনাস গড – রোমান দেবতা, যে আমাদের মধ্যে শান্তিরক্ষা করে। তোমার বাড়ী আমার বাড়ি পাশাপাশি। মাঝে যদি পাঁচিল না থাকে কি হবে ? তোমার বাড়ীর থেকে ছাগল গরু সব চলে আসবে। তুমি আমার প্রতিবেশী, কিন্তু মাঝে পাঁচিলটা খুব দরকার। শান্তি রক্ষার জন্যই দরকার।

এমনিতে পারস্পরিক বোঝা পড়া সুসম্পর্ক বজায় থাকবে। কিন্তু মাঝে একটা পাঁচিল দরকার। শান্তি বজায় রাখার জন্য। রোমানরা বাইরে, স্থূলে এটা ভেবেছে। সত্যিই ওরা একটা পাঁচিলকে পুজো করে, প্রতি বছর ২৩শে ফেব্রুয়ারী মালা পরায়। আসলে পাঁচিলটা কি ? তোমার আমার মধ্যে কী পাঁচিল থাকবে ? প্রত্যেক দুজন মানুষের মধ্যে বিস্তর ব্যবধান আছে। মাঝখানে থাকেন একজন মানব যিনি মিলনের কেন্দ্রবিন্দু (point of union), তাঁকে কেন্দ্র করে আমাদের মিলনটা হয়। যদি তা না হয়, মাঝে যদি পাঁচিল না থাকে তাহলে আপনার সাথে আমার খুব ঘনিষ্ঠতা থাকলেও আপনার ব্যক্তিস্বার্থ চিন্তা ও আমার ব্যক্তিস্বার্থ চিন্তায় অনেক সময় সংঘাত লাগবে। ফলে সম্পর্ক নষ্ট হবে। কিন্তু যদি মাঝখানে এসে দাঁড়ান সর্বজনীন মানব জীবনকৃষ্ণ তাহলে কি দেখা যাবে ? আমি জীবনকৃষ্ণকে ভালবাসছি, আপনিও জীবনকৃষ্ণকে ভালোবাসছেন। আপনি আমার প্রিয় থাকছেন, সেখানে ব্যক্তিগত ব্যবহারিক জীবনের স্বার্থের কথাটা খুব বেশি এগোবে না। ব্যবহারিক জীবনে অনেক কিছু হেল্প (help) চাইছি, হয়ত একবার আপনি করতে পারলেন না। তখন আমরা ৯৯টা উপকার ভুলে যাই, একবার যে আপনি কাজটা করে দিলেন না সেটাকেই ভালো করে মনে রাখি। কিন্তু যদি আমার আপনার মাঝখানে জীবনকৃষ্ণ থাকেন তাহলে জানব যে আমাদের ব্যবহারিক সম্পর্কটার মধ্যে একটা সীমারেখা

আছে, this far not further. আত্মিকে আমরা এক। ব্যবহারিকে আপনি আমায় সবসময় সাহায্য নাও করতে পারেন। আপনারও অসুবিধা থাকতে পারে। এটা আমার বোঝা দরকার। এই পাঁচিলটা চাই। মানবব্রহ্ম রূপ পাঁচিলকে কেন্দ্র করেই আমাদের মিলন হওয়া চাই। যিনি আত্মিকে এক করবেন আর ব্যবহারিকে মিলনে সীমা টানবেন। তা না হলে আমাদের ব্যবহারিক মিলনের ক্ষেত্রে অনেক অশান্তি এসে যাবে। কেননা ব্যক্তি স্বার্থটা বড় হয়ে যায়। ব্যক্তি স্বার্থ বড় হলে কেউ আপনার স্বার্থ পুরোপুরি মেটাতে পারবে না। তখনই অশান্তি শুরু হবে। ওর ঘর থেকে আপনার ঘরে গরু অর্থাৎ animality চলে আসবে। এই animality চলে এলেই বিপদ, সম্পর্ক নষ্ট। আমি ভেবেছি আমার প্রতিবেশী ভাস্করদা খুব ভালো লোক, তাতো নয় দেখছি এখন, এই বার অশান্তি শুরু হবে।

এ প্রসংগে শুভাশিসের একটা স্বপ্নের কথা মনে পড়ছে। সেদিন ও স্বপ্ন দেখছে যে খুব ঝড় উঠেছে। ও তখন ওর স্ত্রীকে বলছে ঘর দোর তো সব ভেঙ্গে পড়ছে, বাইরে চলো। চরম ঝড়। স্ত্রীর হাত ধরে বাইরে গিয়ে দেখছে এক জায়গায় একটা পাঁচিল রয়েছে। ও আর ওর স্ত্রী সেই পাঁচিলের গোড়ায় গিয়ে বসলো। এখানে এসে আর কোনো কষ্ট হচ্ছে না। পাঁচিলের কাছে এসে বসাতে ঝড় আর কোনো আঘাত করতে পারছে না। নিশ্চিন্ত হোলো। এই পাঁচিলটা আবিষ্কার করতে হবে। তা না হলে এই জায়গাটা আমার আর ঐ জায়গাটা তোমার বলে আমি নিজের অধিকার ফলাবো, তুমিও অধিকার ফলাবে। এমনকি স্বামী স্ত্রীর মধ্যেও নিজের নিজের অধিকার ফলাতে গিয়ে সংঘাত বেঁধে যায়। এই জন্য মাঝে এই পাঁচিলটা থাকা দরকার। তাহলে ব্যবহারিকে আমি আমার অধিকারের সীমাটা বুঝতে পারব। বুঝব This far not further. তাহলেই শান্তি রক্ষিত হবে।

এবার 'ধর্ম ও অনুভূতি' থেকে পাঠ হ'ল ঃ—

তৃতীয় ভাগ শুরু হবার আগে দ্বিতীয় ভাগে একটি পরিশিষ্ট আছে। এটা আগের 'ধর্ম ও অনুভূতি'তে নেই। জীবনকৃষ্ণের নিজের হাতের লেখা পাণ্ডুলিপি পাওয়া গিয়েছিল বলে এখানে এটি যোগ করা হয়েছে।

আত্মার সাধন বা বিদেহ সাধন বা বেদান্তের সাধন আর তার প্রমাণ।

দ্বিতীয় ভাগ শেষ করার পরে উনি আবার বেদান্তের সাধনের কথা এখানে উল্লেখ করছেন। বলছেন বিদেহ সাধন দুই রকম — ব্যষ্টি এবং জগৎব্যাপিত্ব। ব্যষ্টির যে বিদেহ সাধন বা বেদান্তের সাধন আমরা জানি তার ৫টা ধাপ—**ম, রা, বীজ, স্বপ্নবৎ ও লয়।** 'ম'—অর্থাৎ আত্মা সাক্ষাৎকার হোলো। ঐখান থেকে বেদান্তের সাধন শুরু। তারপরে 'রা' অর্থাৎ আত্মার মধ্যে জগৎ - — বিশ্বরূপ দর্শন। তারপরে বিশ্ববীজবৎ অনুভূতি। পরে বীজ তথা জগৎ স্বপ্নবৎ এই অনুভূতি আর শেষে লয়, বোধাতীত অবস্থায় প্রাণচৈতন্য লয় হয়ে গেল। এই পাঁচটা ধাপ হচ্ছে ব্যষ্টির সাধন মালায় বেদান্তের সাধন। জীবনকৃষ্ণ এখানে একটু ভেঙে বলে দিচ্ছেন—'ম' অর্থাৎ আত্মা বা ভগবান দর্শন। আত্মা সাক্ষাৎকারের কথা আমরা সবাই জানি। সচ্চিদানন্দগুরু দেখিয়ে দেবেন জ্যোতির সমুদ্রে অঙ্গুষ্ঠবৎ ঘন জ্যোতি, সেটা নীলরেখা দ্বারা সীমায়িত, এবং সেই নীলরেখার মধ্যে অ্যাটমের মতো জ্যোতির বিন্দুর মালা ঘুরছে। পরে সেটা পিছন দিকে ঘুরে যায় এবং ধূমকেতুর ল্যাজের মতো বা ধান্যশীর্ষবৎ হয়ে যায়।

তারপরে 'রা', রা মানে জগৎ। আত্মার মধ্যে জগৎ দর্শন হয়, বিশ্বরূপ দর্শন হয়। শ্রীজীবনকৃষ্ণ এক দর্শনে পৃথিবী থেকে অনেক উপরে উঠে গিয়ে গোটা পৃথিবীটাকেই দেখলেন — উনি বুঝলেন এই জগৎ তাঁর ভিতরে। এরপরে বীজ। বিশ্ব বীজবৎ হচ্ছে যখন জড় সমাধি হচ্ছে। জড় সমাধির সময় শুধু একটা point -এ চেতনা থাকে, দেহব্যাপ্ত চৈতন্য ঘনীভূত হয়ে একটা বিন্দুতে জড় (collected) হচ্ছে। এই জড় সমাধিটাকে বলছেন বিশ্ববীজবৎ অনুভূতি। দ্বিতীয় স্তরে অনুভূতি হবে — একটা ছোট্ট বীজ দেখলেন, বোধ হ'ল বীজ রূপে এটাই জগৎ – বিশ্ববীজবৎ। এরপর জগৎ স্বপ্নবৎ অনুভূতি হয়। জগৎ স্বপ্নবৎ অনুভূতি কি রকম হয় ? যখন বাস্তব জগৎ আর স্বপ্ন একাকার বোধ হবে। কোনটা স্বপ্নে দেখেছি আর কোনটা বাইরে বাস্তবে ঘটছে তফাৎ করতে পারবেন না। মনে হবে যে এটাও যেন স্বপ্নে দেখছি। তখন জগৎ স্বপ্নবৎ অনুভূতি হয়। তারপর লয় — স্থিত সমাধি — মহানির্বান বা মহাকারণে লয় হওয়া। ব্যষ্টির সাধনে বেদান্তের এই হল পাঁচটি ধাপ।

বিশ্বব্যাপিত্ব ঃ—

'ম'— বিশ্বব্যাপিত্বে, যিনি আত্মা সাক্ষাৎকার করেন তিনি আত্মা পুরুষ রূপে বহু মানুষের মধ্যে চিন্ময় রূপ ধরে ফুটে উঠতে শুরু করেন। তাহলে ঐ মানুষটি হলেন 'ম'। সহস্রারে সচ্চিদানন্দগুরু যাকে ভগবান দর্শন করিয়ে দেন সেই মানুষটি, সেই সাধক 'ম' হয়ে যান। আত্মা হয়ে যান। To see God means to become God. আর তিনি যে ভগবান হলেন তার প্রমাণ হাজার হাজার নরনারী শিশু বৃদ্ধ তাকে দেহের ভিতরে ও বাইরে দেখে সেকথা জানিয়ে দেয়। তাহলে 'ম' হলেন জীবনকৃষ্ণ, যাকে আমরা ভগবান রূপে দেখছি।

এরপর 'রা' — বিশ্বব্যাপিত্বে বিশ্বরূপ দর্শন হোলো, তাঁর চিন্ময় রূপ অসংখ্য মানুষের মধ্যে ফুটে ওঠা ও তাদের সেকথা ঘোষণা করা– উপলব্ধি হওয়া সমগ্র মনুষ্যজাতির আত্মিক রূপ তিনি। তাঁর চিন্ময় রূপ। কৃষ্ণের মধ্যেই জগৎ সংসার — এটা সাধারণ মানুষের সংস্কারজ বিশ্বরূপ দর্শন। যখন একজন মানুষকে ভিতরে দেখে আপনি উপলব্ধি করছেন যে তিনি মনুষ্যজাতি হয়েছেন তখন তাঁর বিশ্বরূপ দর্শন হচ্ছে আর আপনি তার প্রমান দিচ্ছেন তাঁকে। কারণ জীবনকৃষ্ণ বহুর মধ্যে ফুটে উঠে বুঝলেন যে উনি মনুষ্যজাতি হয়েছেন। আমিও ওনাকে ভিতরে দেখে বুঝবো যে হ্যাঁ জীবনকৃষ্ণকে দেখা মানেই মনুষ্যজাতির আত্মিক রূপকে দেখছি অর্থাৎ ঐ রূপটির মধ্যে সমগ্র মনুষ্যজাতি। তাহলে প্রথমে তাঁকে আত্মা রূপে দেখলাম। তারপরে জানতে হবে উনি cosmic man, বিশ্বমানব। সমগ্র মনুষ্যজাতির আত্মিক রূপ তিনি, কারণ তাঁর ঘরে যারা আসছে, হিন্দু হোক, মুসলমান হোক, খ্রীষ্টান হোক, নরনারী, শিশু বৃদ্ধ, সাধু গুণ্ডা সবাই এসে বলছে আমরা আপনাকে ভিতরে দেখেছি। উনি বুঝলেন যে তিনিই সমগ্র মনুষ্যজাতি হয়েছেন — এই ওনার বিশ্বরূপ দর্শন হচ্ছে। সহস্রারে আত্মার মধ্যে যে জগৎ দেখা হয়েছিল যার অর্থ আমিই এই মনুষ্যজাতি– এই তার প্রমাণ। মানুষ নিজেই এই প্রমাণ দেন তাঁকে।

বীজ—

ব্যষ্টিতে, ওনার জড় সমাধি হোলো — বিশ্ববীজবৎ অনুভূতি হোলো। এবার বিশ্বব্যাপিত্বের সাধনে বীজবৎ অনুভূতি কি ? যাকে সকলে অন্তরে

বাহিরে দেখে তিনি সূর্য্যমণ্ডলস্থ পুরুষ আর যারা দেখছে তারা হিরন্ময় কোষস্থ ব্রহ্ম। তিনি ঈশোপনিষদ কথিত সূর্য্যমণ্ডলস্থ পুরুষ পরম ব্রহ্ম আর মনুষ্যজাতি হিরন্ময় কোষস্থ ব্রহ্ম। প্রথমে সূর্য্যকে বুঝতে হবে। আমরা বলি সব শক্তির উৎস হচ্ছে সৌরশক্তি। তুমি কথা বলছ, কাজ করছ, হাত পা নাড়ছ, তুমি যে শক্তিটা পেয়েছ, সব শক্তি এসেছে সূর্য্য থেকে। তুমি ভাত খেয়েছ, না হয় মাছ খেয়েছ, কি ফল খেয়েছ। কিছু না কিছু তো খেয়েছ ? এবার ভেবে দেখ, তুমি যা যা খেয়েছ, সব জিনিষগুলোর ভিতরে যে শক্তিটা আছে সেই শক্তিটা এসেছে কোথা থেকে ? সূর্য্য থেকে। চাল, আপেল, কলা, শাক সবজি সবই সৌরশক্তির সাহায্যে সৃষ্ট। গাছে সূর্য্যের আলো পড়েছে, আর গাছ তাই দিয়ে খাবার বানাচ্ছে, ফলমূল শাক সবজি ইত্যাদি তৈরি করেছে। এইটা খেয়ে সূর্য্যেরই শক্তি আমার দেহে যুক্ত হোলো আর সেই শক্তি আমি কাজে লাগিয়ে, কথা বলছি, কাজ করছি, হাত পা নাড়ছি। তাহলে আমার সকল শক্তির উৎস হোলো সূর্য্য। এটা বাইরের কথা। এবার অন্তর্জগতেও সেই একই ঘটনা। সমস্ত মনুষ্যজাতির যে আত্মিক তেজ, সেই আত্মিক তেজের উৎস হচ্ছে জগৎ চৈতন্য। সেখান থেকেই সকলের 'ধীশক্তি' এসেছে। গায়ত্রী মন্ত্রে বলা হচ্ছে যে সেই এক থেকে আমাদের সকলের ধীশক্তি আসছে, বলা হচ্ছে 'ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ'। তিনি সকলেরই ধী শক্তি প্রেরণ করছেন। সব এক জায়গা থেকে এসেছে। কি করে বুঝব ? তাকে সূর্যের মধ্যে দেখতে পাব। সূর্য্য হচ্ছে সকল শক্তির উৎস। তাই জীবনকৃষ্ণকে যখন স্বপ্নে সূর্য্যের মধ্যে দেখছি। তখন বোঝানো হচ্ছে যে আমাদের সকলেরই আত্মিক চৈতন্যের উৎস পুরুষ তিনি। বাইরের জীবনকৃষ্ণ সূর্য্যমণ্ডলস্থ পুরুষ, বিরাট তিনি। তাই আমি স্বপ্নে সূর্যের মধ্যে জীবনকৃষ্ণকে দেখছি। কিন্তু আমি যখন ভিতরে দেখছি, সেই বিরাটকে তো ভিতরে পাচ্ছি না। আমার ভিতরে তো আর সেই সূর্য্যকে ধারণ করতে পারি না। আমার ভিতরে রয়েছে চৈতন্যের এক কণা। বিন্দুর মধ্যে সিন্ধু প্রতিবিম্বিত হয়। আমি আমার ভিতরে যে জীবনকৃষ্ণকে দেখলাম, সেটা হোলো হিরন্ময় কোষস্থ ব্রহ্ম। অর্থাৎ ওই সূর্য্যের আলোটা পেয়ে কেউ কলা, কেউ আপেল, কেউ চাল ইত্যাদি হয়েছে। এই রকম প্রত্যেকটা মানুষের মধ্যে

জগৎচৈতন্যের একটুখানি তেজ আবদ্ধ হয়েছে। প্রত্যেকটি মানুষের মধ্যে জন্মগত যে আত্মিক তেজ আছে সেই আত্মিক তেজ সহস্রারে হিরন্ময় কোষে এসে মুক্ত হয়। সেই শক্তি দিয়েই আমরা সূর্য্যকে, ঐ সূর্য্যমণ্ডলস্থ পুরুষ অখণ্ড চৈতন্যের ঘনীভূত রূপ জীবনকৃষ্ণকে দেখছি ও বোঝবার চেষ্টা করছি। তাহলে আমি যে স্বপ্নে সূর্য্যমণ্ডলস্থ পুরুষ জীবনকৃষ্ণকে দেখলাম, বস্তুত আমার ভিতরে হিরন্ময় কোষস্থ ব্রহ্মকে দেখলাম, সাথে সাথে বাইরে তিনি যে জগত চৈতন্যের সংহত রূপ তা জানলাম।

তাহলে সূর্য্যমণ্ডলস্থ পুরুষকে স্বপ্নে ধ্যানে দর্শন করা জগৎ চৈতন্যকে বীজরূপে একটা Point এ দেখা। এই হোলো তাঁর বীজবৎ অবস্থার প্রমাণ। ব্যষ্টিতে – জড় সমাধি। বিশ্বব্যাপিত্বে, জীবনকৃষ্ণ বলছেন তোরা যে আমাকে স্বপ্নে সূর্য্যের মধ্যে দেখছিস্ তখন আমি বুঝতে পারছি আমার চৈতন্য সত্তা ঘনীভূত হয়ে বীজবৎ অবস্থা লাভ করেছে। আমি জগৎ জুড়ে যে জাল ফেলেছিলাম তা গুটিয়ে এনেছি। তোদের এই দর্শন জানাচ্ছে আমার Absolute equality লাভ হয়েছে আর তোরা আমার সাথে বিমূর্ত একত্ব (Abstract equality) লাভ করেছিস। ঋষির কথা- যোসাবসৌ পুরুষঃ সোহমস্মি। ঐ সূর্যমণ্ডলস্থ পুরুষ ও আমি এক।

ঠাকুর বলছেন, চৈতন্যের দ্বারা চৈতন্যকে জানা যায়। হিরন্ময় কোষস্থ ব্রহ্ম আর সূর্য্যমণ্ডলস্থ পুরুষের সাথে একটি সহজ সম্পর্ক আছে। আপেলের মধ্যে যে আলোক শক্তি তার সাথে বাইরে সূর্য্যের গভীর সম্পর্ক রয়েছে। তাহলে যখন আমি আমার মধ্যে নিজের স্বরূপটা দেখলাম, হিরন্ময় কোষস্থ ব্রহ্মকে দেখলাম তখন ঐ যে বিরাট জগৎচৈতন্য যা জীবনকৃষ্ণের মধ্যে ধরা পড়েছে, তার সাথে আমার নিবিড় যোগটা বুঝতে পারলাম – এক সূত্রে আবদ্ধ। তারই এক কণা তেজে আমি তেজোময় হচ্ছি। তিনি সমগ্র জগৎচৈতন্যের সংহত রূপ–বীজবৎ।

জগৎ স্বপ্নবৎ–এর পরের ধাপ জগৎ স্বপ্নবৎ। ব্যষ্টির স্বপ্নাবস্থা হচ্ছে, কি ঘটবে তা আগেই দেখে নিচ্ছি, স্বপ্ন আর বাইরের জগতের ঘটনা মিলে মিশে একাকার হয়ে যাচ্ছে। অনুভূতিতে জাগছে যে স্বপ্ন আর জাগরনের ঘটনা এক,

স্বপ্ন যেমন সত্য জাগরনও তেমন সত্য উপলব্ধি হবে। ব্যষ্টির স্বপ্নবৎ অবস্থার effect প্রসঙ্গে জীবনকৃষ্ণ বলছেন– আমার স্বপ্নবৎ অবস্থা হয়েছে, তাই তোরা আমাকে স্বপ্নে দেখতে পাচ্ছিস। এরপর বিশ্বব্যাপিত্বে ওনার যখন স্বপ্নবৎ অবস্থা হচ্ছে তখন আরো সূক্ষ্ম অবস্থা হচ্ছে। তখন আমাদের মধ্যে তূরীয় অবস্থার অনুভূতিতে উনি প্রকাশ পাচ্ছেন। যখন উনি স্বপ্নে ফুটছেন তখন দরজা খুলে তুমি দেখলে যে জীবনকৃষ্ণ এসেছেন। তখনও ঘরের ভিতরে তাকে নেওয়া হয়নি। স্বপ্নে তাঁকে ঘরের ভিতরে নেওয়া হয়নি। আপনি হয়ত বলবেন, তা বললে কি হয় ? আমি দেখেছি আমার ঘরে এসেছেন জীবনকৃষ্ণ, তাঁকে আমি খাইয়েছি। আমরা জানি একটুখানি হলেও স্বপ্নে অহং (ego) থাকে, ষোল আনা অহং যায় না। ষোল আনা অহং যায় তূরীয় অবস্থায়। যার জন্য তূরীয় অবস্থাটাকে বলা হচ্ছে শত্রুঘ্ন অবস্থা। আমাদের শত্রু হলো অহং, সেটা পুরোপুরি নাশ হয়। এই তূরীয় অবস্থায় যে জীবনকৃষ্ণ দেখা দিলেন তিনি আমার ভিতরের ধন, আমারই প্রাণসত্তা– রবীন্দ্রনাথের ভাষায় আমরা বলতে পারি "প্রাণেতে আমাতে করিব খেলা নিশীথ বেলা", এই উপলব্ধি হয়। স্বপ্ন দেখে মনে হয় উনি বিরাট মানুষ, উনি ভগবান, উনি পরমব্রহ্ম। তাহলে ততক্ষণ উনি দোড়গোড়ায়, আপনি দরজা খুলে দেখছেন। কিন্তু তাঁকে ঠিক ঠিক ভিতরে পেতে হলে, তিনি আমারই প্রাণসত্তা, এইটা উপলব্ধি হতে গেলে আপনাকে তূরীয় অবস্থার অনুভূতিতে ওনাকে পেতে হবে, আর সেটা হবে যখন উনি বিশ্বব্যাপিত্বে স্বপ্নবৎ অবস্থায় বিচরন করবেন।

লয়—এরপরে নির্গুণে বোধাতীত অবস্থায় লয়। ব্যষ্টিতে উনি বোধাতীত অবস্থায় লয় হয়ে গেলেন, স্থিত সমাধি হোলো। বিশ্বব্যাপিত্বে কি হচ্ছে ? এই অবস্থায় তাঁর সাথে বহু মানুষের আত্মিক একত্বের দর্শন অনুভূতি শুনে শুনে শুধু একটা বোধ জাগে যে অখণ্ড মানব চৈতন্যের সাথে একাকার হয়ে আছেন। বিশ্বব্যাপিত্বের এই লয় অবস্থায় উনি যখন পৌঁছাচ্ছেন সেটা হচ্ছে ওনার বিশ্বব্যাপিত্বের সাধনের শেষ সীমা (end point) আর জগতের মানুষের সমষ্টির সাধনের সূচনা (starting point) কারণ তখন উনি পৌঁছে যাচ্ছেন singularity point- এ। জীবনকৃষ্ণকে তূরীয় অবস্থায় দর্শনে তাঁকে অন্তরতম বলে

উপলব্ধি হয়। তখন থেকে আমাদের ভিতরে পরিবর্তন শুরু হবে। প্রেম জাগবে। তার আগে আমরা অনেক তত্ত্বকথা জানছি, ধর্মজগতে কোনটা সংস্কার কোনটা ঠিক নয় এইসব বুঝছি। পবিত্রতা লাভ হচ্ছে, কিন্তু আমাদের বিচ্যুতিও হয়, কারণ ঐ অবস্থা স্থায়ী হয় না যতক্ষন না প্রেম লাভ হচ্ছে। বিশ্বব্যাপিত্বে যখন লয় এর অবস্থা, ঐখান থেকে সমষ্টির সাধনের সূচনা। এই পর্বে সর্বজনীন মানুষটি নিরাকার নির্গুণের মূর্তরূপ হয়ে অর্থাৎ নির্গুণের সংযোগ (link) সহ অন্যের অন্তরে পরিস্ফুট হন ও দ্রষ্টার মধ্যে নির্গুনের দ্বার খুলে দিয়ে তাকে নিজের সাথে এক করে নেন। একত্ব দান করেন। সাধারন মানুষের ভিতরেও নির্গুনের অফুরন্ত তেজ জাগতে থাকে, তাদের চেতনার পরিবর্তনের সূচনা হতে থাকে। তারা ধীরে ধীরে ocular point -এ পৌঁছে গিয়ে নিজের চৈতন্যের দ্বারা পরিচালিত হন ও চৈতন্যের রসাস্বাদনে সমর্থ হন, শুরু হয় সমষ্টির সাধন। সাধন তত্ত্বের এই পর্যায়টা বুঝে উনি তৃতীয় ভাগে ঢুকতে বলছেন।

তৃতীয় ভাগের প্রথমে উনি মধুবিদ্যার কথা বলছেন। মধুবিদ্যার কথা একটু আধটু আমরা জানি। ঊর্দ্ধরেত পুরুষের দেহেতে এই বিদ্যা লাভ হয় এবং সেটা এক যুগে একজন মানুষের দেহেতেই হবে। সেখানে মধু বিদ্যার কথা বলতে গিয়ে উনি বলছেন, মধু মানে চৈতন্য। এই চৈতন্য হোলো বহুত্বে একত্ব। এই বহুত্ব বোঝাতে তিনি আমাদেরকে, সাধারন মানুষকে টেনে নিয়ে এলেন। এর আগে পর্যন্ত উনি ওনার নিজের কথা বলছেন। ব্যষ্টির সাধনের কথা বলছেন। এবার বলছেন, বহুত্বে একত্বের জ্ঞানই হলো চৈতন্য। ব্যষ্টিতে আত্মা সাক্ষাৎকার হোলো— চৈতন্যলাভ হোলো যে আমার ভিতরে ভগবান। তারপরে জ্ঞান হোলো ঈশ্বর কর্ত্তা আমি অকর্ত্তা। তারপর জগতের মানুষ তাঁকে দেখে বলল, ওগো তুমিই ব্রহ্ম। জ্ঞান হোলো যে অহং ব্রহ্মাস্মি- প্রমাণ সাপেক্ষে। জ্ঞান হওয়া মানে চৈতন্যলাভ হওয়া। তাতেও হোলো না। যখন বহুত্বে একত্ব প্রতিষ্ঠা হচ্ছে তখন চৈতন্য লাভ হচ্ছে। অর্থাৎ আমি ব্রহ্ম, আর আমার সামনে যে এতগুলি মানুষ—আত্মিকে এক, আমিই এতগুলি হয়েছি। এই উপলব্ধিই প্রকৃত চৈতন্য।

একটাই spiritual tree আছে। রামকৃষ্ণ কি বললেন ? এক অচিনে

গাছ আছে জানো ? তাকে কেউ চিনতে পারে না। সত্যিই ওনার দেহেতে চৈতন্যের যে জাগরন হোলো, বাইরের কোনো মানুষ চিনতে পারল না। অচিনে গাছ। এখন সেই অচিনে গাছের বীজ এসে পড়ল জীবনকৃষ্ণের দেহেতে। উনি একদিন হঠাৎ করে দর্শন করলেন ঠাকুর রামকৃষ্ণকে। ঐ অচিনে গাছকে জীবনকৃষ্ণ দেখলেন, বীজটা মাটিতে পোঁতা হোলো, এর পর যখন গাছ হোলো ফল হোলো তখন তো বোঝা গেল যে এই বীজটা আমের। ফলেন পরিচীয়তে- –ফলের দ্বারাই গাছের পরিচয় পাওয়া যায়। রামকৃষ্ণকে ভিতরে দেখলেন, এর পরে তাঁর দেহেতে যখন ব্রহ্মবিদ্যা বিকশিত হোলো তখন বুঝলেন, ওহ্ রামকৃষ্ণের দেহেতে এই জিনিষ হয়েছে, উনি অমৃত আস্বাদন করেছেন। জীবনকৃষ্ণ দর্শন করলেন, বিরাট বড় একটা আম আপনা হতে তার হাতে এলো। আর অনেক পরে ওনার দর্শন হচ্ছে যে একটা বিরাট বড় আমগাছ, তাতে ছোটো বড় অসংখ্য আম ধরে আছে। তখন উনি বুঝলেন 'আমার আমগাছে আম হয়েছে, আমি দিলে তবে তোরা পাবি', তারপরে বুঝলেন 'তোরা যে আমাকে দেখছিস তোদের মধ্যে ব্রহ্মবিদ্যার প্রকাশ হচ্ছে, অমৃতের যে অস্বাদন হচ্ছে সেটা আমার দেহে বিকশিত ব্রহ্মবিদ্যার ফল, effect। তাহলে আমার দেহেতে কি হচ্ছে তার effect তোদের মধ্যে ফুটছে। তোরা আমাকে ভিতরে দেখে ঘোষনা করলি যে আত্মিকে আমরা এক বাইরে বহু'।

এই বহুত্বে একত্বের চৈতন্যের কথায় জীবনকৃষ্ণ বলছেন, দেখ্ এই যে ঋক বেদ একটা অদ্ভুত কথা বলছে- সেখানে ছান্দোগ্য উপনিষদে মধুবিদ্যার কথায় বলছে– ওঁ অসৌ বা আদিত্যো দেবমধু তস্য দ্যৌরেব তিরশ্চীন বংশোন্তরিক্ষমপূপো মরীচয়ঃ পুত্রাঃ — অদ্ভুত একটা শ্লোক। অসৌ বা আদিত্য –ঐ যে আদিত্য। বাইরে আদিত্য মানে সূর্য্য আবার দেহের ভিতরে আদিত্য বা সূর্য্য দেখতে পাওয়া যায়। দেবমধু — দেবতাদের মধু মানে প্রিয়। জীবনকৃষ্ণ বলছেন, দেবতা বলে কিছু নেই। মানুষই দেবতা হয়। আর বাকি সব কল্পনা। অন্য দেবতারা কাল্পনিক। দেবমধু শব্দের মানে করলেন সর্বজন প্রিয়। সব মানুষের প্রিয়। বাইরের সূর্য্য সব মানুষের প্রিয়, শীতকালে হাড়ে হাড়ে টের পাওয়া যায়। একটু খানি সূর্য্যের তাপে দাঁড়াতে পারলে বেশ আরাম লাগে।

বাইরের সূর্য্য বাহ্য চেতনা স্বরূপ। ঐ সূর্য্যের আলো আর তেজ ব্যতিরেকে ব্যবহারিক জগতে কোন কাজ সম্ভব নয়। আর ভিতরে সহস্রারে যে সূর্য্য দেখা যায় সেও কিন্তু সর্বজন প্রিয়। এই সূর্য্য আত্মিক একত্বের চৈতন্য স্বরূপ। জগতের মানুষ এই একত্বের প্রত্যাশী, তারা এই সূর্য্যের কিরণ লাভ করতে চায়। বহুত্বে একত্ব লাভেই জগৎ মধুমতী হয়। যখন কারো ভিতরে ঐ সূর্য্যের প্রকাশ হয়, দর্শন হয় তখন সকলে আত্মিকে এক- এই বোধ জাগ্রত হয় ও তার চোখে জগতের আনন্দরূপটি ধরা পড়ে। তস্য দৌরেব– তার অর্থাৎ ঐ সূর্য্যের অবলম্বন কি ? দ্যৌ–অর্থাৎ দ্যুলোক। সূর্য্যকে ধারন করতে গেলে তার থেকেও বড় জিনিষ তো চাই। "হায় গগন নহিলে তোমারে ধরিবে কেবা।" সেই গগনে শোভা পাচ্ছে এই সূর্য্য। বলছেন, দ্যুলোক যেন একটা বাঁকা বাঁশ- –তিরশ্চীন বংশ। তার নীচে রয়েছে অন্তরীক্ষ। সেটা যেন অপূপঃ- মধুচক্র- মৌচাক। আর সেইখানে মধুসম সূর্য্যটা বিরাজ করছে। মরীচয় পুত্রাঃ- মরীচয় মানে সূর্য্য কিরণ। পুত্রাঃ- সূর্য্য কিরণ সম্ভূত জল। সূর্য্যের কিরণ সমুদ্রের জলে পড়ছে। সেই জল বাষ্পীভূত হচ্ছে, সেইটাই আবার বৃষ্টি হয়ে ঝরে পড়ছে। জগৎ শস্যশালিনী হচ্ছে। কি চমৎকার উপমা দিচ্ছেন। বাইরের সূর্য্যের অবলম্বন হচ্ছে দ্যুলোক। পৃথিবীর ওপরে অন্তরীক্ষ আর তার উপরে রয়েছে দ্যুলোক। যেটাকে পিতৃলোক বলা হয়। দ্যুলোক হলো মহাশূন্য।

দেহতত্ত্বে, সহস্রারে যে সূর্য্য দেখা যায় তার অবলম্বন কি, কে ধরে রেখেছেন ? নির্গুণ ব্রহ্ম। তূরীয় অবস্থায় নির্গুণ ব্রহ্মের প্রকাশ হয়। ফিকে জ্যোৎস্নালোকে হালকা কুয়াশা রূপে পরমাত্মার সাক্ষাৎকার হয়। যেটা ঠাকুর রামকৃষ্ণ বলছেন আনন্দের কুয়াশা, তার মধ্যে খেলছিলাম। এই যে তূরীয় অবস্থায় নির্গুণ ব্রহ্মের প্রকাশ হোলো– এই দ্যুলোক সৃষ্টি হোলো, সেই দ্যুলোকে বিধৃত থাকবে সূর্য্য। সহস্রারে চৈতন্য সাক্ষাৎকার হোলো- ঐটি সূর্য্য।নির্গুণের শক্তি তাকে ধারন করল, ধরে রাখল। নির্গুণ ব্রহ্মের প্রকাশ না হলে এই জগৎচৈতন্যরূপী সূর্য্যকে দেখা যাবে না, ভিতরে ধারন করা যাবে না। তাহলে সেই সূর্য্যের অবলম্বন হচ্ছে নির্গুণ ব্রহ্ম। তার নীচে অন্তরীক্ষ। তখন দেহটি হবে সম্পূর্ণ অহংশূন্য — অন্তরীক্ষ। আর তা অপূপঃ অর্থাৎ মৌচাক। এই মানুষের

পবিত্র দেহে মধুসম জগৎ চৈতন্য রূপী সূর্য্য ধরা পড়ে। বাইরের সূর্য্য কিরণের পুত্র অর্থাৎ এফেক্ট (effect) হচ্ছে বৃষ্টি। দেহতত্ত্বে, সূর্য্য কিরণ মানে মধুপাতে মধু দর্শন। শ্রীজীবনকৃষ্ণ দেখলেন চার পাঁচ ফোঁটা মধু তার বিছানার সাদা চাদরের উপর পড়ল। হাত দিয়ে তা মুছতে গিয়ে সারা বিছানাটা মধুতে আপ্লুত হয়ে গেল। তাহলে ভিতরে যে চৈতন্যসূর্য্য জাগল তার effect কি ? মধু বৃষ্টি। ভিতরের জগৎ ও বাইরের জগৎ এক। যে মানুষটির ভিতরে জগৎ চৈতন্য সংকলিত হোলো মধুসম তার চিন্ময় রূপ ঐ বৃষ্টির মত ঝরে পড়বে বাইরে অসংখ্য মানুষের অন্তরে। অজস্র দর্শন অনুভূতি আমাদের হচ্ছে। বৃষ্টির মত ফোঁটা ফোঁটা করে ঝরে পড়ছে। জীবনকৃষ্ণকে যে স্বপ্নে দেখছি সেটা কিন্তু এক বিন্দু মধু, তারই ব্রহ্মত্ব। তাই বলছেন, সমুদ্রের ঝিনুক সমূহ স্বাতী নক্ষত্রের জলের জন্য হাঁ করে থাকে। স্বাতী নক্ষত্রের জল পড়বে, সেই জল মুখের মধ্যে নিয়ে সমুদ্রের গভীরে চলে যাবে। সেখানে গিয়ে ঐ জল মুক্ত হবে। এটা তো ঋষিদের দেওয়া উপমা। বস্তুতঃ তা হয় না। ঝিনুকে বৃষ্টির জল পড়ল, ঝিনুকটা মুখ বন্ধ করল, তারপর সমুদ্রের তলায় চলে গেল, আর মুক্ত হোলো, তাতো হয় না। বিজ্ঞানীরা বলছেন, ঝিনুকের গা থেকে একরকম রস ক্ষরিত হয়, সেটাই পরে মুক্ত হয়। স্বাতী নক্ষত্রের জল মানে নির্গুণ ব্রহ্ম থেকে আসছে যে তেজ। আমরা প্রথম যখন জীবনকৃষ্ণকে দেখছি, নির্গুণ থেকে জীবনকৃষ্ণের চিন্ময় রূপ ফুটছে। বাইরে থেকে জীবনকৃষ্ণ নাকের ফুটো দিয়ে, কানের ফুটো দিয়ে ঢুকছে না। নির্গুণ ব্রহ্ম থেকেই ঐ চিন্ময় রূপ ফুটে উঠছে। তখন আমাদের মনে হয় জীবনকৃষ্ণ কৃপা করে দেখা দিলেন। বাইরে থেকে এলেন।

এবার সমুদ্রের গভীরে যেতে হবে। গভীরে ডুব দিতে হবে। ঐ দর্শন অনুভূতিগুলি এবং জীবনকৃষ্ণের জীবন ও বাণীর গভীরে গেলে আমরা দেখব এই যে জীবনকৃষ্ণকে ভিতরে দেখছি উনি বাইরে থেকে আসেন নি। আমারই প্রাণচৈতন্য ঐ রূপ ধারন করেছে। আমার দেহ থেকে ক্ষরিত রস ধীরে ধীরে মুক্তোয় পরিবর্তিত হয়েছে। স্বপ্নদৃষ্ট জীবনকৃষ্ণ কোন ব্যক্তি মানব নন। তিনি মধুবিদ্যার মূর্তরূপ। উনিও অপূপঃ। এখানে অপূপঃ মানে মধুপিষ্ট - মধুভরা পিঠে। ব্যক্তি মানবের রূপে জগৎ চৈতন্যের এক কণা। তাই ব্যক্তির আবরণ

ভেদ করে ভিতরের চৈতন্যের রস আস্বাদন করতে হবে। তবেই আমরা জীবনকৃষ্ণ রূপ মৌচাকের মৌমাছি হয়ে উঠব। জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে অসংখ্য মানুষ যখন তাঁকে অন্তরে দর্শন করে ঘোষণা করে, উপলব্ধি করে যে তারা বাইরে বহু আত্মিকে এক তখন ভেদজ্ঞান দূরে গিয়ে এই একত্ব বোধে জগৎ মধুমতী হয়।

এই উপলব্ধিটা হবে যদি আমি গভীরে যাই। এই গভীরে যাওয়ার উপর উনি জোর দিয়েছেন। সমুদ্রের গভীরে ডুব দাও তাহলে তুমি মুক্ত হয়ে যাবে। জীবনকৃষ্ণ নিজে কি ভাবে ডুব দিয়েছেন ? উনি বললেন, রামকৃষ্ণ যা বললেন এটিই সত্য, জগতে আর কিছু আমি সত্য বলে জানি না, ধর্ম জগতে শ্রীরামকৃষ্ণই একমাত্র মাপকাঠি। আমি রামকৃষ্ণের আচরণ দেখব, রামকৃষ্ণের বাণী মনন করব, রামকৃষ্ণের অনুভূতি নিয়ে ভাবব। তিনি যে ধর্মজগতের মাপকাঠি। অর্থাৎ উনি রামকৃষ্ণ সমুদ্রে ডুব দিলেন। ওই রামকৃষ্ণকে ভিতরে দেখে ওনার ধর্মজীবন শুরু হোলো, এবার উনি ঠাকুরের বাণী ও জীবনের মধ্যে ডুব দিলেন। ওনার এক স্বপ্নে জগৎ জোড়া বিরাট এক খাঁচার ভিতর থেকে ব্রহ্মদৈত্যরা বলছে, আপনি আমাদের বেদ, পুরান, তন্ত্র থেকে পড়ে শোনান। তখন তিনি বলছেন, আমি এক কথামৃত জানি আর কিছু জানি না। ওরা তখন বলছে তবে তাই শোনান। কারণ উনি কথামৃতের যে ব্যাখ্যা নিজের অনুভূতির আলোকে বুঝেছেন সেটা জানলে মানুষ সংস্কারমুক্ত হবে, মাথা থেকে অতীতের আচার্যদের অপব্যাখ্যা থেকে সৃষ্ট কুসংস্কার দূর হয়ে যাবে।

উনি তাহলে প্রথমে রামকৃষ্ণের মধ্যে ডুব দিলেন, ডুব দিয়ে একদম তল পেয়ে গেলেন। ষোল আনা রামকৃষ্ণময় হয়ে গেলেন। তখন বলছেন, রামকৃষ্ণ আমার আদর্শ। কিন্তু কিছু ক্ষেত্রে শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে হিন্দু ধর্মের সংস্কার রয়েছে, সেটা নেওয়া যাবে না। "বিধিবাদীয় বলিতে দোষ নাই, যেমন অষ্টমীতে একটি পাঁঠা"–একথাটা নেওয়া যাবে না। এরকম আরো কিছু সংস্কারজ কথা উনি বলেছেন–সেগুলো নেওয়া যাবে না। তল পাবার পরে বলছেন। এবার কখন উনি ঠাকুরের কথা কাটছেন ? যখন উনি বিশ্বব্যাপী হলেন, জগতের মানুষ যখন প্রমাণ দিতে লাগল যে তুমি ব্রহ্ম। তখন উনি বুঝলেন যে তাঁর জীবনটাকে ভগবান এবার জগতের মাপকাঠি করছেন, Measuring

scale হিসাবে তুলে ধরছেন। এবার তিনি জগতের মানুষ যা দেখছে সেই দর্শন অনুভূতিগুলোকে বিশ্লেষণ করে করে এগোতে লাগলেন। বললেন, এরাই আমার গুরু। জগতের মানুষের দর্শন অনুভূতি থেকে শিক্ষালাভ করব। জগতের মানুষ আমাকে প্রণাম করতে গেলে আমি পা বাড়িয়ে দেব না, তাদের দর্শন থেকে আমাকে শিক্ষা নিতে হবে। উনি আরো এগোতে লাগলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ অচিনে গাছ ছিলেন, জীবনকৃষ্ণ অচিনে গাছ আর রইলেন না। ভিতরে দর্শন সাপেক্ষে মানুষ তাকে চিনতে পারল। উনি বললেন, না, এখনও পুরোপুরি চেনা হয়নি। এখনও মুক্ত হইনি। উনি বলছেন, নাগার্জুন কি লিখেছে ? অবলোকিতেশ্বর বুদ্ধ বলছেন, একজন মানুষও যদি মুক্তি পেতে বাকি থাকে তাহলে আমি মুক্তি নেব না, অর্থাৎ তার মুক্তি চরম সীমায় পৌঁছায় নি, তিনি মুক্ত হয়েছেন কিন্তু ষোল আনা মুক্ত হওয়া হোলো না, যতক্ষন না সাধারন মানুষ মুক্ত হচ্ছে। এই সাধারণ মানুষ কখন মুক্ত হবে ? যখন সাধারন মানুষও তূরীয় অবস্থায় নির্গুণের অনুভূতি লাভ করতে শুরু করবে ও তার সাথে একত্ব লাভ হবে। তবে তো আমরা সেই জগৎ চৈতন্যকে ধারণা করতে পারব। নির্গুন ব্রহ্ম আমাদেরকে ধারণ করলে, এই একত্ব লাভ হলে, আমরা ওনার কথার ভিতরে ডুব দিতে পারব। উনি কি বলতে চাইছেন ধরতে পারব এবং ওনাকে নিয়ে যে দর্শন অনুভূতি হচ্ছে তার গভীরে যেতে পারব। দর্শন অনুভূতি গুলোর ব্যাখ্যা করতে পারব। তা না হলে পারব না।

ঠাকুরের কথার ভিতরে ডুব দিলেন উনি, তার তল পাবার পর এক সময় তাকে অতিক্রম করলেন। পূর্ণ মুক্ত হলেন উনি, বাইরেও তার লক্ষন ফুটল। শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন যে এক সময় ওনার খেতে দেরী হচ্ছে বলে যদু মল্লিক একজন রাঁধুনি ঠিক করে দিয়েছিল। সেই রাঁধুনির মাইনে ছিল এক টাকা। যদু মল্লিক বললেন– ওটা আমি দেব। আপনার জন্য রাঁধুনি রেখে দিচ্ছি, সময়ে খেতে হবে তো। রাঁধুনি রেখে দেওয়া হোলো। এবার খাওয়া ঠিক সময়ে হতে লাগলো। উনি এক সময় বললেন, দূর শালা, যদু মল্লিক আমায় ডেকে পাঠিয়েছে, এখনই যেতে হবে। এমনি যাই যদুর কাছে ঠিক আছে, কিন্তু এখন ও ডেকে পাঠালেই আমাকে ছুটতে হচ্ছে, কেননা আমার জন্য রাঁধুনি রেখে

দিয়েছে যে ! তখন ঠাকুর বলছেন—সুধাময়ীর রান্না আর না, আর না। আর আমি সুধাময়ীর রান্না খাব না। কেননা আমি স্বাধীন থাকছি না। আমার দরকার নেই অত সুখের। বেলা ৪টে বেজে যাক খেতে তাও ভালো। আমি পরাধীন থাকব না। এটা হোলো বাইরের দিক থেকে। এবার জীবনকৃষ্ণ কি বলছেন ? ঠাকুর রামকৃষ্ণ আমাকে আদেশ করছেন, তাঁকে লিখে খাওয়াতে হবে। পরে উনি বুঝছেন কোথাও একটা বাধা রয়েছে, আমি পূর্ণ স্বাধীন, পূর্ণ মুক্ত হয়ে উঠিনি। পুরীতে উনি যখন ধর্ম ও অনুভূতির তৃতীয় ভাগ লিখছেন তখন কি উনি আদেশ পেয়েছিলেন ? না। কেননা উনি তখন স্বাধীন, উনি তখন মুক্ত। কিন্তু মুক্ত হলেও উনি বলছেন, এই মুক্তি আমি নেব না। যতদিন না সাধারন মানুষের মুক্তি হচ্ছে। এই সাধারন মানুষের মুক্তি কখন হবে ? যখন আমরা উপলব্ধি করব ওনার আম গাছে আমাদেরও ভাগ আছে, অধিকার আছে। আমাদের তূরীয় অবস্থার দর্শন অনুভূতি হবে এবং একত্বের বোধ জাগবে, সমগ্র মনুষ্যজাতি জুড়ে এক অখণ্ড মানব চৈতন্য আছে, এইটা যখন উপলব্ধি হবে তখন সাধারণ মানুষও মুক্তির স্বাদ পাবে।

ঠাকুর বলছেন যদি আদেশ হয়ে থাকে — হ্যাঁ, ঠাকুর ওনাকে আদেশ দিয়েছেন, সচ্চিদানন্দ গুরু রূপে। সচ্চিদানন্দ গুরু দেখা দেবেন, কখনও লিখিত আদেশ দেবেন, মুখেও বলবেন, যেমন ধর্ম অনুভূতি লেখার আগে বলছেন, এরকম আদেশ হওয়া চাই। পরবর্তীকালে বলছেন যে না ঐরকম আদেশের দরকার নেই। আরো উচ্চস্তরের আদেশ আছে। সেটা কি ? অপরে দেখবে একঘর লোক, সেখানে উনি ঈশ্বরীয় কথা বলছেন। এটা হচ্ছে উচ্চস্তরের আদেশ। তারপরে আশ্চর্য্য এক কথা বলছেন। বলছেন, এই আদেশ হওয়া ব্যষ্টির সংস্কার বিশেষ। আমার মনের ইচ্ছা রূপ ধারন করেছে। ব্যষ্টির সংস্কার বিশেষ বলে উড়িয়ে দিচ্ছেন যখন বিশ্বব্যাপিত্বের কথা বলছেন। বলছেন, তোমাকে আদেশ পেয়ে ঠাকুরের কথা বলতে হবে না। তোমার ব্রহ্মত্ব তোমার চিন্ময় রূপ ধরে বহু মানুষের মধ্যে প্রকাশ হবে। প্রচার তখনই হয়ে গেল, এইবার তারা যখন তোমার কাছে আসবে তাদের দর্শন অনুভূতি নিয়ে অনুশীলন করো আর মর্মার্থ ধরিয়ে দাও। জীবনকৃষ্ণ কোথাও সভা করে ঠাকুরের কথা

বলতে যাননি। এখন তুমি বলবে, দাদা আপনি কেন আমায় পাঠ করতে যেতে বলছেন ? তখন আমাদের মনে রাখতে হবে তীর ধনুকের কথা। ধনুকটাতো এক জায়গায় থাকে কিন্তু তীরটা ছিটকে যায়। তীরটা যে ছিটকে যায় সেটা কার শক্তিতে যাচ্ছে ? ধনুকটার শক্তিতে। জীবনকৃষ্ণই আমাদের পাঠাচ্ছেন তাই আমরা যাচ্ছি। ধনুকটা এক জায়গাতেই আছে। ধনুকের কাছ থেকে শক্তি আসছে, তার কথা তিনি বলছেন আমাদেরকে মধ্যমা (medium) করে। বস্তুত আমরা বলি না, উনি বলছেন, ওনার আদেশের দরকার নেই। আদেশ হলে কি হয় ? ভগবান যাকে আদেশ দিয়েছেন তার দায়িত্ব ভগবানের, তার কাছে যে লোকটা বুঝতে এসেছে তাকে যেন সে বোঝাতে পারে। তিনি শক্তি জোগাবেন। ঠাকুর বলছেন, আমার কথা শেষ হয়ে হয়ে আসে আর মা রাশ ঠেলে দেন। তাহলে মায়ের দায়। জীবনকৃষ্ণের জীবনে দেখছি মা-তো আগেই দায়িত্ব নিয়েছেন। বলছেন — অপরে, যাদের জানি না, চিনি না তারা এসে বলছে আপনাকে স্বপ্নে দেখেছি। তাহলে মা নিজেই প্রচার করেছেন, মুখে বলে দেবার দরকার নেই। তাই আদেশটাকেও বলা হচ্ছে ব্যষ্টির সংস্কার বিশেষ। এই ভাবে দর্শন অনুভূতির ভিতরে আমাদের যেতে হবে। আপনি একটা স্বপ্ন দেখে ভেবে নিলেন যে আপনাকে আদেশ করেছেন—তা কিন্তু নয়।

স্বামীজী বলছেন, Lower truth থেকে Higher truth (নিম্নতর সত্য থেকে উচ্চতর সত্য) বলে কোনো কথা নেই। স্বামীজি ১৮৯৩ এ আমেরিকায় চিকাগো বক্তৃতার পর কি বলেছিলেন ? ওনাকে যখন জিজ্ঞাসা করা হোলো যে হিন্দুরা মূর্তি পূজা করে কেন ? স্বামীজি বললেন, প্রথমেই তো মানুষ অখণ্ড চৈতন্যকে ধারনা করতে পারে না। তিনি তো অরূপ, রূপাতীত, সেই জন্য মূর্তি গড়ে ওরা প্রতীকি রূপের মাধ্যমে তাকে ধারনা করে, ওটা Symbolic । পরে ধাপে ধাপে ওরা অরূপে পৌঁছায়। From lower truth to higher truth –এ তাদের উত্তরণ হয়। ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দেই আবার স্বামীজি ফ্রান্সে গিয়ে যখন বেদান্তের oneness এর কথা বলছেন, সেখানে বলছেন from lower truth to higher truth বলে কিছু হয় না, truth is truth, সত্য সত্যই। Lower truth থেকে higher truth এ যাওয়া যায় না। আশ্চর্য্য কথা।

তাহলে কি জন্য উনি বেলুড় মঠ করলেন ? এতে Truth টাই হারিয়ে গেল, এমনকি ঠাকুরকে পথে বসালেন। জীবনকৃষ্ণ বলছেন, ঐ বৃহৎ মন্দির দেখলে কি হবে ? ঠাকুরকে তিনি পথে বসালেন। ঠাকুর যে একত্রের কথা বলতে এসেছেন সেটা তো স্বামীজির বোঝানো হোলো না। তোমরা এতগুলি বসে আছ, আমি দেখছি এক রামই এতগুলি হয়ে বসে আছে, এক রাম তার হাজার নাম, রামকৃষ্ণের এই শিক্ষা, এই teaching টা তো মানুষকে জানানো হোলো না। Lower truth থেকে Higher truth বলতে আমরা সাধারনত কি বুঝি? কেউ মূর্তি পূজা করছে, এক সময় তার পূজা বন্ধ হবে, বুঝবে ভগবান ভিতরে। না তা হয় না, মূর্তি পূজা যারা করে কোনোদিন কি তারা মূর্তি পূজা ছেড়েছে? যত দিন গেছে যত বয়স বেড়েছে নিষ্ঠা তত বেড়েছে। আবার ঘরে যদি কোনো অঘটন ঘটেছে তাহলে পুজো ছেড়ে দিয়েছে। নাস্তিক হয়ে গেছে। এ বিষয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ ব্যতিক্রম। তাঁর ধর্ম জীবন পুজো দিয়ে শুরু হয়নি। এগারো বছর বয়সে আনুড় গ্রামে যাবার পথে জ্যোতি দর্শন করে তার সমাধি হয়। উনি বলছেন, তখন থেকে আমি অন্য মানুষ হয়ে গেলাম। তাই তার পক্ষে পরে মূর্তি পূজা শুরু করেও তা ত্যাগ করা সম্ভব হয়েছিল। তাহলে এই Lower Truth থেকে সত্যে পৌঁছানো যায় না।

পরবর্তী ধাপে আমরা বললাম lower truth টা হলো ভিতরে সচ্চিদানন্দগুরু লাভ করা। বুঝলাম, ভিতরে ভগবান, পরে বুঝব আমিই ভগবান। এখন আমরা বুঝছি, উনিও বলছেন, না তাও হয়না। যতক্ষন সচ্চিদানন্দগুরু নিয়ে থাকবে সত্য ধারণা হবে না। এই যে মানিক্য বেরোলো, তারা ''উপনিষদের পারে'' – বই লিখছে আবার এদিকে লিখছে সচ্চিদানন্দ গুরুর লীলা কাহিনী। সচ্চিদানন্দগুরুর কথা, দ্বৈতবাদের কথা সেই থেকেই গেল। জীবনকৃষ্ণ বলছেন, এখানে গুরু কথাটি অপ্রযোজ্য, শুধুই সচ্চিদানন্দ। তা নাহলে Lower truth থেকে highr truth এ যাওয়া যায় না। তাহলে প্রথম থেকেই ভাবতে হবে what is truth, সত্য কি ? Truth is oneness, religion is oneness, সত্য হল একত্ব উপলব্ধি, একত্বই ধর্ম। এই oneness থেকেই oneness বোঝার চেষ্টা। জীবনকৃষ্ণের চিন্ময় রূপ দেখে সেই সত্যের উন্মোচন

শুরু হবে। একত্ব বোঝা-ই আমাদের লক্ষ্য। তার আগে তাঁর ব্যক্তিগত সাধন কী হয়েছে, সেটা আমাদের মূল আলোচ্য বিষয় নয়। জীবনকৃষ্ণকে দেখেছ ? সচ্চিদানন্দগুরু লাভ হয়েছে। এবার অমুক ভূমির দর্শন–না, তাহলে সত্য পাবেন না, সত্য হচ্ছে এই একত্ব। এক সর্বজনীন সর্বকালীন মানবের চিন্ময় রূপে একের একত্ব দর্শন করার পর প্রথমে তার সাথে পরে মনুষ্য জাতির সাথে একীভূত হওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়। এই হল lower truth থেকে higher truth এ যাওয়া ।

এবার আমরা দু'একটা স্বপ্ন নিয়ে আলোচনা করব। স্বপ্নের গভীরে যাওয়ার চেষ্টা করব। মানিকে 'ওপারেতে' শিরোনামে রূপা মাজির একটা স্বপ্ন।

ও দেখছে- 'আমার মোবাইলে একটা ফোন এলো। স্বামী ফোনটা ধরে বলল, একজন তোমার সঙ্গে কথা বলতে চাইছেন, এই নাও। আমি বললাম, কে কথা বলতে চাইছেন ? ও বলল, উনি খুব বড় মাপের মানুষ। এই বলে ফোনটা আমাকে দিল। আমি ফোনটা ধরে বললাম, আপনি কে বলছেন ? উনি বললেন, 'আমি কে ? আমি কে ?'... আমি বিরক্ত ভাব প্রকাশ করে বললাম, কে ? তখন উনি বললেন, আমি হলাম নির্গুণ।.....স্বপ্ন ভাঙ্গল।'

কি আশ্চর্য্য স্বপ্ন দেখুন। ঠাকুর রামকৃষ্ণ বলছেন, নির্গুনের সাথে আলাপ চলে না। এযুগে নির্গুণ কৃপা করে ধরা দিচ্ছেন। তাঁর রহস্য তিনিই উন্মোচন করবেন। ওর স্বামী ফোনটা ধরিয়ে দিল কেন ? এই স্বপ্নে স্বামী টি কে যে রূপাকে ফোনটা ধরিয়ে দিল ? দুটো অর্থ হয়। একটা হচ্ছে সগুণ ব্রহ্ম, আর একটা হচ্ছে এই পাঠচক্র। এই পাঠচক্রই স্বামী, আমাদের প্রকৃত অবলম্বন, যে ধরিয়ে দেবে যে ওগো এটা তোমার তূরীয় অবস্থার অনুভূতি, নির্গুণের অনুভূতি। তোমার যে Development হচ্ছে, কোথায় গিয়ে জানবে, কে ধরিয়ে দেবে ? ধরিয়ে দেবে তোমার স্বপ্ন যা সগুণ ব্রহ্মের লীলা। স্বপ্নটা তো আলোচনা করতে হবে পাঠে এসে। পাঠচক্র সম্মিলিত ভাবে আমার অবলম্বন, আমার স্বামী, যে ধরিয়ে দেবে যে তুমি নির্গুনের সাথে কথা বলছ।

এই প্রসংগে একটা স্বপ্ন বললে বুঝতে আরো সুবিধা হবে। বেলঘড়িয়ার প্রার্থিতা ঘোষ দেখছে, ও পিসীর বাড়ী যাচ্ছে। সামনে একটা পুকুর পড়েছে। গোটা পুকুরটা জুড়ে বিরাট একটা মাছ। ও ভীষন ভয় পেয়ে গেছে, এত বড় মাছ দেখে। এবার হঠাৎ করে দেখছে আপনা থেকেই ও পৌঁছে গেছে পিসীর

বাড়ী, কিভাবে পৌঁছে গেল ও জানে না। পিসীর বাড়ীর তিনতলায় উঠে ও মাছটার দিকে তাকাচ্ছে। দেখছে মাছটার গায়ে যেন অনেক ছোটো ছোটো মাছ আছে, সেগুলো উপরে উঠে শূন্যে মিলিয়ে যাচ্ছে আকাশে। এই করতে করতে দেখে মাছটাই নেই। তখন মনে হচ্ছে আরে, একটা বড় মাছ তো ছিল না, ছিল অসংখ্য ছোটো ছোটো মাছ। ওর উপলব্ধি হচ্ছে যে বিরাট একটা মাছ আছে ভেবেছিলাম, তাতো নেই। কতকগুলি ছোটো ছোটো মাছ ছিল, সেগুলো শূন্যে উঠে মিলিয়ে গেল।

কি অদ্ভুত স্বপ্ন ! নির্গুনের অনুভূতি বলতে কি বোঝায় ? আমরা যখন বলছি যে জীবনকৃষ্ণ ব্রহ্ম, বড় মাছ, একটা বড় মাছ আছে বলছি, বুঝতে হবে বস্তুতঃ তিনি সমষ্টি চৈতন্যের ঘণীভূত রূপ। He is not an Individual, তিনি স্বতন্ত্র একজন ব্যক্তি নন। সমষ্টি চৈতন্যের ঘণীভূত রূপ। তাই ছোটো ছোটো মাছগুলো আকাশে উঠে শূন্যে মিলিয়ে গেল। কেন ? সাধারন মানুষের মধ্যে যখন নির্গুনের শক্তি প্রকাশ হচ্ছে, তারা যখন নির্গুনের সঙ্গে একত্ব লাভ করছে, তখন এই ধারনা লাভ হয়, উপলব্ধি হয় যে প্রত্যেকটি মানুষই ব্রহ্ম। আর জীবনকৃষ্ণ সমষ্টি চৈতন্যের ঘণীভূত রূপ। তখন আর ব্যক্তিপূজা থাকে না। এই উপলব্ধি হবে যখন তিনতলা থেকে দেখা হবে। ব্যষ্টির সাধনে তিনতলা মানে ? জীবনকৃষ্ণ বলছেন, একতলা মানে–অসতো মা সদ্ গময়, বর্হিমুখী মন যখন অন্তর্মুখী হোলো। ভিতরে এলো। তখন একতলা। পরে দোতলায় গেলেন। আদিত্য বলে একজন তাকে দোতলায় নিয়ে গেল। তমসো মা জ্যোতির্গময়ঃ- তখন তাঁর সহস্রারে ভগবান দর্শন হলো। পরে অমৃত বলে একজন তাঁকে তিনতলায় নিয়ে গেল। দোতলা পার করে দিল। তখন তিনি সবার মধ্যে ফুটে উঠে সর্বজনীন ও সর্বকালীন হলেন। তিনি তিনতলায় উঠলেন। এটা জীবনকৃষ্ণের ক্ষেত্রে ঘটেছে, ব্যাপারটা বোঝা গেল। আমাদের ক্ষেত্রে কি হবে ? আমাদের কাছে একতলা হোলো যখন আমরা জীবনকৃষ্ণকে স্বপ্নে দেখলাম, এক কথায় মন অর্ন্তমুখী হোলো। আমরা দোতলায় কখন যাচ্ছি ? বিধিবাদীয় কর্ম, সংস্কার থেকে যখন সরে আসছি, ধারনার মধ্যে আসছে যে শ্রাদ্ধ, পুজো, নামাজ, ইত্যাদি ঠিক নয়, এগুলোর দরকার নেই। তখন আমরা মানবব্রহ্মকে বোধে বোধ করছি। সেদিন বিভূতিভূষণের একটা লেখা পড়ছিলাম–গল্পটার নাম ‘ফকির’। কেন্দ্রিয় চরিত্রটি একজন নিষ্ঠাবান ধার্মিক মুসলমান। লেখকের মতে সে শ্রেষ্ঠ

ফকির। কেননা বাড়ীতে নানারকম গণ্ডগোল হয়েছে, কিন্তু সে নিজে খুব নির্লিপ্ত। তাঁর স্ত্রী খুন হয়েছে। তাকে পুলিশে ধরে নিয়ে গেছে। জজসাহেব বিচার করছেন। ফকির বলছে, আমি কিছুই জানি না, শাস্তি যদি দেন তাতে আমার আপত্তি নেই। তবে জেলে রাখলে আমার একটি আর্জি আছে। জজসাহেব জিজ্ঞাসা করছেন, কি আর্জি ? ফকির তখন বলছেন, আমাকে যেন সেখানে নামাজ পড়তে দেওয়া হয়। জজ সাহেব তো অবাক্। জজ সাহেব ভাবছেন এ তো খাঁটি ফকির, খাঁটি সাধু লোক। লেখক বিভূতিভূষন দেখাতে চাইছেন যে খাঁটি সাধু কে ? সর্বাবস্থায় যার মন ঈশ্বরে আছে। আজকে আমরা বুঝছি যে কথাটা ভুল। ও খাঁটি ফকির নয়, খাঁটি ফকির বা খাঁটি সাধু হোলো সে যে ভগবানকে অনুভব করেছে ভিতরে, দেহে ভগবানের সাড়া পেয়েছে। ঠাকুর রামকৃষ্ণ বলছেন, ওগো সে যে পেটের ভিতর লড়ে চড়ে। তার জন্য আমি কোন মন্দিরে পুজো করতে যাব ? কোথায় আমি নামাজ পড়তে যাব ? যে নিয়মিত নামাজ পড়ছে নিষ্ঠাভরে, সে ফকির নয়। যে নিয়মিত পুজো করে সে সাধু নয়। সে-ই সাধু যে ভিতরে ভগবানকে পেয়েছে, যার একবার ওঁ বললে সমাধি হয়ে যায়। সে বাইরে কি করে পুজো করবে ? আমরা এটা জানতে পারছি, যখন আমরা দোতলায় পৌঁছাচ্ছি।

এবার তিন তলায় কখন পৌঁছাই ? তিন তলায় পৌঁছানো মানে অমৃত পুরুষের সাথে, শাশ্বত পুরুষের সাথে একত্ব লাভ হওয়া। যখন আমাদের তূরীয় অবস্থার দর্শন অনুভূতির দ্বার খুলে যাচ্ছে, তাঁর সাথে যখন একত্ব লাভ হচ্ছে, তখন আমরা বুঝি, এই যে জীবনকৃষ্ণকে দেখছিলাম, এই জীবনকৃষ্ণ একজন ব্যক্তি মানুষ নন, তিনি সমষ্টি চৈতন্যের ঘনীভূত রূপ, আমি সেই চৈতন্য সাগরের একটি ঢেউ। এখন আমরা মুখের কথায় বলে দিচ্ছি বটে, কিন্তু নির্গুনের শক্তিলাভে আমার ‘আমি’ পুড়ে গিয়ে পরিশুদ্ধ ‘আমি’ জন্মলাভ করলে আত্মিক একত্ব বোধে বোধ হলে আমাদের জীবনে বিরাট পরিবর্তন এসে যাবে। আমরা সেই পরিবর্তনের মুখে, সেই সন্ধিক্ষনে এসে পৌঁছেছি। সেই একত্ব আস্বাদনের প্রাক্ মুহুর্তে। এখন প্রয়োজন নিষ্ঠাভরে দর্শন অনুভূতির মনন ও আত্ম সমীক্ষা।

——০——